বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের জাতিগত সংকট ও উত্তরণ সংখ্যা

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশকাল
১৫.০৯.২০১০

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী:সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এ ক

ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়িদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ব্রিটিশরাই সর্বপ্রথম এখানে এদের এই সরল জীবনব্যবস্থার মূলে আঘাত করে; যার ফলশ্রুতিতে শ্রেণীগত কারণে পাহাড়িদের নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং পাহাড়িদের নিজেদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাজনের সৃষ্টি হয়।

পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়িদের অর্থনীতি মূলত জুমচাষ নির্ভর ছিল। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে জুমচাষের পরিবর্তে পাহাড় কেটে সাধারণ হালচাষের প্রচলন করে। যার ফলে প্রধানত চাকমাদের মধ্যে তথাকথিত কিছু উন্নতি ঘটলেও সাধারণ হালচাষে অভ্যস্ত সার্বিক জুম্মরা অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখিন হয়। ফলে চাকমা ও জুম্মদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং জুম্মরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়াও ব্রিটিশরা পাহাড়ি জুম্মদের হাজার হাজার একর জমি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে ভূমির ওপর তাদের একক আধিপত্য বিস্তার করে। এতে চাষাবাদের জমি সংকীর্ণ হয়ে গেলে জুম্মদের পক্ষে জীবিকা অর্জন একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আমলে তৎকালীন সরকার পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিদের বিশাল বনভূমির প্রচুর গাছ ও বাঁশ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ইউএসএইড নামের আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণ করে কাপ্তাই বাঁধ। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে ওখানকার শাসকশ্রেণীর বাঙালিদের অনেক সুবিধা হলেও পাহাড়ি জনগণ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বাংলাদেশের আদিবাসিরা বর্তমানে তিন ধরনের সরকার-ব্যবস্থার শাসনাধীন আছে। যেমন: বাংলাদেশের জাতীয় সরকার, আদিবাসিদের নিজেদের ভেতরকার "রাজা" ব্যবস্থা এবং "আর্মি" কর্তৃক এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা সেখানে ক্রিয়াশীল আছে। সাধারণ আদিবাসিরা এই তিনি ধরনের সরকার ব্যবস্থার আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি পালন করতে গিয়ে উপকার পাওয়ার পরিবর্তে এরা নির্যাতিতই বেশি হচ্ছে। সুতরাং আদিবাসি হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তির কোন পথ যেহেতু এদের সামনে খোলা নেই, আমরা মনে করি, এদের সব ধরনের বাঁধার শিকল ছিঁড়ে দিতে পারে একমাত্র বাংলাদেশের জাতীয় সরকার এবং আমাদের জাতীয় সংসদ।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার-এর সাথে জাতীয় জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই চুক্তির কোনো শর্তই আর পরবর্তী সময়ে আলোর মুখ দেখেনি। বাংলাদেশে পঁয়তাল্লিশটিরও অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। ভাষা, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর এদের প্রায় সকলেরই

অধিকার আজ হুমকির সম্মুখিন। এত কিছু সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এদের সংগ্রাম, আন্দোলন চলছে এবং অবশ্যই এর মাধ্যমেই একদিন অর্জিত হবে 'আদিবাসী'দের প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার।

নির্বাহী সম্পাদক
১৫.০৯.২০১০

স ম্পা দ কী য় : দুই

আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কিংবা অধস্তন জাতি বা নিচু জাতি– যে-নামেই এদের ডাকি; এ-ধরনের অধিকারহীনদের অধিকার নিজেদেরই আদায় করে নিতে হয়! এর বিকল্প আছে বলে আমার জানা নেই। যেমন, বায়ান্ন কিংবা একাত্তরে এদেশের মানুষ– আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে নিয়েছিলাম। একইভাবে এদেশে অবস্থানকারী অন্য জাতিসত্তার মানুষদেরকেও ক্ষমতাসীন বাঙালিরা এমনিতে অধিকার দিয়ে দেবে না; এটা ইতিহাস দ্বারা স্বীকৃত স্বাভাবিক ব্যাপার; বাঙালির কাছ থেকে এদের অধিকার আদায় করেই নিতে হবে।

এটা তো সত্যি যে, বাঙালি জনগোষ্ঠির সাথে এদের চেহারা, গায়ের রঙ, খাবার-দাবার, সর্বোপরি সংস্কৃতি– বলা যায় সবকিছুতেই অমিল রয়েছে; এই যে যার-যার বৈশিষ্ট্য– একে স্বতন্ত্র রেখে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যকে প্রতিহত করা আমাদের সাধারণ কর্তব্য। সরকারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারাই আছেন, এরা সবাই বাঙালি, আর্মির সদস্যরা বাঙালি, আমলারা বাঙালি– কিন্তু এদের সকল কাজে কি সমর্থন আছে সাধারণ সকল বাঙালির? বরং বাঙালিরই রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে বহু বাঙালি। যেমন আমি বাঙালি কিন্তু সরকার কি আমার মত-অমতের তোয়াক্কা করে? এই বিষয়টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আন্দোলনকারীদের ভালো করে বুঝতে হবে। কেননা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের জাতীয় যে-আন্দোলন, সেই আন্দোলনের প্রতি অধিকাংশ সচেতন বাঙালিরও সমর্থন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে তিনটি দল সক্রিয় আছে; ১.জাতীয় জনসংহতি সমিতি (জেএসএস), ২. ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এবং ৩. নতুন গঠিত জেএসএস (বিক্ষুব্ধ)। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন নামে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী রয়েছে। এই দলগুলোর প্রত্যেকটির জন্ম হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের বঞ্চিত সাধারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে। এই দলগুলোর একমাত্র লড়াই-সংগ্রাম করার কথা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে। অথচ বর্তমানে এই ছোট-বড় দলগুলোর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল জেএসএস-এর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের অভিযোগ হল, ১৯৯৭ সালে সরকারের

সঙ্গে চুক্তির পর এর নেতারা সরকারকে খুশি রেখে বিভিন্ন সুবিধাজনক পদে শুধু নিজেদের বহাল রেখেছে; এতে করে তারা নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণের দাবি আদায়ের লড়াইয়ের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। তাই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কোনো তাগিদ তারা আর অনুভব করছে না। ফলে সাধারণ পাহাড়ি জনগণের আস্থার জায়গায়ও তারা আর নেই। কারণ সাধারণ পাহাড়িদের বঞ্চনা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি; পরিস্থিতি আগের তুলনায় আরও নির্মম ও জটিল হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে এখানকার 'আদিবাসী' বসবাসকারী এলাকাগুলোতে কর আদায়ের পদ্ধতি হিসাবে 'সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময়ে সমান ওজনের দ্রব্য বিনিময় প্রথা' চালু ছিল। ফলে তুলা উৎপাদনকারী আদিবাসীরা আট টাকা মূল্যের একমন তুলা দিতে বাধ্য হত দুই টাকা মূল্যের একমন লবণের বিনিময়ে। এভাবে একটি বা দুটি পণ্য ক্রয় করতেই আদিবাসীদের প্রধান ফসল তুলার মজুত নিঃশেষ হয়ে যেত। কর আদায়ের নামে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাঙালি উঁচু বর্গের হিন্দু ফড়িয়াদের এই শোষণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে পাহাড়িরা তখন চরম বিদ্রোহে ফুঁসে উঠেছিল।

আরও উল্লেখ্য পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনামলে সবচেয়ে আলোচিত শোষণ প্রক্রিয়া হল কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ; যার ফলে সৃষ্ট হ্রদে ডুবে গিয়েছিল 'আদিবাসী'দের ৫৪,০০০ একর জমি, উচ্ছেদের শিকার হয়েছিল ১০,০০০ 'আদিবাসি' চাষি এবং ৮,০০০ জুমচাষি পরিবারের নারী ও শিশুসহ ১,০০০০০ পাহাড়ি। সেই সঙ্গে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৮,০০০ বাঙালি। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে রাতারাতি উপকৃত হয় বাঙালি শোষকগোষ্ঠী। এই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে গাছ ও বাঁশসহ পাহাড়িদের সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের পথ সম্পূর্ণ খোলামেলা ও অবাধ হয়ে যায়। এতে পাহাড়ে দেখা দেয় চরম খাদ্যসংকট। এমনকি সব ধরনের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের অভাবে পাহাড়িদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসে।

১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের পর 'আদিবাসী'-সংকট আরও জটিল ও বহুমাত্রিক রূপলাভ করে। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত প্রায় পনেরটি গণহত্যা সংঘটিত হয়, তাতে হাজার হাজার পাহাড়ি প্রাণ হারান, শত শত নারী ধর্ষিত হন এবং জ্বালাও-পোড়াও, আটক, খুন, লুণ্ঠন প্রাত্যহিক দুঃসহ ঘটনা পাহাড়িদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। এতে করে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।

"১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৩৪ নম্বর ধারায় পার্বত্য এলাকায় বহিরাগতদের জমি বন্দোবস্তের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সরকার তা ১৯৭৯ সালে তুলে নেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩০,০০০ বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার পর থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এক হিসাব মতে চার লক্ষ সমতলবাসী বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়, যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণাম হয় সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক। তাদেরকে 'খাস' জমি দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসা হলেও পাহাড়িদের জমিতে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়। ফলে ব্যাপক এলাকা

ও বহু সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম থেকে হাজার হাজার পাহাড়ি উৎখাত হয়ে যায়। বহু পরিবার জমিজমাসহ সর্বস্ব হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়। অথচ জুমচাষ ও মজুরি শ্রম ছাড়া তাদের জীবিকা অর্জনের আর কোনো পথ তখন খোলা ছিল না।" [পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রান্তিকীকরণ; রবীন মেন্দর]

১৯৯৭ সালে নামেমাত্র শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও আজ পর্যন্ত পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসীদের শান্তি তথা কোনো অধিকারই আদায় হয়নি। তারা যে মানুষ সেই স্বীকৃতিটুকুও স্বাধীন দেশের সংবিধানে আজ অবধি সংরক্ষিত হয়নি। অথচ ব্রিটিশ বিরোধী-আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আসল কথা হল, শরীরে সেই ঔপনিবেশিক রক্ত-পরিবাহিত সাম্রাজ্যবাদের দালাল একটি গোষ্ঠীই আজ অবধি ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নামের তিনটি দেশ শাসন করছে। বিদেশি অপশক্তি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সমস্যা যেভাবে জিইয়ে রাখে, একইভাবে 'আদিবাসী' সমস্যাও ওই একটিই গোষ্ঠীর লোমশ থাবার নিচে জিইয়ে রেখেছে। সন্তু লারমার বড় ভাই মানবেন্দ্র লারমার স্বায়ত্তশাসন দাবির জবাবে বঙ্গবন্ধু তাদের বাঙালি হয়ে যেতে বলেছিলেন। আর জিয়াউর রহমান দরিদ্র-বখাটে-খুনি সমতলবাসী বাঙালিদের পাহাড়ে নিয়ে সরলমনা 'আদিবাসী'দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণের যজ্ঞ বাঁধিয়েছিলেন। এর দার্শনিক কারণ হল, পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ-এর ছায়াতলে অবস্থান করে প্রকৃতপক্ষে কোনো জাতি স্বাধীন হতে পারে না এবং অন্য জাতিকে স্বাধীনতা দিতেও পারে না। আমাদের সরকার সদিচ্ছার ভান করলেও শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদের দালালি পরিহার করে এরা 'আদিবাসী'দের অধিকার কোনোদিনই প্রতিষ্ঠা করবে না। ধনী দেশগুলো যেমন আমাদের দেশের মধ্যে নানাভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে ফায়দা লোটে, একইভাবে 'আদিবাসী'দের নিজেদের ভেতরে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভেতরকার কিছু লোক এবং তাদের দোসররা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও ধন-সম্পদের পাহাড় তৈরি করছে। কোনো বিশেষ চুক্তির ভনিতা নয়, সার্বক্ষণিক আর্মি নয়; প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধ কোটি মানুষকে দেশের প্রধান দলিল সংবিধান-এ সাধারণ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেই, সাধারণ আইন প্রণয়ন করেই আদিবাসিদের অন্তত মৌলিক দাবিগুলো পূরণ করা সম্ভব। জয় হোক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ সকল মেহনতি মানুষের।

সম্পাদক
১৫.০৯.২০১০

সূচি

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংখ্যার প্রতিক্রিয়া
মোকাবেলার জন্য দেশীয় উদ্যোগ-এর বিকল্প নেই
মো. জাহাঙ্গীর আলম ০৮

প্রবন্ধ
বাংলাদেশে জাতিগত সংকট ও উত্তরণের উপায়
বদরুদ্দীন উমর ১১

প্রবন্ধ
'আদিবাসী'দের সমস্যা-সঙ্কট জটিল হয়ে উঠছে
মনজুরুল আহসান খান ২৮
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা: নিপীড়ন-বৈষম্যের অনন্ত ইতিহাস
খালেকুজ্জামান ৩১

প্রবন্ধ
নিপীড়িত জাতির নিপীড়িত সাহিত্য
পাভেল পার্থ ৩৯
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে 'আদিবাসী' অধিকার আদায় ও
বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিকতা
সাইফুল্লাহ মেহেদী ৭৯

প্রবন্ধ
ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বাধিকার রক্ষার লড়াই চিরন্তন
আহমেদ কামাল ৮৭
প্রকৃতির সন্তান আদিবাসীদের এ কী দশা!
আতিউর রহমান ৯০
বাংলাদেশে জাতিগত সমস্যা
আবেদ খান ৯৭

প্রবন্ধ
আদিবাসী'-বাঙালি বিরোধের স্বরূপ
আবুল বারকাত ১০০

অধিকতর “উন্নয়নের” আগমনধ্বনি : পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক গতিশীলতার স্বরূপ
আ নু মু হা ম্ম দ ১০৮
পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রান্তিকীকরণ
র বী ন মে ন্দ র ১১৮

বক্তৃতা
পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি
প্র সি ত বি কা শ খী সা ১৩৪

প্রবন্ধ
ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয়: ‘আদিবাসী’-ই সঠিক ও যথাযথ
রা জা দে বা শী ষ রা য় ১৪৩
আদিবাসী জনগণ ও জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান
ম ঙ্গ ল কু মা র চা ক মা ১৫৪

প্রবন্ধ
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা
আ ক ম ল হো সে ন ১৭৪
‘আদিবাসী’ বিতর্ক এবং তাদের মানবিক অধিকার
মো. আ ব্দু ল আ উ য়া ল ১৮১
পার্বত্য সংকট সমাধানে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন
মো. জ য় না ল আ বে দী ন ১৮৪

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর ত্রিমুখী প্রান্তিকতা
জো বা ই দা না স রী ন ১৮৮

মোকাবেলার জন্য দেশীয় উদ্যোগ-এর বিকল্প নেই

মো. জাহাঙ্গীর আলম

ঐ সংখ্যা নিয়ে যখন লিখতে বসেছি, তখন বাইরে হচ্ছে প্রবল বর্ষণ। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি। চট্টগ্রামের ব্যবসা প্রাণকেন্দ্র খাতুনগঞ্জ পানিতে তলিয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকার মালামাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অক্টোবর মাসের শুরুতে যেখানে শীতের হালকা কুয়াশা শীতের আগমনবার্তা নিয়ে আসার কথা সেখানে প্রকৃতির চরম দাবদাহে চারদিকে ত্রাহি অবস্থার পর স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসলো বৃষ্টি। আর সাথে অস্বাভাবিক সমুদ্রের জোয়ার। এই সবই প্রকৃতির অভিমান। কারণ মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অবিচার করছে প্রকৃতির ওপর। তাই প্রকৃতিও এখন তার প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করেছে। আর এই সবই ভাবিয়ে তুলেছে এখন মানুষকে। তাই বলা যায় এই প্রেক্ষাপটে হালখাতার এই সংখ্যা একদম যুগোপযোগী একটি বিষয়। প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার এই দুই ধরনের লেখা নিয়ে সাজানো এই সংখ্যাটিতে বার বারই হয়তো ঘুরেফিরে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণগুলো। আইনুন নিশাতের সাক্ষাৎকারটিতে তিনি বলেছেন- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিভাবে ঝড়, বৃষ্টি সব কিছুর গতিপথ, সময়সূচি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা হয়েছে হুমকির সম্মুখীন। তবে যে ভয়ের ব্যাপারটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছিল যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে ডুবে যাবে তার সাক্ষাৎকার পড়ে সেই শংকামুক্ত হলাম । পুরো পত্রিকার অনেক চিন্তা উদ্রেককারী তথ্য ও মতামতের ভিড়ে এইটি ছিল একমাত্র আশাব্যঞ্জক ঘটনা। তিনি বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের রোধে বিভিন্ন দেশের সদিচ্ছা যে প্রশ্নাতীত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু এর ভিড়ে EU-এর ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয়।

জলবায়ু পরিবর্তন যা দুনিয়া গরম হয়ে যাবার রাজনীতি: ফরহাদ মাজহার তার ঐ লেখায় বেশ রসাত্মকভাবে অনেক কঠিন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে উন্নত বিশ্বের নেতারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে কিভাবে

বদ্ধপরিকর। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য তারা নিজেদের জীবনযাপন পরিবর্তন করবে না অথচ গরিবদেশের লোকগুলোকেই নাকি adaptation নামক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এর অর্থ হল গরিবের বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করতে পারে অথচ বিপর্যয় সৃষ্টিতে যাদের সবচেয়ে বড় অবদান, তারা আমাদের ঋণ দিয়ে নিজেরা মুনাফা করবে। লেখক Geo-Engineering বলে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন। বড়ই অদ্ভুত! প্রকৃতই জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে উন্নত বিশ্বের কোনো ধরনের পরীক্ষা আছে কিনা তা-ও ভাববারই বিষয়। বাংলাদেশ সব সময়ই দাবি করে আসছে, তারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কিন্তু তার স্বপক্ষে তেমন জোরালো অবস্থান তারা নিতে পারেনি। তাই লেখকের আশংকা আসলেই বাংলাদেশের ভাগ্যে adaptation ফান্ড-এর কতটুকু জুটবে তা এখন আমাদের আংশকায় পরিণত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্রাহীমের লেখা পড়ে, জানতে পারলাম কিভাবে পূর্বের যে কোনো সময়কার গড় উত্তাপ এবং বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বের করা যায়, আইসোকোর থেকে। ব্যাপারটি জানা ছিল না তাই জেনে ভালো লাগছে।

হোমায়রা আহেমেদ-এর লেখায় লেখক যা জোর দিয়ে বলেছেন তা হল জলবায়ু পরিবর্তনে যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলো সবই স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় বরং বিশ্বের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর এই কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে জীবনমাত্রার মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের টানাপোড়েনের কারণে বিশ্বের সব দেশের জনগণ ও সবাই পড়েছে মহাসংকটে। এই কারণেই ঈড়ঢ়-১৫ যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করেছিল তা কার্যত পূরণ করতে পারেনি। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্বন নিঃসরন কমানোর ব্যাপারে উন্নত এবং অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতৈক্যে পৌঁছাতে পারছেন, একারণে যে এ ধরনের দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই কেউই এ ব্যাপারে অপরকে চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না। লেখকের এই মতামতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক তাঁর লেখায় স্বভাবসুলভ রসবোধ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন কোপেনহেগেন সম্মেলন থেকে আমাদের প্রাপ্তি এবং এই প্রাপ্তি আমাদের দেশে আসলেই কতটুকু কাজে লাগানো যাবে এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা পড়ে যে কারোরই ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি ফুটে উঠবে। আশা-নিরাশার দোলাচলে থাকা বিশ্বজনগণকে একঅর্থে হতাশই করেছে কোপেনহেগেন সম্মেলন। কারণ রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠা এই জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু নিয়ে এখন ক্ষমতাশীল দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দরকষাকষিতেই বেশি ব্যস্ত। কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে তাদের যতটা-না ইচ্ছা তারচেয়ে বেশি ইচ্ছা হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে কার্বন বাণিজ্য করার বিষয়ে। ব্যবসা যেখানে মুখ্য হয়ে উঠে তখন 'ধরিত্রীকে বাঁচাতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মের বাসযোগ্য করে যেতে হবে' এই আশা দুরাশাই বলা চলে। তা-ও মুহাম্মদ ইব্রাহীমের মতো আমরাও আশা করি

ভবিষ্যতে মানুষের সব কর্মকাণ্ড নবায়নযোগ্য শক্তিতে চলবে। এই দৃশ্যকল্প যদি সত্য হয় তা হলে পৃথিবীতে আমরা না পারি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারবে, বর্ষাকালে বৃষ্টিধ্বনি শুনবে আর শীতকালে কুয়াশামাখা ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে যে যার কাজে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। কোপ-১৫ পারেনি কিন্তু আমাদের আশার আলো হয়ে এখনও জেগে আছে ২০১০-এর কানকুন সম্মেলন, ২০১২-এর জোহানেসবার্গ সম্মেলন। বিশ্বসমাজই সিদ্ধান্ত নেবে যে ভবিষ্যতে এই দৃশ্যকল্প বাস্তবে পরিণত হবে কিনা। কিন্তু তার জন্য আমাদের মতো দরিদ্র দেশকে অপেক্ষা করলে চলবে না। দরকার মিটিগেশন ও অ্যাডাপটেশন। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বর্ধিতভাবে যে সকল দুর্যোগশক্তি কাজ করবে তা চিন্তা করেই ডিজাইন করতে হবে এবং বর্তমানে যেসব অবকাঠামো পূর্বের দুর্যোগশক্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করা জরুরি প্রয়োজন। এক কথায় অ্যাডাপটেশন করা সম্ভব এবং সহজ। কিন্তু মিটিগেশন একটু আমাদের থেকে দূরে এবং সময়ের ব্যাপার। পরিশেষে ঈষরসধঃব অপঃরড়হ চষধহ-এর ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে; প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ার সাথে সাথে মোকাবেলার প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ দুর্যোগসহিষ্ণু অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য স্থানীয়ভাবে গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করাই হবে এখন আমাদের প্রধান কাজ।

মো. জাহাঙ্গীর আলম
অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, পুরকৌশল বিভাগ
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে জাতিগত সংকট ও উত্তরণের উপায়

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

জীবন আমাদের নয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে খাগড়াছড়ির এক বৃদ্ধ নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "সামরিক বাহিনীর লোকজন সর্বত্রই আমাদের ওপর নজর রাখছে। জীবন আমাদের নয়। তারা শিশুদেরকে মারপিট করে এবং বাচ্চারা স্কুলে যায় না।" (The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, P.110)

১৯৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে Chittagong Hill Tracts Commission ভারত ও বাঙলাদেশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করেন। ১৯৯০-এর ২৯শে নভেম্বর কমিশন ঢাকা এলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের চূড়ান্ত অনুমতি তাঁরা লাভ করেন ডিসেম্বরের ৮ তারিখে অর্থাৎ এরশাদের পতনের ঠিক পরপরই। তদন্তকালে কমিশন সদস্যরা চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা ইত্যাদি বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিসত্তা ও বাঙালি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

Life is not ours নামে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত পাহাড়ি জনগণের জীবন ও জীবিকার যে চিত্রটি পাওয়া যায় সে চিত্র একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনস্থ কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের চিত্র নয়। সে চিত্র হল বন্দীশালার এবং এক বিশাল সামরিক ক্যাম্পের।

এই সামরিক ক্যাম্প ও তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বন্দীশালার কোনো পরিবর্তন বাঙলাদেশে এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনের পতন এবং একটি সংসদীয় "গণতান্ত্রিক" সরকার প্রতিষ্ঠার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটেনি। সামরিক শাসন আমলে তাদের জীবন যেমন তাদের ছিল না, ঠিক তেমনি এখনও তাদের জীবন তাদের নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ওপর পাকিস্তানি ও বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের শোষণ নির্যাতন কোনো নতুন ব্যাপার নয়। Chittagong Hill Tracts Regulation ১৮৯০-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের জন্য যে সব অধিকার সংরক্ষিত ছিল এবং ঐ অঞ্চলে বাইরের লোকদের প্রবেশ ও বসতি স্থাপনের ওপর যে বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন ছিল, সেগুলো ১৯৬৪ সাল থেকেই উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলমান অঞ্চল করার যে অগণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ করা হয়, সেই নীতিই বাঙলাদেশ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমে আওয়ামী লীগ সরকার এবং তারপর থেকে প্রত্যেকটি সরকারই অনুসরণ ও কার্যকর করে আসছে। এই দুই পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমে যেখানে লক্ষ্য ছিল অঞ্চলটিকে একটি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা, সেখানে বাঙলাদেশ আমলের লক্ষ্য হল, অঞ্চলটিকে একটি বাঙালি-প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা। কিন্তু বাস্তবত এই 'পার্থক্য' কোনো পার্থক্যই নয়, কারণ পাকিস্তান আমলে যে মুসলমানদের প্রবেশ সেখানে ঘটতে শুরু করেছিল তারা ছিল মূলত বাঙালি এবং এখন সেখানে যে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের নীতি কার্যকর করা হচ্ছে সে বাঙালিরা হল মূলত মুসলমান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সেখানে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের নীতি রদ করার দাবি জানানো হয়েছিল, তখন সেই সব দাবি বিবেচনার প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে শেখ মুজিব তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন বাঙালি হয়ে যেতে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী-বাকশালীদের এই নীতিই পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসন আমলে আরও বিকশিত রূপে কার্যকর করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত হয়েছিল এবং এই সামরিক ছাউনি এরশাদের আমলে পেয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। বাঙলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র "প্রাতিষ্ঠানিক" রূপ লাভ করার পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক উপস্থিতির এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কোনো পরিবর্তন হয়নি,– 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন রিপোর্টে পাহাড়ি জনগণের জীবনের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, সে চিত্র আমাদেরও অজানা নয়। কিভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সেখানকার জনগণের জমি-জমা দখল করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে বাঙালিদের মধ্যে সেগুলো বণ্টন করা হচ্ছে, কিভাবে সেখানে পাহাড়িদের জন্য কাজের সংস্থান ক্রমশ কমে আসছে, কিভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব পাহাড়ি জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে তার রিপোর্ট আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং অনেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এই সব রিপোর্টের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন রিপোর্টের কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

উপরিউক্ত মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও অথবা সামান্য থাকলেও তার ওপর পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত যে নির্যাতন পাহাড়ি জনগণের ওপর চালানো হয় সেটা হচ্ছে তাঁদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান করার চেষ্টা এবং সামরিক বাহিনীর লোকজন কর্তৃক পাহাড়ি নারীদেরকে ধর্ষণ করা, শিশুদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করা, যুবকদের ওপর নানা রকমভাবে আক্রমণ চালানো এবং তাদেরকে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি। এসব বিষয়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঙলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই দুইভাবে পাহাড়ি জনগণের জীবন, জীবিকা ও জীবনধারা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রথমত সমগ্র এলাকাতে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা: রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে সামরিক উপস্থিতি ব্যাপক ও জোরদার করে সেখানে নানাভাবে শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত সমতলভূমি থেকে বাঙালিদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের বসতি স্থাপন করে তাদেরকে জমি বরাদ্দ করা, তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি এবং অবাঙালি জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে পাহাড়ি জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা।

একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই দ্বিতীয় নীতি ও দ্বিতীয় ধরনের কার্যকলাপ বেশি বিপজ্জনক। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে শোষক-শাসক শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের একটি অংশ অপর একটি অংশকে শত্রু মনে করছে এবং শাসক শ্রেণী শত্রুতা বাঁধিয়ে রেখেছে। এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এজন্য যে, সরকার যে বাঙালিদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করছে তারা অবস্থাপন্ন অথবা সম্পত্তিশালী বাঙালি নয়। তারা এমন এক শ্রেণীর বাঙালি যারা নিজেরাও ভূমিহীন, সহায়সম্বলহীন, যারা নিজেরাও বলতে পারে, "জীবন আমাদের নয়"। জীবন তাদের না হওয়ার কারণেই তারা নিজেদের সমতলভূমির গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায়, পাহাড়ি অঞ্চলের নতুন পরিবেশে, জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে বাঙলাদেশের এক অঞ্চলের শোষিত নির্যাতিত কিছু লোককে অন্য অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সেখানকার শোষিত নির্যাতিত জনগণের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে রেখে তাদের উভয়ের শত্রুরা অর্থাৎ শোষক-শাসকরাই লাভবান হচ্ছে।

জাতিদ্বন্দ্বে ঘটনাচক্রে জড়িত জনগণের এই দুই অংশের মধ্যেই চেতনার অভাব আছে, যে কারণে তারা নিজেদের সাধারণ শত্রুকে চিহ্নিত করতে না পেরে পরস্পরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, ঠিক যেমনটি হিন্দু-মুসলিম অথবা বাঙালি-বিহারিরা বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সাধারণ শত্রুর স্বার্থ উদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে সমতলভূমিতে নির্যাতিত বাঙালিদের মধ্যকার কিছু অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করা সত্ত্বেও সেখানে পাহাড়িদের তুলনায় বাঙালিদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। কারণ সমতলভূমিতে শোষক-শাসক শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনে জমিজমা সহায়সম্বল হারালেও পাহাড়ি অঞ্চলে তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কিছুটা হলেও লাভ করছে, যদিও সেটা তাদের জীবনের মান খুব উন্নত করছে সেটা বলা চলে না। উপরন্তু পাহাড়িদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সেখানে তাদের মধ্যে এক নতুন ধরনের নিরাপত্তার অভাব ঘটছে যে অভাব সমতলভূমিতে তাদের ছিল না। পাহাড়িদের ওপর যেমন বাঙালিদের, বিশেষত বাঙালি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ চলছে, তেমনি বাঙালিরাও মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবেই আক্রান্ত হচ্ছেন পাহাড়িদের দ্বারা। এভাবে সরকারের ফরারফব ধহফ ৎঁষব নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকর হচ্ছে।

পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জনসংহতি সমিতি' ও 'শান্তি বাহিনী' নামে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও সক্রিয় রয়েছে। এ দুয়েরই সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে 'জনসংহতি সমিতি' এবং সামরিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে 'শান্তি বাহিনী'। এই সত্যটিকে অস্বীকার করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। 'শান্তি বাহিনী' ভেঙে দিয়ে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার অথবা ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদেরকে ফিরে আসার সরকারি আহ্বান কিছুতেই বাস্তবত ফলপ্রসূ হতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশ সরকারের সামরিক বাহিনীর বর্তমান উপস্থিতি প্রত্যাহার করা না হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা না হয়।

এখানে বিস্ময়কর (?) ব্যাপার এই যে, বাঙলাদেশের বাঙালিরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এলেও তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসন সম্পর্কে ঠিকমতো খবরাখবর রাখেন এবং অতি অল্পজনই এই সামরিক শাসনের বিরোধী। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামীর মতো সরাসরি পুঁজিবাদী দলগুলো তো বটেই এমনকি বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলোর মধ্যেও এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, যদিও এই শেষোক্তরা কালে-ভদ্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করে থাকেন।

আসলে আমাদের দেশে সামরিক শাসনের একটা বাহ্যিক অবসান ঘটলেও যে ভিত্তির ওপর সামরিক শাসন দাঁড়িয়েছিল সেই স্বৈরতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ভিত্তির কোনো পরিবর্তন সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও না। তাই সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র এখনো বজায় আছে এবং সে কারণে জনগণের জীবনেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। সারা বাঙলাদেশের কোনো অংশেই শ্রমজীবী জনগণের জীবনও আসলে তাঁদের নিজেদের নয়। তাঁরাও পাহাড়ি জনগণের

মতোই বলতে পারেন, 'জীবন আমাদের নয়'। বাঙালি-অধ্যুষিত এলাকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা এবং অবাঙালি এলাকায় সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী থাকা মোটে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্যই কারা প্রকৃত গণতন্ত্রী, জনগণের স্বার্থের জন্য প্রকৃতপক্ষে কারা দাঁড়ায় তার হিসেবের ক্ষেত্রে বাঙালি-অবাঙালির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য অথবা তারতম্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উর্দুর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন করেছিলেন বলে যাঁরা নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন তাঁরাই যখন পাহাড়ি জনগণকে নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে বাঙালি হয়ে বাংলা চর্চার উপদেশ বা নির্দেশ দেন, তখন তাঁদের বাংলা ভাষা-প্রেম ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

'বাঙালি বনাম বাঙলাদেশী' নামে এক ধরনের বিতর্ক আমদানি করে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একটি সহজ সরল ব্যাপারকে ঘোলাটে করে জনগণকে নানাভাবে আজ বিভ্রান্ত করছে। আসলে বাঙালি ও বাঙলাদেশীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বাঙলাদেশের অধিবাসী হিসেবে, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরী, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি সকলেই বাঙলাদেশী। কাজেই বাঙলাদেশী হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার মধ্যে মুসলমানিত্ব অথবা সাম্প্রদায়িকতা নেই, যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও উগ্রজাতীয়তাবাদীরা এভাবেই ব্যাপারটিকে উপস্থিত করে থাকে। বাঙলাদেশের অধিবাসীদের সকলকে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে বাঙলাদেশী শব্দটি ব্যবহারের যারা বিরোধিতা করে তারা উগ্রজাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জীবন, জীবনযাত্রা ও সংগ্রাম প্রসঙ্গে এসব কথা বলা দরকার এ জন্য যে, যারা বাঙলাদেশে প্রকৃত একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করছেন তাঁদের পক্ষে পার্বত্য চট্রগামের পাহাড়ি জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে উপেক্ষা করা চলে না। উপরন্তু পাহাড়িদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে পাহাড়িদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে গ্রথিত করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র এভাবেই বাঙালি এবং পাহাড়িসহ অপরাপর সংখ্যালঘু জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের জীবনকে পরিবর্তিত করা সম্ভব যাতে "জীবন আমাদের নয়"-এর পরিবর্তে তাঁরা জোর গলায় ঘোষণা করবেন, "জীবন আমাদের"।

দুই

পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন ও তার থেকে মুক্তির সংগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপরে যে শোষণ-নির্যাতন এখন জারি রয়েছে সেটা নতুন নয়। যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা জারি রয়েছে তার মধ্যেও কোনো নতুনত্ব নেই।

যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় জাতিদ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য বিশ্বে এমন কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নেই যেখানে জাতিদ্বন্দ্ব অনুপস্থিত অথবা তুলনায় শক্তিশালী জাতি দুর্বলতর জাতি ও জাতিসত্তার ওপর শোষণ-নির্যাতন অব্যাহত রাখে না। শুধু তাই নয়; যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিসমস্যার সমাধান করে সেখানে শ্রেণীশোষণের ভিত্তি উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার সঙ্গে তাল রেখেই জাতিগত শোষণ নিপীড়নও বন্ধ করা হয়; পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাসমূহকে উন্নত করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপই নেওয়া হয়। কিন্তু সেই দেশটিতে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তাহলে, সেই সঙ্গে শ্রেণীশোষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে জাতিগত শোষণনিপীড়নও যথাসাধ্য পুরাতন কায়দাতেই আবার শুরু হয়, ঠিক যেমনটি ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে।

শ্রেণীশোষণ ও জাতিগত শোষণ, আঞ্চলিক শোষণ ও বৈষম্য ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে অকারণে কোনো সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে না। এটা ক্রিয়াশীল থাকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কারণে এবং সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী। এর ওপর কোনো বিশেষ ব্যক্তির কোনো হাত থাকে না। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষ, সে ব্যক্তি যতই বৃহৎ ও মহৎ হোক না কেন।

১৯০০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার ঐরষষ ঞৎধপঃং জবমঁষধঃরড়হ ১৯০০ নামে যে আইনটি প্রণয়ন করেন সে অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদের জন্য এলাকাটি বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ১৩টি জাতিসত্তা দ্বারা গঠিত এই আদিবাসীরা ব্যতীত অপর কোনো এলাকার লোকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ অথবা বসবাসের জন্য এই আইন অনুযায়ী বিশেষ অনুমতি বা ডেপুটি কমিশনার প্রদত্ত পারমিটের প্রয়োজন হত এবং তাদেরকে এই পারমিট দেয়া হত এক বৎসরের জন্য।

সেই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের কোনো চেষ্টা না থাকলেও তাদের জীবন কিছুটা নিশ্চিন্ত রাখার, নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির রীতিনীতি অনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপনের একটা নিশ্চয়তা ছিল।

ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার এই অঞ্চলের জনগণের জন্য তখন এই ব্যবস্থা নির্ধারণ করার কারণ তাদের জাতিগত নিপীড়ন-বিমুখতা নয়। এ কারণে যে, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রবিভক্তির পর যেভাবে প্রতিটি অঞ্চলে শোষণ-নিপীড়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তখনকার আমলে সে সুযোগ ছিল না বলে সেটা তৎকালে তারা করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজেদের শোষণ-নিপীড়নের জন্য সেভাবে ব্যবহার করার মতো অর্থনৈতিক অবকাঠামোও সে আমলে তৈরি হয়নি। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ঐরষষ ঞৎধপঃং জবমঁষধঃরড়হ ১৯০০-এর প্রায় সমস্ত কিছুই বাতিল করে দিয়ে এই অঞ্চলে

শ্রেণীশোষণের সঙ্গে তাল রেখে জাতিগত নিপীড়নের পথ অবাধ ও প্রশস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জাতিগত নিপীড়ন প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে ও সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার এবং সেটি হল এই যে, নিপীড়ন শ্রেণীশোষণেরই একটি বিশেষ দিক। এজন্য যে সমাজে জাতিগত নিপীড়ন আছে সেখানে শ্রেণীশোষণের অস্তিত্ব অবধারিত এবং যে সমাজে শ্রেণীশোষণ আছে সেখানে যদি একাধিক জাতির বাস থাকে তাহলে সেখানে কোনো না কোনোভাবে জাতিগত শোষণ এবং দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকবেই। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এক্ষেত্রে দেশটি উন্নত অথবা পশ্চাৎপদ যে কোনো ধরনের হতে পারে; কারণ এই সম্পর্ক পশ্চৎপদতার অথবা উন্নতির থেকেই সৃষ্টি হয় না; প্রধানত শ্রেণীশোষণ এই সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং তাকে জায়মান রাখে।

এ বিষয়টি বিশেভাবে খেয়াল রাখা দরকার এ কারণে যে, এদিকে খেয়াল না থাকলে জাতিগত শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম নানাভাবে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনাকে বিশ্বের অনেক দেশে ও সমাজে বাস্তব রূপ লাভ করতে দেখা গেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামও এদিক দিয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

দুর্বল জাতি অথবা জাতিসত্তার ওপর শোষণ-নিপীড়ন জারি রাখার জন্য, সেটাকে ব্যাপকতা প্রদানের জন্য দরকার সেই জাতি ও জাতিসত্তা-অধ্যুষিত এলাকায় অধিকতর শক্তিশালী জাতির লোকদের অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে "পাহাড়িয়া অঞ্চল" হিসেবে সংরক্ষিত না রেখে সেখানে বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐরষষ ঞৎধপঃং জবমঁষধঃরড়হ ১৯০০-এর গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধগুলো বাতিল করেন। তারপর থেকেই ধীরগতিতে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের এই অনুপ্রবেশ শান্তিপূর্ণ অথবা নিরুপদ্রব ছিল না। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তারই সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভাঙন সৃষ্টির সব রকম প্রক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭১ সালের পর থেকে এই প্রক্রিয়া সেখানে এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক প্রতিনিধিদল বাঙলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অঞ্চলকে নিজস্ব আইন পরিষদ-সম্বলিত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার এবং তার জন্য বাঙলাদেশের নতুন সংবিধানে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

এই দাবি উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং প্রতিনিধিদলটিকে বলেন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন না করে তারা নিজেরাই যাতে বাঙালি হতে পারেন সেই চেষ্টা তাদেরকে করতে হবে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ

সরকারের প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য জনগণের প্রতি এই একই উপদেশ খয়রাত এবং হুমকি প্রদর্শন করেছিলেন (তৎকালীন পত্রপত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

শুধু হুমকি প্রদর্শনই নয়, সেই হুমকির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের, সেখানকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি। উপরন্তু পাকিস্তানি আমলের থেকে অধিকতর হারে সেখানে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং সেখানে তাদেরকে বসতি স্থাপনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম-সম্পর্কিত যে নীতি কার্যকর হতে শুরু করে তার বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং প্রতিরোধও হতে থাকে। সংগঠিত এই প্রতিরোধের একটা প্রতিফলন ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনেই আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর (আওয়ামী লীগ ও জাসদ) প্রার্থীদের পরাজয় এবং মানবেন্দ্র লারমাদের নির্বাচনে জয়ের মধ্যে।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাত হয়ে জিয়াউর রহমানের কর্তৃত্বাধীন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বাধীন 'জনসংহতি পরিষদ বেআইনি ঘোষিত হলে দলটি নিজেকে বিলুপ্ত না করে গোপন সংগঠনে রূপান্তরিত করে এবং তারপর 'শান্তিবাহিনী' নামে এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত হয়।

এই সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান এক দ্বিমুখী নীতি নির্ধারণ করেন। একদিকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে থাকেন এবং অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম মোকাবেলার লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণের (১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার) বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন সেনাবাহিনীর এক অবিরাম সশস্ত্র অভিযান। এই দ্বিমুখী আক্রমণের মাধ্যমে একদিকে সেখানকার আদি অধিবাসীরা যেমন নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হতে থাকেন তেমনি অন্যদিকে নানা ধরনের সশস্ত্র সরকারি বাহিনীর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে তাঁদের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকে যার কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত বা পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাদের ইতিহাসে নেই।

এই নির্যাতন ও শোষণপ্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে মৌলিক কারণে মুজিবের আওয়ামী লীগ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ওপর শোষণ-নির্যাতনের এক নতুন প্রক্রিয়া জারি করা হয় সেই একই কারণে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে তার ব্যাপকতা এবং নির্মমতা বৃদ্ধি পায়। এবং সে কারণটি হল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পর নতুন বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা জনগণের কোনো অংশ ছিল না। তারা ছিল এ দেশের শোষক শ্রেণীর অংশ এবং প্রতিনিধি। পাকিস্তানি আমলে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ছিল ছোট তরফের শোষক। এই শোষকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ-শাসন নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা

করতে নিযুক্ত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণসহ সারা বাঙলাদেশের জনগণের ওপর চালিয়ে যায় এক তীব্র শোষণ-নির্যাতনের রাজত্ব। শুধু তাই নয়, এই বুর্জোয়ারা বা নব্য-ধনিকরা মূলত ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক বুর্জোয়া হওয়ার কারণে এদের চারিত্রিক মান হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান বাঙলাদেশের জনগণের ওপর যে শোষণ-নির্যাতন জারি রাখেন ও সেই শোষণ-নির্যাতন ব্যবস্থাকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিতে থাকেন তার সাথে সম্পর্কিতভাবেই তাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের পার্বত্যনীতি বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে এবং সেটা বুঝতে সক্ষম হলে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বর্ধিত অনুপ্রবেশ নীতি, জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ১৯৭৬ সালের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭৮ সালে উপজাতীয় কনভেনশন (Tribal convention), এরশাদের আমলের সামরিক অভিযান, গুচ্ছগ্রাম, পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা এবং এ সবের তাৎপর্যও উপলব্ধি করা সহজ হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে বিরাট সংখ্যক বাঙালিকে বসতি স্থাপনের জন্য ঠেলে দেয়া হচ্ছে তারা নিজেরাও-যে নিজেদের এলাকা থেকে শোষণ ও দারিদ্র্যের চাপে উৎখাত হয়েই অন্যত্র জীবিকা ও কাজের সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হচ্ছেন এ বিষয়টি ভুলে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি জনগণ নিজেদের সংগ্রামকে সঠিক পথে চালনা করতে পারবেন না।

আগেই বলা হয়েছে যে, জাতিগত নিপীড়ন কোনো সমাজে সাধারণ শোষণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই যাঁরা শোষিত হতে হতে নিজেদের ভিটে ও জমিজমা থেকে এবং এলাকা থেকে উৎখাত হচ্ছেন তাঁরা অধিকতর নিপীড়িতদের মধ্যে গিয়ে কিছুটা সুবিধা লাভের চেষ্টা করছেন। শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা করছে। পরিস্থিতির এ দিকটি যাতে অনুপ্রবেশকারীরাও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন তার জন্যও পাহাড়ি জনগণকে প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং সেইভাবে তাদের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা সংগঠিত করতে হবে। কারণ অনুপ্রবেশকারীদের একটি অংশকে হাতিয়ার হিসেবে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের ও শোষকদের প্রতিনিধিরা ব্যবহার করলেও অন্যেরা সেরকম নয়। তাদের অধিকাংশই নিজেরা দারুণভাবে শোষিত এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকবলিত।

এদিক দিয়ে বিচার করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী ১৩টি জাতিসত্তার জনগণ এবং অনুপ্রবেশকারী বাঙালি জনগণের একটি ঐক্যের ভিত্তি আছে এবং সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। এবং সেটা করতে পারলেই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে (যেখানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই অনুপ্রবেশকারী বাঙালি) বাঙালিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনধারণ-ব্যবস্থা সংরক্ষিত এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্কিত হয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তার জনগণকে যেমন নিজেদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি তাঁদের সংগ্রামকে করতে হবে সমগ্র বাঙলাদেশের শোষণ ও শোষণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য। এক দিক দিয়ে এই দ্বিতীয় সংগ্রামই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, শোষণমুক্ত বাঙলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম না হলে এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে, শুধু এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো নয়, কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই যথার্থ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়।

তিন

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় নিপীড়ন ও প্রতিরোধ আন্দোলন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ওপর যে ধরনের নিপীড়ন হচ্ছে এবং এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ যে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করছেন তার মধ্যে বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতাসীন হলে সবসময়ে তারা দুর্বলতর জাতি অথবা জাতিসমূহের ওপর যে নিপীড়ন চালায় সেই নিপীড়নই সেখানে চলছে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের কথা বাদ দিয়ে যদি বাঙলাদেশ আমলের কথা বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, আওয়ামী-বাকশালীদের শাসন থেকে বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারের শাসন পর্যন্ত এ পরিস্থিতির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। বরং জাতিগত নিপীড়নের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে সেই নিপীড়নের মাত্রা ও ব্যাপকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবে নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করতে গিয়ে একপর্যায়ে সামরিক বাহিনীকে মাঠে নামাতেই হয়। এদিক দিয়েও এখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী-বাকশালী আমলে পাহাড়ি জনগণের ওপর নিপীড়নের যে মূলনীতি ও লাইন উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রণীত ও নির্ধারিত হয়েছিল সেই লাইনই ধারাবাহিকভাবে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, পরবর্তী কালের বিএনপি সরকারের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে শাসকদল বা সরকার বেসামরিক নাকি সামরিক, স্বৈরতন্ত্রী নাকি গণতন্ত্রী– এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ বাঙলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হোক, যেভাবেই তারা ক্ষমতায় আসুক, তারা প্রত্যেকেই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই প্রতিনিধি। এবং এই প্রতিনিধিত্বের কারণেই তারা অপরাপর দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর তাদের নিপীড়ন অব্যাহত রাখে।

যে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এভাবে অন্য জাতি ও জাতিসত্তার ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালায় তাদের সম্পর্কে একটা ধারণা খুব স্পষ্ট থাকা দরকার। সে ধারণাটি হল, এই উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কখনো দরিদ্র শ্রেণীর, শ্রমজীবী জনগণের বন্ধু নয়। এরা অধিকাংশ মানুষের, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মেহনতি মানুষের ওপর কায়েম রাখে তাদের শোষণ-নিপীড়নের রাজত্ব। বাঙলাদেশ এদিক দিয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়। কাজেই বাঙলাদেশের এই উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষক-শাসক শ্রেণীর

একটি অংশ, অর্থাৎ উপরতলার অংশ তাদের শোষণ-শাসনের দ্বারা নিজেরা লাভবান হলেও, রাতারাতি মুনাফার পাহাড় বানালেও, অধিকাংশ বাঙালি এই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারাই শোষিত ও নিপীড়িত।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "যে জাতি অন্য কোনো জাতির ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালায় সে জাতিভুক্ত জনগণ নিজেরাও স্বাধীন নয়।" এ কথায় সত্যতা উপলব্ধির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞান ও বিদ্যার প্রয়োজন হয় না।

পাহাড়ি জনগণের ওপর যে শোষণ-নিপীড়ন আজ চলছে সে প্রসঙ্গে এ সব কথা বলার প্রয়োজন এ কারণেই যে, যে কোনো সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়ে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তার চরিত্র যদি সঠিকভাবে জানা না থাকে তাহলে সে সংগ্রাম কখনো প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু শত্রু-মিত্র গুলিয়ে ফেলে বা একাকার করে সংগ্রাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়।

পাহাড়ি জনগণের ওপর যারা নিপীড়ন করছে, তারা তাঁদেরকে জমিজমা ও বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করছে, তাঁদের জীবিকার পথ বন্ধ করছে, তাঁদের গৃহে অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ করছে, স্বদেশভূমিতে পরবাসী করে রাখছে, সংস্কৃতির ওপর হামলা করছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করছে তারা যে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষক একথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি খুব ভালোভাবে ও সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হল, নিপীড়নকারী এই উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষকরা বাঙালি হলেও বাঙলাদেশের সকল বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী বা শোষক নয়। উপরন্তু তাদের অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় নিপীড়ন এবং দেশীয় উগ্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শোষকদের শোষণের শিকার। এই উগ্র জাতীয়তাবাদী ও জাতীয় সাম্রাজ্যবাদীরাই পাহাড়ি জনগণের ওপরে তাদের শোষণ-নিপীড়ন জারি রেখেছে।

এ বিষয়টি খেয়ালে রাখলে এই বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যে, বাঙালি মাত্রেই কিন্তু পাহাড়ি জনগণের শত্রু নয়। এই বিভ্রান্তির খপ্পরে পতিত হলে পাহাড়িদের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম কখনো সঠিক পথে পরিচালিত হবে না, উপরন্তু সে সংগ্রামের পথে এমন সব বাধা অকারণে সৃষ্টি হবে যে ধারা অতিক্রম করা এক মহাকঠিন ও দুরূহ ব্যাপার এমনকি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

নিপীড়িত ও শোষিত বাঙালি জনগণের মধ্যে পাহাড়ি জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির অভাব নেই। পাহাড়িদের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অব্যাহত রয়েছে। এই বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পাহাড়ি জনগণের অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে শক্তির এক বিরাট উৎস।

একথা জনগণের শত্রুরাও জানে এবং পাহাড়ি ও সমতলভূমির জনগণের থেকেও তারা সাধারণভাবে অনেক বেশি জানে। এজন্যই তারা ক্রমাগত চেষ্টা চালায় শ্রমজীবী বাঙালিদের, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন বাঙালিদের থেকে পাহাড়ি জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই ধরনের জনশত্রু পাহাড়িদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক থাকা

স্বাভাবিক এবং আছেও। এদের একাংশকে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের দালাল বানিয়ে সাধারণ পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে।

এ-তো গেল যারা দালালি করে তাদের কথা। কিন্তু যারা দালালি করে না, উপরন্তু নিজেদের অর্থাৎ পাহাড়ি জনগণের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করে তাদের একাংশও এই সংগ্রামে নিযুক্ত থেকেও নিজেদেরকে ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। এমনকি শত্রুভাবাপন্ন পর্যন্ত হয়ে পড়ে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, বাঙালি মাত্রই পাহাড়ি জনগণের, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতি বা জাতিসত্তার শত্রু।

পাহাড়ি অঞ্চলের জুম্ম জনগণ ও সমতলভূমির বাঙালি জনগণের মধ্যে এই বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করে বিষয়টিকে কাজে লাগানোর একটি উপায় হিসেবে শাসকশ্রেণী একের পর এক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বসতি স্থাপনকারীরা কারা? এরা কি বাঙালি ধনিক শ্রেণীর লোক, না এরা দরিদ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর, ভূমিহীন কর্মহীন বেকারদের একটি অংশ? এরা যে এই দ্বিতীয় ধরনের তাতে সন্দেহ নেই এবং একথা বিশেষত পাহাড়ি জনগণের সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের জানা আছে।

এই দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সরকার তাঁদেরকে জমিজমা দিচ্ছে। এ জমি কাদের? নিশ্চয়ই বাঙালিদের নয়। আসলে পাহাড়ি জনগণকে তাদের জমিজমা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেই এই জমির ওপর দরিদ্র বাঙালিদের বসানো হচ্ছে।

এভাবে গরিবদেরকে জমিতে বসানোর পর উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পাহাড়িরা যখন নিজেদের জমিজমা ফেরত পাওয়ার দাবি করছেন তখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরাও গরিব। কাজেই তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করলে তারা যাবে কোথায়? তাদের জীবিকার কী ব্যবস্থা হবে?

সরকার কর্তৃক যে বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করা, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব জুম্ম জনগণের নয়। সে দায়িত্ব সরকারের। কাজেই দরিদ্র ভূমিহীন মানুষদের জন্য সরকার যদি এতই দরদ অনুভব করেন তাহলে সে ব্যবস্থা তাদের জন্য সমতলভূমিতেই করা উচিত। সে ব্যবস্থা করা উচিত এই দরিদ্র ভূমিহীনদের নিজেদেরই গ্রামাঞ্চলে বড়ো জমি-মালিকদের অন্তত কিছু জমি অধিগ্রহণ করে সেটা গরিবদের মধ্যে বণ্টনের দ্বারা। এটাই হল এ সমস্যার সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক সমাধান।

কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কোনো সরকারই এ সমস্যা সমাধান এভাবে করতে চায় না। সেটা করার তাগিদ ও দায়িত্ব যদি তারা বোধ করত তাহলে বাঙলাদেশে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই তারা সেটা করতে পারত।

তারা এ কাজ করতে সক্ষম হয় না; কারণ এটা করলে শোষকশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত না করে তা করা যায় না। আর শোষকশ্রেণীর সরকার যে তার নিজের শ্রেণীর

বিরুদ্ধে এভাবে যেতে পারে না একথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না।

কাজেই আসল যে কারণে গরিব ভূমিহীন বাঙালিদের জন্যে একের পর এক উগ্র জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সরকার কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হল, পাহাড়ি জনগণের সাথে বাঙালিদের একটা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিজেদের শোষণ-শাসন ব্যবস্থাকে সেখানে নিরাপদ রাখা। পাহাড়ি জনগণকে শুধু সামরিক শাসনের মধ্যে রেখে তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য বেসামরিক দরিদ্র মানুষদেরকেও তারা পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

যে ভূমিহীন দরিদ্র বাঙালিরা প্যাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিরুপায় হয়ে সেখানে যাচ্ছেন। বলা চলে যে তাঁদেরকেও তাঁদের গ্রাম ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেই পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা খুব জোর দিয়েই বলা যাবে যে, সমতল ভূমির গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিহীন মানুষ, বেকার ও জীবিকার উপায়হীন মানুষ, যদি নিজের এলাকায় জীবিকার কোনো সংস্থান করতে পারতেন তাহলে অপরিচিত এবং তাঁদের জন্য অসুবিধাজনক পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁরা যেতেন না। তাঁর বাস্তবত সেখানে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বাঁচার তাগিদে। কিন্তু জীবিকার জন্য তাঁরা পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে পাহাড়িদের জীবিকার ব্যবস্থাকে অনিশ্চিত করছেন। নিজেদের বাঁচার তাগিদে সেখানে গিয়ে তাঁরা পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের জীবন ধ্বংসের সরকারি চক্রান্তের কলকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন বা হতে বাধ্য হচ্ছেন।

শুধু সাধারণভাবে বাঙালিদের প্রতিই নয়, এই বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের প্রতিও পাহাড়ি জনগণের, সেখানকার স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের সংগ্রামে নিযুক্ত পাহাড়িদের কী দৃষ্টিভঙ্গি হবে সেটা তাঁদের সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, এই বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদেরকেই সরকার পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এভাবে যাতে তারা এদেরকে ব্যবহার করতে, অন্তত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে পাহাড়িদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নিজেদের জমি ফেরত পাওয়া, নিজেদের ভিটেমাটিতে আবার বসতি করার দাবি পাহাড়িদেরকে বর্জন করতে হবে। মোটেই তা নয়। যে বাঙালিদেরকে সেখানে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পাহাড়িদের জায়গা থেকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের অনেকেই বাস্তবত সরেও আসতে চান, কারণ সেখানে জমিজমা সামান্য পেলেও যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাঁদেরকেও জীবন কাটাতে হয়, যে অনভ্যস্ত পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেটা তাঁদের পক্ষেও রীতিমতো এক কষ্টকর ব্যাপার।

কিন্তু কষ্টকর হলেও নিজেদের নতুন-পাওয়া পাহাড়ি এলাকার জমিজমা ছেড়ে আসাও তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার, অনেকের পক্ষে এখন অসম্ভবও। কারণ জীবিকার কোনো বিকল্প সংস্থান তাঁদের নেই।

জীবিকার বিকল্প সংস্থানের ওই দাবি পাহাড়ি জনগণ ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যেও আপাত বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐক্য ও সমঝোতার এক গণতান্ত্রিক ভিত্তি। এর দ্বারা একদিকে যেমন জমি ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া পাহাড়িদের পক্ষে নিজেদের জমি ও ভিটেয় ফিরে আসা সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে সম্ভব ভূমিহীন ও দরিদ্র বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য সমতলভূমিতে জমি অথবা কাজের ব্যবস্থা করে তাঁদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের জমি ও ভিটেবাড়ি ফেরত পাওয়ার ব্যাপারটি এখন বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা বিকল্প জমি প্রাপ্তির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে গেছে। দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে এদেশের শোষক শ্রেণীর সরকারগুলোই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এইভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতি এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক সাধারণ পরিস্থিতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হতে পারে বাঙলাদেশে ব্যাপক ও মৌলিক ভূমি সংস্কার-এর মাধ্যমে, যে সংস্কারের মাধ্যমে অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের মালিকানাধীন অতিরিক্ত জমি জাতীয়করণ করে সরকারের হাতে নিয়ে আসা যাবে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় বাঙলাদেশের শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এই কাজ এদেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত, এ আন্দোলনের বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত। এ আন্দোলন ও এই বিজয় তাই একদিকে যেমন বাঙলাদেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের, তেমনি একইভাবে পাহাড়ি জনগণের। সমতলভূমির শ্রমজীবী বাঙালি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী জীবনের এটাই হল ঐক্যসূত্র। উভয়ের গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকারের সংগ্রাম, উভয়ের মুক্তিসংগ্রাম এভাবেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এখন যে শুধু নিজেদের জমিজমা হারিয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দেশে-বিদেশে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে মানবেতর এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করছেন তাই নয়। যাঁরা ভিটে থেকে উচ্ছেদ হননি, এখনো যাঁরা নিজেদের জমির ওপর থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁদের জীবনেও নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। তাঁদের নারীদের ওপর নির্যাতন চলছে। তাঁদের ওপর জারি আছে এক সামরিক শাসন যে শাসন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সরকার চাপিয়ে রেখেছে। তাছাড়া সাধারণভাবে জুম্ম জনগণের সংস্কৃতির ওপর নানাভাবে আক্রমণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে।

এসবের বিরুদ্ধে পাহাড়ি জনগণ সংগ্রাম করছেন। এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা দরকার তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ ও আলোচনা করা হল। তবে এক্ষেত্রে মূল যে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার সেটা হল,

উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙালিদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়ে নিজেরাও এক ধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদীতে পরিণত না হওয়া। পাহাড়ি জনগণ যাতে ঠিক এই ফাঁদেই পতিত হন তার জন্য বাঙালি বুর্জোয়া শোষকশ্রেণী ও তাদের সরকার এবং সেই সাথে একাধিক বৈদেশিক শক্তি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ চেষ্টা তাদের অব্যাহত থাকবে। কিন্তু পাহাড়ি জনগণের দেশীয় শত্রু এবং এক ধরনের বিদেশি বন্ধুদের এই চক্রান্ত পাহাড়ি জনগণকেই নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ, সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা এবং সঠিক সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রতিহত করতে হবে। তাঁদেরকে এ কাজে অন্যেরা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এ সংগ্রাম মূলত তাঁদেরই সংগ্রাম। একে সংগঠিত ও পরিচালিত করার দায়িত্ব তাদেরকেই সঠিক ও সুষ্ঠু চিন্তা এবং সতর্কতার সাথে করতে হবে।

চার

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জাতীয় সমস্যারই অবিচ্ছেদ্য অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ ও ২০ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাটসহ ১১টি গ্রামে সেনাসদস্যদের সহায়তায় কিছু বাঙালি বসতকারী বা সেটেলাররা পাহাড়ি জাতিসত্তার স্থানীয় জনগণের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় পাহাড়িদের প্রায় ৫০০ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। আক্রান্ত পাহাড়িরা হামলা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এর ফলে ২ জন পাহাড়ি নিহত, ২৪ জন গুরুতর আহত হন এবং নিখোঁজ হন ২ জন। ওই ঘটনার কয়েকদিন পর ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সাজেকের ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মিছিলে একই চক্র আবার হামলা করে ও তারপর বিভিন্ন পাড়ায় পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়। সাতভাইয়াপাড়ায় আগুন দেয়ার সময় এলাকার লোকদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে পালানোর সময় আনোয়ার হোসেন নামে একজন সেটেলার আগুনের মধ্যে আটকে গিয়ে মারা যান। এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করে সমগ্র এলাকায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তার জন্য পাহাড়িদের দায়ী করা হয়। কোনো কোনো সংবাদপত্র এই ঘটনাকে ফলাও করে দেশে পাহাড়িদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদের দমন করার দাবি জানায়। কিন্তু পাহাড়িদের ওপর যে ব্যাপক আক্রমণ পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তারা নীরব থাকে। এসব থেকেই বোঝা যায়, কিভাবে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিতভাবে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত কার্যকর করছে।

বিগত ফেব্রুয়ারির এসব ঘটনার বেশ আগে থেকেই পাহাড়ি জনগণের ওপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকায় চালানো হয়েছে। এরপরও নানাভাবে সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাঙালি সেটেলারদের কিছুসংখ্যক লোক এ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে বলা দরকার, যে সেটেলারদের সরকার ও সেনাবাহিনী এভাবে

ব্যবহার করছে তারা নিজেরাও গরিব ও ভূমিহীন। সমতলের নানা অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে এসে পাহাড়িদের জমির উপর তাদের বসতি স্থাপন করা হয়েছে। সমতলের ভূমিহীনরা এভাবে পাহাড় অঞ্চলে জমি পাওয়ায় তাদের একটা স্বার্থ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। এ স্বার্থকে কাজে লাগিয়ে সমতলের গরিব ও পাহাড়ের গরিবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে শাসকশ্রেণী ও একের পর এক সরকার নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঠিক পর থেকেই সরকার পাহাড়িদের জাতিগত ও ভাষাগত অধিকারের বিরোধিতা করে নির্যাতনের যে নীতি নির্ধারণ করেছিল, সেই নীতিই পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে এখন পাহাড়িদের ওপর সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় বেসামরিক সেটেলারদের মাধ্যমে কার্যকর করা হচ্ছে। কিভাবে এ কাজ করা হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত হল ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি সাজেক এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির ঘটনাবলি। এ হিসেবে এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ও হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়। খুব পরিকল্পিতভাবে এসব কাজ করা হচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, হাসিনা-মনমোহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে (ইউপিডিএফ) সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য সেখানকার জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা, বিএনপিসহ কয়েকটি বাম দলের নেতৃবৃন্দ ও কিছুসংখ্যক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক জোর গলায় দাবি জানাচ্ছেন। পাহাড়ি জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্তু লারমা সরকারের সঙ্গে আপস করার পর ১৯৯৭ সালের চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে অরণ্যে রোদন করলেও তিনি এখন শাসকশ্রেণী ও সরকারের লোক। যে বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকরা ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার জন্য আওয়াজ দিচ্ছেন, তারাও সরকার ও শাসকশ্রেণীর অন্যান্য অংশের লোক। ইউপিডিএফ'র বিরুদ্ধে সরকার ও শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ এই আওয়াজ দিতে থাকার কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন ইউপিডিএফই সেখানকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের কথা বলছে। জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে নানা দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সংগ্রাম করে যাওয়ার কারণে তাদের ওপর সেনাবাহিনী, সরকার, শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ ও তাদের বুদ্ধিজীবীরা এ দলের ওপর মহাক্ষিপ্ত। তারা চায় এদের কার্যকলাপ বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মসৃণভাবে নিজেদের নীতি কার্যকর করতে। এটা তো হল তাদের সাধারণ লাইন। কিন্তু হাসিনা-মনমোহন চুক্তির পর ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার যে আওয়াজ নতুনভাবে তোলা হচ্ছে, এটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উপরিউক্ত চুক্তিতে বাংলাদেশের কোনো লাভ না হলেও ভারত তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রেখেই মূলত এ চুক্তি সম্পাদন করেছে। মনমোহন সিং মাওবাদীদের কার্যকলাপকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে স্বায়ত্তশাসন ও

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন যেভাবে শক্তিশালী হচ্ছে, সেটাও ভারত সরকারের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার, বন্দরের থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ভারত যে সুবিধা লাভ করেছে, তাতে তাদের পক্ষে এটা ওই অঞ্চলের আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। শুধু তাই নয়– আসাম, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বাংলাদেশ যেভাবে গ্রেফতার করে ভারতের হাতে গোপনে তুলে দিয়েছে, সেটাও চুক্তির আগে দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এই প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী ও আইনসম্মত করার ব্যবস্থা এই চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে। এভাবে ভারত নিজের নিরাপত্তা জোরদারের ব্যবস্থা করলেও এতে বাংলাদেশের কোনো স্বার্থ নেই। উপরন্তু বিপদ আছে। কারণ এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ যদি উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের আন্দোলন দমনের জন্য ভারত সরকারকে সাহায্য করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ সরকারকে ওই অঞ্চলের আন্দোলনকারী জনগণ ও তাদের দলগুলো কর্তৃক বন্ধু ভাবার কারণ নেই।

ভারতের কাশ্মীরে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মাওবাদীদের সশস্ত্র তৎপরতার মতো কোনো কিছু বাংলাদেশে নেই। এই নিরাপত্তা পরিস্থিতি বাংলাদেশে না থাকা সত্ত্বেও এটা তৈরির চেষ্টা এখন চলছে। এই চেষ্টার অংশ হিসেবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সন্ত্রাসী তৎপরতার কথা বলে ইউপিডিএফকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা ও সেই সঙ্গে পাহাড়ে সন্ত্রাস দমনের কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সন্তু লারমা থেকে নিয়ে উপরিউক্ত সব মহলই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আওয়ামী লীগের এক মন্ত্রী বলেছেন, ইউপিডিএফ'র সঙ্গে আসামের 'উলফার' সম্পর্ক আছে। এসব থেকে এটা সন্দেহ করা অমূলক নয় যে, হাসিনা-মনমোহন চুক্তির আওতাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের ওপর নতুনভাবে আক্রমণ পরিচালনা এবং সন্ত্রাস দমনের নামে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

সরকারি লোক হিসেবে নানা কাজ করতে গিয়ে সন্তু লারমা যে শুধু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাই নয়, নিজের দলের মধ্যেও তার পায়ের তলায় আর মাটি নেই। এর ফলে জনসংহতি সমিতি এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং দলের মধ্যে সন্তু লারমার বিরোধীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসেবে ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ির দীঘিনালার এক গ্রামে এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সন্তু লারমার নেতৃত্ব বর্জন করেছে এবং সন্তু লারমা'র দ্বারা অনুষ্ঠিত দলের নবম কংগ্রেসকে অগণতান্ত্রিক এবং অবৈধ ঘোষণা করে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সন্তু লারমাকে বাদ দিয়ে তারা গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠানের জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছে। এর থেকেই বোঝা যায়, ১৯৯৭ সাল থেকে সন্তু লারমা সরকারের যোগসাজশে নানা কাজ করে পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষা এবং পাহাড়ি-বাঙালি সখ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার কারণেই এখন নিজের দলের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। জনসংহতি সমিতির এই

ভাঙন এবং ইউপিডিএফ'র সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণ হয়, জনসংহতি সমিতি নয়, ইউপিডিএফ-ই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দরিদ্র ও নির্যাতিত পাহাড়ি জনগণ ও ভূমিহীন গরিব বাঙালিদের পরস্পরের বিরোধী হিসেবে দাঁড় করিয়ে শাসকশ্রেণীর একের পর এক সরকার ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য শক্তি সেখানে যেভাবে ক্ষুদ্র পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত-মূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, একে পরাজিত করার জন্য পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন আজ বড় আকারে দেখা দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এজন্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণই নয়, সমগ্র দেশের জনগণকেই সচেতনভাবে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যা যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তাতে এটা আর বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় কোনো সমস্যা নয়। এটা আজ বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

[লেখক: সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা]

প্র ব ন্ধ

'আদিবাসী'দের সমস্যা-সঙ্কট জটিল হয়ে উঠছে

ম ন জু রু ল আ হ সা ন খা ন

বাংলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘু, জনজাতি, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি যাই বলা হোক না কেন এদের সমস্যা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। যথাসময়ে সমস্যাগুলো সমাধানে মনোযোগ না দেয়ায় সমস্যার পাহাড় গড়ে উঠেছে। অপর দিকে বিভিন্ন পদক্ষেপের

মাধ্যমে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলা হচ্ছে। বাস্তব সমস্যার কারণে আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান, পারস্পরিক আস্থার অভাব, বৈষম্য-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা দূর করা বেশ কঠিন ব্যাপার হবে। ব্রিটিশ শাসন আমলে শাসক ও শোষকশ্রেণী পরিকল্পিত ভাবে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। পরে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৪৭ সনে অনেকেই দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন এই ভাবে, যে এক সাথে আর থাকা যাচ্ছে না, সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই আছে। তার চেয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়নি। সংঘাত-সংঘর্ষ আরও বেড়েছে। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে। মানব-ইতিহাসের এক সর্ববৃহৎ ও মর্মন্তুদ দেশত্যাগ ও অভিবাসনের ঘটনা ঘটেছে। সেই জের ধরে এখনও এ উপমহাদেশে চলছে দেশে দেশে যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও সহিংসতার ঘটনা। ভারতের কাশ্মির, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিভিন্ন জাতি, অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী, পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধের যেন কোনো শেষ নেই।

বাংলাদেশেও পরিস্থিতি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। গত দফায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে এলাকায় যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটে এবং পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে চুক্তি স্বাক্ষর করার পরও আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ় ছিল না। সরকার ও প্রশাসনের ভেতর থেকেও নানা রকম বাধা ছিল। বিএনপি-জামাত গোড়া থেকেই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল। তারা বলেছিল পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশ্য পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় এলে সেই 'বিচ্ছিন্নতার' বিপদ দূর করতে তারা চুক্তি বাতিলের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নেরও কোনো উদ্যোগ তারা নেয়নি। পার্বত্য এলাকায় চুক্তি-বিরোধী শক্তিকে তারা নানাভাবে উস্কে দিয়েছে। চলেছে পাহাড়িদের ভূমি দখল এবং পাহাড়িদের ওপর দমন-পীড়ন ও বৈষম্য।

আওয়ামী লীগ আবারও মহাজোটকে নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বটে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে চুক্তি অনুসারে সামরিক বাহিনীর একাংশ সরিয়ে আনলেও এখনও পার্বত্য এলাকায় সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য। বাস্তবে মনে হয় ঐ এলাকায় সামরিক শাসনই চলছে। বাঙালি এবং পাহাড়িদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্র জাত্যাভিমান সংক্রামক ব্যাধির মতো তীব্র হচ্ছে।

সমতলেও আদিবাসীদের ওপর চলছে নানা বৈষম্য ও নির্যাতন। সর্বত্রই আদিবাসীদের ভূসম্পত্তি দখলের ব্যাপারটা একটি বড় ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরেই

আদিবাসীদের ভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। শুধু আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই নয়– হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। বাংলাদেশে ভূমিদস্যুরা এখন সবচেয়ে শক্তিশালী ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সমতল এলাকাতেও খুন-হত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। আলফ্রেড সরেন, সরেল রিসিল, সত্যবাক হাজং একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে।

দেশের জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আজকের বিশ্বে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে সেগুলোর পেছনে প্রধানত তিনটি কারণ দেখা যায়। একটি হচ্ছে সম্পদের যুদ্ধ। তেল, গ্যাস, পানি বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি বলা যায় পরিবেশগত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায় অভিপ্রয়াণ-জনিত সমস্যা, এবং বিপর্যয়ের উৎস নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। তৃতীয়টি হচ্ছে জাতিগত বা নৃ-গোষ্ঠিগত সংঘাত।

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিগত্যবাদী শক্তি আজ বিশ্বজুড়ে তাদের শাসন-শোষণের জাল বিস্তারের জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। বাংলাদেশে জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা এত জটিল ছিল না। কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত উস্কে দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শতাধিক দেশি-বিদেশি এনজিও এখন কর্মরত। দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল মহল আদিবাসী এলাকা বা রোহিঙ্গাদের নিয়ে নানা চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠে। শতাধিক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধরনের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা অর্জন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ-চেতনা-মূল্যবোধকে ধারণ করে ৭২-এর সংবিধান রচিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭২-এর সংবিধানে একটি কলঙ্ক রয়ে গেছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘু, বিভিন্ন আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয় নাই। আদিবাসীদের মাতৃভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় নাই। আদিবাসীরা বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। পরিণতিতে বিভেদ অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যাচ্ছে যে সেখান থেকে ফেরা খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ৫ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর ৭২-এর সংবিধানে মূল ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনীর কথা বলা হচ্ছে। ৭২-এর সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর থেকে আমরা আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি তুলে আসছি। আদিবাসীদের

সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাদের ভাষা-সংস্কৃতিরও ঐতিহ্যের বিকাশ নিশ্চিত করে আমাদের কলঙ্ক অপসারণ করাটা আজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

পাহাড় ও সমতলে আদিবাসীদের ওপর যে বৈষম্য ও নির্যাতন করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। দখলকৃত ভূমি, পাহাড় ও বন ফিরিয়ে দিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধাবস্থার মতো সামরিক প্রাধান্য দূর করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। পাহাড়ি-বাঙালিরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মনোরম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ যুদ্ধের জন্য নয়, পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য যাতে ব্যবহৃত হতে পারে, তার জন্য ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ সামরিক-বেসামরিক খাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার অনেক গুণ অর্থ আমরা শুধু একটি সফল পর্যটন শিল্প গড়ে তুলেই আয় করতে পারি। সেই আয় দিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি সবাই সেখানে অনেক ভালো থাকতে পারবে।

[লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।]

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা: নিপীড়ন-বৈষম্যের অনন্ত ইতিহাস

খা লে কু জ্জা মা ন

আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশ জাতিসত্তার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শুধু এক পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ পুরো বাংলাদেশে কমপক্ষে ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবন-যাপন প্রণালী একের থেকে অপরের ভিন্ন শুধু নয়, নানা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত জাতিগুলো হল চাকমা, তঙচঙ্যা, মারমা (৩টি

ভাগ), খীয়াং বা খেয়াং, ত্রিপুরি, মুরং, ম্রো, খুমি, কিয়াং, বনযোগি, লুসাই, পাংখোয়া এবং চাক। এছাড়া বৃহত্তর রাজশাহী-দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিমাংশ, বৃহত্তর ময়মনসিংহের উত্তরাংশ, বৃহত্তর সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশ, বৃহত্তর পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজারের দক্ষিণাংশে বসবাসরত জাতিগুলো হল রাখাইন, সাঁওতাল, উরাও বা ওঁরাও (২০টি গোত্র), গারো, মনিপুরি (৩টি ভাগ), মুণ্ডা, বম, হাজং, হরিজন, খাসিয়া, কোচ, পাহাড়িয়া, ডালু, মাহাতো, মাহালি, শিসং, বসাক, সোরা, খন্দ, কর্মকার, পাহান, রাজুয়ার, মিখির, বক্তি, পাথ্র ইত্যাদি।

যে কোনো অগণতান্ত্রিক সমাজে বা রাষ্ট্রে নিপীড়ন এবং বঞ্চনার শিকার হয় সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অংশের মানুষ, নারী ও শিশুরা। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ রাষ্ট্রটির জন্মগত ঐতিহাসিক দুর্বলতার কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করে চলেছে এদেশের নারী, শিশু এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণ। সারাবিশ্বেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো নানামুখী শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। বহু শতাব্দী ধরে মূল সামাজিক জীবনের স্রোতের বাইরে তাদের অবস্থান। সমৃদ্ধির কোনো ছোঁয়া তাদের জীবনে পড়ে না, অথচ সভ্যতার নামে, কখনো কখনো উন্নয়নের নামে নিজ আবাসন থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের।

জাতি বলতে আমরা বুঝি ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা একটি স্থায়ী জনসমষ্টি যা একই ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক জীবন এবং একই সংস্কৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে গঠিত। এ বিচারে আমাদের এ অঞ্চলে, অর্থাৎ বাংলায় আধুনিক অর্থে জাতি গঠনের সূত্রপাত হয় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বিশেষত ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ভেতর দিয়েই তৎকালীন বেঙ্গল প্রভিন্সের সীমানার ভেতর বৃহত্তর বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসত্তা বোধ প্রথম জেগে উঠেছিল। কিন্তু ওই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আপসহীন জাতীয়তাবাদী মানবতাবাদী সেক্যুলার ধারার রাজনীতি পরাস্ত হয়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রাধান্যে চলে আসে। এ প্রক্রিয়াতেই ১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার ওপর পাকিস্তানি শাসকদের আঘাত নেমে এলে নতুন করে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার ঘটে। এ প্রক্রিয়া চলতে চলতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে, বঞ্চনা ও বৈষম্যের কবল থেকে মুক্তির জন্যই সেদিন বাংলাদেশের মানুষ লড়াই করেছিল। এ লড়াই করতে গিয়ে সেদিন বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের ওই ঐক্যের ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদী আবেগ যার নামকরণ হয়েছিল বৃহত্তর বাঙালি জাতির নামেই। যে কারণে যখন পাকিস্তানপন্থীরা শ্লোগান দিত, 'তুমি কে আমি কে – মুসলমান মুসলমান', এর বিপরীতে বাংলার মানুষ শ্লোগান দিত 'তুমি কে আমি কে –

বাঙালি, বাঙালি'। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটির সীমানার ভেতরে অবস্থানরত বাঙালি-চাকমা-মারমা-সাঁওতাল নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষ যে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তার নাম 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। কিন্তু স্বাধীন দেশে ওই সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে রক্ষার মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাদের ওপর একের পর এক নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দুঃখ ও হতাশার মূল কারণ হল জমি। যে জমির উপর তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাস করে আসছে, যে জমিকে তারা আবাসযোগ্য ও চাষযোগ্য করে গড়ে তুলেছে, সে জমি ক্রমাগত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে-সব জাতিগুলো পাহাড়ে ও বনাঞ্চলে তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল, যে বনভূমিতে তাদের অধিকার প্রাকৃতিক ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল, সে বনভূমি দ্রুত উজাড় হয়ে যাচ্ছে এবং পাহাড় ও বনের ওপর অধিবাসীদের অধিকারকে আধুনিক আইনের নানা জটিলতায় অস্বীকার করা হচ্ছে। তাদের সামাজিক উৎসব, তাদের সংস্কৃতি, নিজস্ব জীবনবোধ সবকিছুই আজ মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি। জমি ও অরণ্যের ওপর যে প্রাকৃতিক অধিকার তাদের জন্মেছিল, তা থেকে তারা আজ বঞ্চিত। পাহাড় ও অরণ্যের ভেতরেই এসব জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছিল। এতদিন বনভূমি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল, তারাও তাদের নিজস্ব তাগিদে ও নিজস্ব নিয়মে বনভূমিকে রক্ষা করে চলেছিল। তারা বনকে, বৃক্ষরাজিকে দেবতুল্য মানত। তাদের আজন্ম বিশ্বাস ছিল 'বৃক্ষ' না বাচঁলে মানুষ বাঁচবে না, পৃথিবী বাঁচবে না। তাদের জীবনে বেচাকেনা ছিল পাপ। অথচ পুঁজিবাদ সমস্ত কিছুকেই কেনাবেচার সামগ্রীতে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর নিপীড়ন চিত্রটি সবচেয়ে প্রবলভাবে দেখা দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। যদিও সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অবস্থাও কম নাজুক নয়। কিন্তু সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো যেহেতু এককভাবে কোনো একটি এলাকায় বসবাস করে না ফলে তাদের ওপর নিপীড়ন ও বঞ্চনার চিত্রটিও ততটা প্রবলভাবে আমাদের সামনে আসে না।

একটা বিষয় জোর দিয়ে বলা দরকার যে বাংলাদেশে বসবাসরত পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রধান শরিক আওয়ামী লীগের কথিত 'ঐকমত্যের' সরকারের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিটিকে 'শান্তিচুক্তি' আখ্যা দিয়ে সরকার সে সময় বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করলেও গত এক যুগেও সেখানকার – পাহাড়ি বা বাঙালি – জনগণ শান্তির মুখ দেখেনি। পাহাড়িদের প্রধান দাবি ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি, নিজ ভূমে পাহাড়িদের অবাধ যাতায়াতে সেনাবাহিনীর অযাচিত বাধাও দূর হয়নি। অন্যদিকে, বিভিন্ন সরকারের আমলে যেসব অসহায় উদ্বাস্তু বাঙালিকে পুনর্বাসনের নামে

সেখানে পাহাড়িদের ভূমিতে বসিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধের জন্ম দেওয়া হয়েছিল তারও কোনো কুল-কিনারা হয়নি। পার্বত্য চুক্তিতেও পাহাড়ি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি, সমতলের আদিবাসীদের প্রসঙ্গ তো সেখানে আসেইনি। আবার ওই চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখন দেশের অপরাপর অংশের, এমনকি পার্বত্য অঞ্চলে ক্রিয়াশীল সকল শক্তির মতামতও নেওয়া হয়নি। ফলে, চুক্তিটি দেশের সকল প্রগতিশীল শক্তি, এমনকি পাহাড়িদেরও সকল অংশের স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি। তবে, সবাই 'শান্তিচুক্তিতে' স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের বিশেষ অধিকারসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন চান। যারা এর বিরোধিতা করছেন তাদের যুক্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দেখা গেছে, তারাই চীনের উইঘুর মুসলিমদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে উরুমচিকে ওই জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান। একই যুক্তি কি বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য নয়?

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন এবং নির্যাতনের যে রাস্তা আমাদের সরকারগুলো অনুসরণ করে চলেছে তার অবসান কথিত 'শান্তি চুক্তি'র পরও হয়নি। ১৯৭৫ সালের পর থেকে সেখানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং ১৯৭৭ সাল থেকে পরিচালিত সামরিক অভিযানের ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। এসব সামরিক অভিযানে শান্তি না এলেও লুটপাট হয়েছে দেশের কোটি কোটি টাকা – এমন অভিযোগ অনেকেরই। ১৯ আগস্ট ২০০৯ দৈনিক সমকালের একটি প্রতিবেদনে এমন প্রশ্নই তুলেছেন পাহাড়ি এবং সেটলার বাঙালিরা। তাদের ভাষ্য, 'শান্তকরণ প্রকল্প' ও 'অপারেশন উত্তরণের' নামে সেনাবাহিনী যে হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য ও বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে, তার কোনো হিসাব নেই। তাদের এ অভিযোগ যে অমূলক নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি লিজের নামে সংঘটিত তুঘলকি কাণ্ডের মধ্যেই আছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম এম মতিন, যিনি এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কথিত শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি নিজের নামে তো বটেই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর নামেও শত শত একর জমি লিজ নিয়েছেন। এরকমই একটি অভিযোগ উঠেছিল আরেক শান্তিকর্মী (!) সেনাকর্মকর্তার বিরুদ্ধে, যিনি বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে আছেন। এ কথা তো সবারই জানা যে এসব তথ্য তখনই খানিকটা উন্মোচিত হয় যখন শাসকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। তা না হলে এসব তথ্য কখনোই জনসন্মুখে আসে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন সময় উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের পুনর্বাসন এবং তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি কিভাবে সম্পন্ন হবে তা এখনো অমীমাংসিত। এটা সকলেরই জানা যে পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ তৈরি করে। এর ফলে ডুবে যায় রাঙ্গামাটির বিস্তৃত এলাকা। উঁচু এলাকার এক-তৃতীয়াংশ জনগণের ভিটে ও ৫৪,০০০ একর উন্নত ধানী জমি সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়, বাস্তুচ্যুত হয় ১ লক্ষ মানুষ। ওই সময় ক্ষতিপূরণের অর্থ

এবং বিকল্প ভূমির সংস্থান করা হয়েছিল নামমাত্র। এরপর বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় আরো অনেক পাহাড়ি উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এখনো প্রায় ৯৩ হাজার পাহাড়ি পরিবার পুনর্বাসনের সুযোগ পায়নি যাদের ৯০ হাজারই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু, মাত্র অল্প কিছু আছে ভারত-প্রত্যাগত।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজটি করা না হলেও বিগত সময়গুলোতে জমি লিজ দেওয়ার কাজটি করা হয়েছে বেশ উদার হস্তে। প্রায় ৪৭ হাজার একর পাহাড়ি জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। বলা দরকার, এ জমি ইজারা অবশ্যই কোনো পাহাড়ি নেয়নি, নিয়েছে বাঙালিরা, এবং তারাও সাধারণ বাঙালি নন, প্রভাবশালী। প্রায় ১ হাজার ৭৪৪ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির নামে ওই অঞ্চলে জমি লিজ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার অবৈধভাবে ইজারা গ্রহণকারী এবং চুক্তির খেলাপকারিদের ইজারা বাতিল করার কাজ শুরু করেছে। সরকারি হিসাবে বাতিলযোগ্য ইজারা ৭১৮টি। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, এর পরিমাণ আরো বেশি। পরিমাণ কম হোক বেশি হোক, গুরুতর প্রশ্নটি কিন্তু ইজারা দেওয়া নিয়েই। সরকার চাইলে যে কোনো খাস জমি ইজারা দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পাহাড়ে কি আদৌ কোনো খাস জমি আছে? এ নিয়ে সরকার কোনো কথা বলেনি।

পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধকে জিইয়ে রাখা এবং পাহাড়িদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার লক্ষ্যে দরিদ্র বাঙালিদের নিয়ে গিয়ে সেখানে সেটলার নাম দিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়িরা অভিযোগ তুলেছেন, সরকার বাঙালি সেটলারদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে বাঙালি সেটলারদের অভিযোগ, যতটা প্রচার আছে বাস্তবে তার কিয়দংশ সাহায্যও তারা পাননি। তাহলে ওইসব রাষ্ট্রীয় সম্পদ কার ভোগে লেগেছে? বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠলেও এখনও তা করা হয়নি।

তবে, সরকার যত জোরের সঙ্গেই চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলুক না কেন, পাহাড়ে সেটলারদের বিষয়ে সরকার স্পষ্ট অবস্থান না নিলে কথিত শান্তি 'দূর হনুজ' হয়েই থাকবে। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের সময়েই বিভিন্ন বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সেখান থেকে সেটলার বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি তুলেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ওই সময় কোনো কথা বলেনি। ইতোমধ্যে প্রায় এক যুগ পেরিয়ে গেছে। সেটলার বাঙালিদের সরিয়ে আনার কাজটি আগের তুলনায় আরো জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর একটা সুষ্ঠু সমাধান ছাড়া পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সরকার জোর গলায় বলছে যে তারা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চায়, পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু চুক্তির দুর্বলতা দূর করা কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেনাশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার, পাহাড়িদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আদৌ তাদের কোনো তৎপরতা নেই।

পাহাড়ে সেটেলার বসানো বা জমি লিজ দেওয়ার সময় যে যুক্তিটি দেখানো হয় যে পাহাড়ে প্রচুর জমি আছে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? প্রায় ৪০ বছরের পুরনো এক জরিপের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য অঞ্চলের জমির একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল বাসযোগ্য বা চাষযোগ্য। সমতলে যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮২৭ জনের বসবাস, এখানে বাস করে ৯৬ জন। এখানকার জমির শ্রেণী-বিভাজন থেকেও ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মাত্র ৩.১ % জমি অর্থাৎ ৩০,৯৬৯ হেক্টর জমিতে সব ধরনের চাষাবাদ করা যায়। ২.৭% বা ২৭,৪৮৮ হেক্টর জমিতে ধাপ কৃষিকাজ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ভূমির পরিমাণ ১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি., যার মধ্যে চাষযোগ্য জমি ১ ফসলী ৫৭,৯০০ হেক্টর যা মোট জমির ৪.৪%; ২ ফসলী ২২,৭০ হেক্টর যা মোট জমির ১.৭%; ৩ ফসলী ৬,১০০ হেক্টর যা মোট জমির ০.৫%। ফলে এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আয়তনে যত বড়ই হোক না কেন, পার্বত্য জেলাগুলো নিছক চাষবাসের ভিত্তিতে অসংখ্য মানুষকে ধারণ করতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন সারাদেশে পরিচিত সংঘর্ষের জনপদ হিসাবে। অন্তত সংবাদপত্রের পাতা দেখলে তা মনে না হওয়ার কারণ নেই। খুন-সন্ত্রাস-অপহরণ আর সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে জনজীবনে বিরাজ করে আতংক। কিন্তু এই সংঘাত-সংঘর্ষের খবরের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষের প্রতিদিনের সংকটের কথা। তাদের শিক্ষাসুবিধা নেই, স্বাস্থ্যসুবিধা নেই। নেই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের সংস্থান। সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র্য। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভূমি সমস্যা একটি প্রধান বিষয়। যার সাথে জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের সকল সমস্যার শেকড়। অথচ স্বাধীন দেশে কোনো সরকারই এ অঞ্চলের মানুষের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কখনও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে বাঙালি করে তোলার চেষ্টা, কখনও বা তাদের উচ্ছেদ করে তথাকথিত পুনর্বাসন চেষ্টা – এসব হঠকারি কাজই হয়েছে। এমনকি ১৯৯৭ সালের পাবর্ত্য চুক্তির পরেও ভূমি সমস্যা, দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা বিস্তারে কোনো উদ্যোগ শাসকগোষ্ঠী নেয়নি। বরং এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতা আর হানাহানি জিইয়ে রেখে মানুষের সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকেও চেপে রাখতে চাইছে। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হলেও কমিশনের লোকবল নিয়োগ এবং কার্যকর করার জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজন করা হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এ কমিশন আদৌ কেজো কমিশন হয়ে উঠবে নাকি অকেজো হয়েই দিন গুজরান করবে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ; তাই সেখানে দেশের অপরাপর অংশের চেয়ে ভিন্নতর কোনো শাসন চলতে পারে না। কোনো গণতন্ত্রমনা মানুষ একই দেশে দু'ধরনের শাসন চাইতে পারে না; নিজের জন্য গণতন্ত্র, অন্যের জন্য সেনাশাসন মানতে পারে না। আমরা এ কারণেই মনে করি, পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই সেখান থেকে সেনাশাসন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার জরুরি, এর পাশাপাশি সেখানকার সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নও ওই শান্তির স্বার্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই বলা হয়েছে, পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসীদের জীবনের সমস্যা সংকটে খুব বেশি ভিন্নতা নেই। সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের জীবনে অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা – এসবই প্রবল। এবং এদের জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট ভূমির মালিকানা সংকট। বাংলাদেশ ভূমি আইনে আদিবাসীদের জমি-জমা, সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা আদিবাসীদের রক্ষা করতে পারছে না। ওই আইনে বলা হয়েছে, সম্পত্তির মালিকানা বদলের ক্ষেত্রে তৎকালীন মালিকের সম্মতি অত্যাবশ্যকীয়। আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, জমি বেদখল হয়ে আদিবাসীরা প্রায় ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। কারণ মালিকানা হস্তান্তরের প্রায় কোনোটিই স্বেচ্ছায় ঘটে না। এর পেছনে দারিদ্র্য, ভয়-ভীতি, বলপ্রয়োগ কাজ করে। এবং আদিবাসীদের অশিক্ষা আর সরলতার সুযোগ নেয় স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে জমি তারা চাষ করে, এমনকি নিয়মিত সরকারি খাজনাও পরিশোধ করে, তা নিমেষেই অন্যের অধিগ্রহণে চলে যায়।

আইন-যে কোনো সহায়তাই করছে না তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আইএলও'র (International Labour Organization-ILO) ১০৭তম সভায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, আদিবাসীদের সম্পত্তি অবশ্যই সংরক্ষণ করা হবে এবং সম্পত্তির অধিকারে তাদের কোনোভাবেই সুবিধাবঞ্চিত করা যাবে না। যদি নাগরিক সুবিধার্থে কখনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়েই তবে যথাযথ পাওনা পরিশোধ করা অত্যাবশ্যকীয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এই বক্তব্য সমর্থন করে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছে? ময়মনসিংহের মধুপুর পাহাড়ি এলাকায় জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলার নামে বন বিভাগ প্রায় ৫০০০ আদিবাসীকে উদ্বাস্তু করেছে। টাঙ্গাইলে প্রায় ২৫,০০০ গারো ও কুচ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত করা হয়। যথাযথ মালিকানার অধিকার এড়িয়ে জমি অধিগ্রহণ আইনের আওতায় ফেলে রাজশাহী, দিনাজপুরে অত্যন্ত সুকৌশলে অন্যায়ভাবেই জমি অধিগ্রহণ চলে। মৌলভীবাজারের প্রায় ৬৫টি গ্রামে ১০ হাজারের মতো আদিবাসী বছরের পর বছর ধরে বাস করছে জমি রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র ছাড়া। ২০০৭-এর জুলাইয়ে আদিবাসী নেতা, মুখপাত্র ও মহিলাদের উপস্থিতিতে এক সভায় স্থানীয় প্রশাসন এর সমাধান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। নওগাঁয় আদিবাসী নেতা আফফ্রেড সরেন হত্যার পর প্রায় এক যুগ পেরিয়ে গেছে। আফফ্রেড সরেন হত্যার বিচার যেমন হয়নি তেমনি ওই অঞ্চলে আদিবাসীদের জমি দখলও বন্ধ হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন ও বৈষম্যের অবসানকল্পে যা করা প্রয়োজন:

(ক) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতিপ্রদান;

(খ) সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে ‘দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

বা’ শব্দসমূহ সন্নিবেশ করা এবং এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংবিধানে নতুন তফসিল

সংযোজন করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নামের তালিকা সন্নিবেশ করা;

(গ) সংবিধানের ৪৭(১)(চ) অনুচ্ছেদের পরে নিম্নোক্ত দফা (ছ) সংযোজন করা– ‘পার্বত্য

চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি আদিবাসী বিশেষ শাসিত

অঞ্চল হইবে।’

(ঘ) আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি

অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

করা।

[লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)।]

নিপীড়িত জাতির নিপীড়িত সাহিত্য

পা ভে ল পা র্থ

আক্রাঃ হ্ য়াগ্তা তুঙলাঙে
আক্রাঃ হ্ নিঙয়াগ্ তুঙলাঙে
নাঙগা প্রেঃঙা প্রেং গো ভেঙ নোহ॥
(চাকদের ভেতর কেউ মারা গেলে স্বজন প্রতিবেশীরা ক্মাঙ চিক্হান গেয়ে থাকে। এইসব গানের ভেতর দিয়ে আত্মাকে আবার নিজ রক্ত বংশে জন্মের আহবান ও অনুরোধ জানানো হয়।
উপরের ক্মাঙ চিক্হানের বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, পথে একদিন থেকো না/পথে দু'দিন থেকো না/তোমার কূলে বংশে আবার চলে এসো)[১]

দেশের জাতিগতভাবে নিপীড়িত নিম্নবর্গের এক বিশাল অংশ নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে যে পরিচয় দাঁড় করিয়েছেন সেই 'সাধারণ চল' থেকেই আজকের আলাপে 'আদিবাসী' ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরসাথে 'উপজাতি বিতর্ক', 'শ্রেণীপ্রশ্ন', 'জাতিরাষ্ট্রিক বাহাস', 'এক দেশে দুই শাসন', 'পার্বত্য চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষ', 'আহামরি উন্নয়ন দরদ', 'উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদিতা', 'মাওবাদী ও অমাওবাদিতা', 'উপস্থাপন ও চিহ্নিতকরণের রাজনীতি', 'তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদিতা' বা এমনসব বলপ্রয়োগকারী কোনোধরনের মতাদর্শই জড়িত নয়। কোনোধরনের মতাদর্শ নির্মাণ বা চাপিয়ে দেয়ার তাগিদে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমরা জানি, 'জাতি', 'জাতীয়তা' এবং 'জাতি-রাষ্ট্র' চলতি সময়ের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ[২]। যদিও সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কিন্তু জাতিগতভাবে দেশের গরিষ্ঠভাগ বাঙালি এবং বাঙালি ভিন্ন অপরাপর প্রান্তিক জাতি কারোরই সাংবিধানিক জাতিগত স্বীকৃতি আইনগত দলিলে রাষ্ট্রে নেই। রাষ্ট্রের বিভিন্ন নথি দলিল এবং প্রচারণায় আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় ঘিরে অধিপতি রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক বিরোধপূর্ণ চরিত্র রাষ্ট্রের দুর্বল ও অমীমাংসিত রাজনৈতিক শ্রেণীকাঠামোকেই হাজির করে।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিলের ধারা ২(১) এবং ধারা ১৯-এ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমি, লুসাই, কোচ, সাঁওতাল, ডালু, উসাই(উসুই), রাখাইন, মণিপুরি, গারো, হাজং, খাসিয়া, মং, ওঁরাও, বর্মণ, পাহাড়ি, মালপাহাড়ি নামে মোট ২৫ জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[৩]। বাংলাদেশের কোচ-হাজং-ডালু-বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি-মৈ তৈ মণিপুরি-লালেং-চাকমা-ত্রিপুরা-রাখাইন-ম্রাইনমা-খাসি-মান্দি-বানাই-খাড়িয়া-মাহালি-লুসাই-ম্রো-পাংখো-বম-মুণ্ডা-লেঙাম-সাঁওতাল-ওঁরাও-ভূমিজ-দেশোয়ালি-কর্মকার-হদি-রাজবংশী-ক্ষত্রিয়বর্মণ-পাঙন-চাক-তঞ্চংগ্যা-কোল-মিজো-পাহাড়িয়া-খুমি-খিয়াং-কন্দ এইসব নিপীড়িত জাতিদেরকেই অধিপতি রাষ্ট্র আমাদের কাছে কখনো 'উপজাতি', কখনো 'আদিবাসী', ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ট্রাইবাল, এথনিক মাইনরিটি, ইনডিজিনাস পিপল, এবঅরিজিনাল, নৃ-গোষ্ঠী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এরকম নানান নামে পরিচয় করায়। প্রান্তিক জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যা কোথাও বারো লাখ, কোথাও আঠারো লাখ, কোথাও বলা হয় তিরিশ লাখ। কোথাও দেখান হয় জাতিসংখ্যা ২৪ বা ২৫ বা ২৭ আবার কোথাও দেখান হয় ৪৫ বা তারও কম-বেশি। ১৯৯১ সনের আদমশুমারিতে দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩০টি দেখান হয়েছে এবং অন্যান্যসহ লোকসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে আদিবাসী জনসংখ্যা উধাও করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-টু) দলিলে ২০০১ সালে আদিবাসী জনসংখ্যাকে দেখান হয়েছে প্রায় ১৮ লাখ। দ্রং (২০০৮) জানিয়েছেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ বলে দাবি করে আসছে[৪]। সংবিধান থেকে যাপিত জীবন, জুম জমিন থেকে বিছানা বালিশ, চারকোণ থেকে চলাচল, শিল্প কি সাহিত্য সব কিছু নিয়েই বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ এক রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন প্রবাহ সামলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা আজকের আলাপ শুরু করছি বাংলাদেশের নিপীড়িত জাতির সাহিত্য বিষয়ে। মৌখিক ও মুদ্রিত সাহিত্যের এই প্রধান ধারার ভেতর আমরা এখনও আদিবাসী সমাজে মৌখিক সাহিত্যের চলমান টগবগে দুনিয়াকে প্রবলভাবে টের পাই। পাশাপাশি মুদ্রিত সাহিত্য-ইতিহাসেও আদিবাসীদের রয়েছে টানটান বহমান অস্তিত্বময়তা। আমরা এ-ও জানি মুদ্রিত সাহিত্যের বলপ্রয়োগ মৌখিক সাহিত্য পাটাতনকে প্রশ্নহীন কায়দায় দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। আর এই মুদ্রিত সাহিত্যেরই কেবলমাত্র 'শিল্প সাহিত্য' হয়ে উঠবার এক স্পষ্ট রাজনৈতিক ইতিহাস ও বলপ্রয়োগ আছে। আজকের আলাপে আমরা আদিবাসী জগতের মৌখিক রক্তাক্ত সাহিত্য-দুনিয়াকে টানছি না, মূলত মুদ্রিত সাহিত্য বিষয়ে একেবারেই প্রাথমিক সারির একটা আলাপ তুলতে চাইছি। আদিবাসী জনগণের সাহিত্যকে সম্পূর্ণত উপেক্ষা ও দলিত করে বাংলাদেশের তথাকথিত 'জাতীয় সাহিত্যের' যে অধিপতি ইতিহাস ও অস্তিত্ব দাঁড়িয়েছে দেশের নিপীড়িত জাতির সাহিত্যের অতিসামান্য অস্তিত্বময়তার ভেতর দিয়ে আমরা সাহিত্য-রাজনৈতিক

দৃষ্টিকোণ থেকে সে জায়গাটাকে প্রশ্ন করতে চাইছি। আদিবাসীদের ভেতর যারা বাংলায় বা নিজের ভাষায় কিন্তু বাংলা হরফ ব্যবহার করে সাহিত্যআন্দোলন করছেন তাদের লেখালেখিকেই আজকের আলাপে কেন্দ্রীয় জায়গাতে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের কথিত মূল সাহিত্যআলোচনায় (এমনকি ছোটকাগজগুলোও) আমরা বরাবরই বাঙালির এবং বাংলা সাহিত্যের প্রশ্নহীন অধিপতি ঝাঁঝ দেখতে পাই। যেখানে নিদারুণ কায়দায় দাবিয়ে রাখা হয় বা অনিবার্যভাবে নিপীড়িত হয় আদিবাসী সাহিত্য-ভূগোল। মূলত বাঙালির (এবং মুসলিম পুরুষেরও) বাংলাসাহিত্যের একতরফা কৃষিউপনিবেশে প্রান্তিক ও নিপীড়িত আদিবাসী সাহিত্য জুমের খুব একটা উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই না। তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে আদিবাসী সাহিত্য (তা আদিবাসী বা বাঙালির নির্মাণ হোক না কেন) কেবলি নিপীড়িত বা লোকসাহিত্যের চিহ্নিতকরণে ঐতিহাসিক কায়দায় অপর হয়ে থাকবে? আজকের আলাপে আমরা এই ধরনের যাদুঘরমার্কা ও প্যাকেজবন্দি উন্নয়নের অধিপতি দরদকেও প্রশ্ন করতে চাইছি।

সু লৌ কার ত্লুং দাহ্ লৌ
পা লৌ কার ত্লুং দাহ্ লৌ
ত্লাংরিপাতে ইন্ মোয়াণ আঃ
রেয়অজা খালা
মেল দুম খালা
বাবু ডীন, বাবু ডীন
(জুম থেকে মা ফিরে নাই/ জুম থেকে বাবা ফিরে নাই/ ত্লাংরিপার বাড়ির পাহাড়ে/রোয়াজা খালা/মেলদুম খালা/ বাবু বিশ্রাম করে/বাবু বিশ্রাম করে[৫])

মালেয়্যা বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ভেতর একধরনের সামাজিক জুম সহযোগিতা আছে, ম্রোরা যাকে বলেন কুরপাক-কুরছাক। একজনের জুমে সমাজের দশজনে মিলে কাজ করে দেয়া। আদিবাসীদের সাহিত্যও এভাবেই এক সামাজিক বোঝাপড়া প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এর ঐতিহাসিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে। পাশাপাশি এই জনপদের যে সাহিত্য মহাবয়ান যা সকল জাতির বৈচিত্র্যময় পালক নিয়ে বিরাজিত রয়েছে তা কোনোভাবেই কোনো জাতির প্রান্তিকীকরণের ভেতর দিয়ে আপন ডানা মেলতে পারে না। বাস্কে (২০০৬) তাই লিখেছেন, *চর্যাপদ, পুরনো বাংলা পুঁথি, বৌদ্ধ গান ও দোহারের মধ্যে আমরা শবর-ডোম-হাঁড়ি-চণ্ডাল-বাউরি-বাগদি শুড়ি ইত্যাদি গোষ্ঠীর লোক দেখতে পাই। 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' দিয়ে চর্যাপদের শুভযাত্রা শুরু*[৬]। *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা* পুস্তকের ভাষ্যমতে, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী-চর্চা শুরু হয় যতদূর সম্ভব ১৮৮৫ সাল থেকে। সে সময়ে আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে তার অধিকাংশই বিদেশি মানুষেরা করেছেন। পরবর্তীতে উনিশ-বিশ শতকে বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্র

যেমন, 'বঙ্গদর্শন', 'বঙ্গবাণী', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা, মাসিক 'বসুমতী' প্রভৃতি অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় বিদেশি লেখকদের অনুসরণ করে আদিবাসী জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে, বইপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সহজ, সরল নিরক্ষর আদিবাসীরা ওই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি। জন ক্লার্কা মার্শম্যানের সম্পাদনায় ভারত থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' পত্রিকার ১৩শ ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮২০ সালে লেখকের নাম উল্লেখ ছাড়া 'নানাদেশীয় লোকের শববিষয়ক ব্যবহার' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। পরবর্তীতে রাজেন্দ্রেলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭৭৪ শকাব্দে বিবিধার্থ-সংগ্রহে 'ডোকো জাতির বিবরণ' ১৮৫২ সালে সত্যার্ণব পত্রিকায় 'ভেদ নামক অরণ্যের বন্য মানুষ' এরকমের আদিবাসী বিষয়ক রচনাসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় ১৩১৩ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় সতীশচন্দ্র ঘোষ লেখেন 'চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য। চাকমা দিগের ভাষা-তথ্য লেখায় সতীশচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, চাকমাদিগ লোহিত অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যার-কিও-সাংপো)। ইহাদিগের দুইটি মাত্র প্রাচীন নিদর্শন এই সমুদয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। 'ধনপতি রাধামোহনের উপাখান' এবং 'চাটিগাঁ-ছড়া' আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলে প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না। লেখাটি শেষ করার আগে তিনি লিখেছেন, বারান্তরে ইহাদের কবি ও কবিতা-বারোমাস-ছড়া-হেঁয়ালি লইয়া আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। পরবর্তীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রবাসী পত্রিকার ৭ম ভাগের ৮ম সংখ্যায় অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাংলায় সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতির সংস্কার কর্ম' বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানে চাকমা সমাজের কিছু সামাজিক আচাররীতি নিয়েই কেবল তিনি আলোচনা করেছেন কবি-কবিতা-ছড়া বা কোনো সাহিত্যালাপ নয়[৭]। সাহিত্য যেহেতু আপাদমস্তক কোনোভাবেই গবেষণাজগতের বাইরের কেউ নয় তাই আমরা আজকের আলাপে খেয়াল রাখব 'আদিবাসী সাহিত্য' বলতে আমরা বাঙালিদেরও রচিত 'আদিবাসী বিষয়ক সাহিত্যকে' বুঝতে চাইছি কিনা। কিংবা বাঙালিদের রচিত আদিবাসী বিষয়ক সাহিত্যও কি আদিবাসী সাহিত্য নয় বা আদিবাসীরা রচনায় কী ধরনের সাহিত্যপ্রশ্ন ও নির্মাণ-বিনির্মাণের বাহাস-পাল্টাবাহাস থাকলে তা আদিবাসী সাহিত্য হবে তা-ও আমাদের কেন্দ্রীয় মনোযোগে রাখা জরুরি। তা না হলে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় শ্রেণী ও কর্পোরেট প্রশ্নকে খারিজ করে এক প্রবল শরীরসর্বস্ব হয়ে উঠতে পারি। যা নিপীড়ক সাহিত্যব্যবস্থারই এক আলাদা ধরন। প্রশান্ত (১৯৯৯) তার একটি লেখায় যেমন বলেছেন, আমরা নিজ দেশে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারি, কিন্তু আমাদের 'গবেষিত জনগোষ্ঠী' যদি গ্রামীণ কৃষক, বস্তিবাসী বা সে জাতীয় অন্য কোনো অধস্তন বা প্রান্তিক মানুষেরা, তাহলে গবেষক ও গবেষিত'র সামাজিক অবস্থানগত অসমতা একইরকম থেকে যাচ্ছে। কাজেই 'নিজ সমাজে' কাজ করি বলে পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীদের তুলনায় রাজনৈতিক বা নৈতিক দিক থেকে আমরা অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে আছি, একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোনো অবকাশ

নেই[৮]। আদিবাসী সাহিত্যের নিপীড়ত্ব বা নিপীড়িত আদিবাসী সাহিত্য-দুনিয়ার আলাপে এইসব মনোযোগ আগেভাগেই সারাই করে নেয়া জরুরি। উচিমং মারমা আদিবাসী সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনায় জানিয়েছেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও লোভ, সততা ও নিষ্ঠা, রীতি ও নীতি, লোকাচার ও জীবনাচার, ভাবনা ও বিশ্বাস, জাতিগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংকট ও সংগ্রাম, সমস্যা ও সম্ভাবনা, প্রেম ও ভালোবাসা, বিরহ ও মিলন এবং শোষণ ও নির্যাতনের ভুক্তভোগী হিসেবে আমাদের চেয়ে কোনো বাঙালি লেখক কি আমাদের মতো করে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবেন কিংবা লিখতে পারবেন? নিজস্ব বর্ণমালার অভাবে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে রোমান হরফ অথবা বাংলা হরফ ব্যবহার করে সাহিত্যচর্চা করতে হচ্ছে। ফলে যতটুকু আবেগ প্রকাশ করার ইচ্ছা ততটুকু প্রকাশ পায় না–যতটুকু মনের ভাব প্রকাশ করার ইচ্ছা ততটুকু প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখায় কতটুকু আদিবাসী পাহাড়িদের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? আদিবাসী সাহিত্যের বিকাশ হলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী উভয়ের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার খুলে যাবে। এ বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন আদিবাসী ও বাঙালি লেখকদের আত্মনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন[৯]। পাশাপাশি যাফর (১৪১২) 'আদিবাসী কাব্যের পটভূমি' বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন, জীবন ও নিসর্গের বিস্তৃত ক্যানভাসে আদিবাসী কাব্যের পটভূমি বড়ই চিত্রল। আদিবাসী যাপিত জীবনের সমগ্রটাই কাব্যময়। আদিবাসী কাব্যে জটিলতা নেই, দুরূহতাও নেই–আছে আদিবাসী জীবনধারার মতোই সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা। আদিবাসী কাব্যের পটভূমির মর্মমূলের যে প্রেক্ষিত তা এদের জীবনধারাতেই বিধৃত। প্রকৃতি, নারী আর মানবজীবনের শাশ্বত বোধ এই তিনটি উপাদানেই আদিবাসী কাব্যের পটভূমি চিত্রিত[১০]। কিন্তু হয়তো-বা জাতিগত ভিন্নতায় যাফরের সাথে অনেকেরই মতভিন্নতা তৈরি হওয়াটাই সাহিত্যের শ্রেণী-রাজনৈতিক প্রশ্ন। আমরা হয়তো আরেক সময়ের আলাপে এই জায়গাগুলো নিয়ে আসর জমাব।

বাংলাদেশে বাঙালি বাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি চাকমা, চাকমাদের ধারে-কাছে মারমা-ত্রিপুরা-মান্দি ও সাঁওতাল। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ ও বরেন্দ্র জনপদ, বৃহত্তর সিলেট ও হাওরাঞ্চল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জনপদ, সমুদ্র উপকূল, দক্ষিণাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা সবখানেই একআধটু ঢুঁ মারব। পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়েই আলাপে সরাসরি অংশ নেয়া যাক। নেওয়ার (২০০২) পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের লোকজ সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে এক আলোচনায় বলেছেন, পার্বত্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন, গীতিনাট্য, কবিতা, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে তাদের অভিজ্ঞতা ও জীবন সম্পর্কে নিজস্ব স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের গেংখুলি। তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাদের চারণ কবিরা বেহালা বা বাঁশি বাজিয়ে উবাগীত-এর সুরে পালাগান করেন। এইসব গানের ভাষায় থাকে জাতির ইতিহাস বা কখনো অনবদ্য প্রেমের

কাহিনী। মারমাদের পাঙখুং, লাঙগা, রদ্দু প্রভৃতি হল তাদের স্বকীয় লোকজ সাহিত্যের ফসল[১১]।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

বন্দার মুওত বিজগত আঘে বিজয়গিরি
সমরগিরি নাঙ আর রাধামন ধনপুদি
চম্পকনগর নাঙে এল' এক্কান রেজ্যো
এই সে রেজ্যোত শাসন গজ্যো বিজয়গিরি
সে পরে কয় উমোর, কয় পিড়ি
কুত্তুন কুধু? কুন্দিত্তুন কুন্দি লুঙি
হিল চাদিগাঙত জুম্মোই গড়ন বঝত্তি
কিঙিরি কিঙিরি এল বৃটিজো শাজন
জুম্মো সুদো হাজনা দিনে
বাজি এলং আমাধগে, আমা শাজনে
বাজি এল লুগ লুগ পরানন
বৃটিজে যেই এল' শাজন পাকিজ্তান
ভাত পিলে সুত্তো বিজগ দিদিলো মোরোঙত
কেনে বাজিবো পরানন?
(মানুষের মুখে ইতিহাস রয়েছে বিজয়গিরি/ সমরগিরির নাম আর রাধামন ধনপুদির নাম/ চম্পকনগর নামে ছিল একটা রাজ্য/ সেই রাজ্যে শাসন করেছিল বিজয়গিরি/ সেই পরে কত যুগের পর কত যুগ/ কোথায় হতে কোথায়? কোথায় হতে পৌঁছে/ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমিয়ারা বসতি গড়ে/ কিভাবে এল, বৃটিশের শাসন/ জুমের কার্পাসের খাজনা দিয়ে/ জীবন চলার পথে শুধু শৃংখল পড়ে/ বৃটিশ চলে গেল এল পাকিস্তানের শাসন/ ভাতের হাঁড়িসহ ইতিহাস মুছে দেয় অটল গহ্বরে/ কি করে প্রাণ বাঁচাব?)
(সূত্রঃ হিল চাদিগাঙ দুগো বিজগ, সীমা দেওয়ান। চাঙমা ভাষা থেকে কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মৃত্তিকা চাকমা। পৃ. ২০২-২০৩)[১২]

উপস্থাপনে অধিপতি ঝাঁঝ থাকলেও অনেকে এভাবেও বলেছেন, *অনেক উন্নত ভাষার সাহিত্যের মতো চাকমাদেরও রয়েছে প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি। মধ্যযুগের চাকমা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি গোজেনলামা, সাধক শিপচরণ এর লেখক*[১৩]। চাকমা (২০০৩) জানিয়েছেন, সাহিত্য যেমন ভাষা টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঠিক তেমনি সাহিত্য সমাজের দর্পণ হিসেবেও কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে বম, পাংখোয়া, লুসাই, খুমি, চাক ও খিয়াংদের সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। তাছাড়া আদিবাসীদের পূর্ব পুরুষদের অনেক সাহিত্যকর্মগুলোও তেমন সংরক্ষণ করা হয়নি, যার ফলে পূর্বপুরুষদের অনেক সাহিত্যকর্ম অযত্ন অবহেলায় হারিয়ে গেছে।

আর বর্তমানে আদিবাসীদের সাহিত্যকর্ম সাহিত্যের মর্যাদা শিক্ষিত(!) অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এই শিক্ষিতের মধ্যে বেশির ভাগ অংশ ও মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা না করে বাংলা ভাষায় করে। যার ফলে ঐ সাহিত্য অন্য ভাষার (বাংলা ভাষার) সাহিত্যতে যেমন যথাযথ স্থান পায় না তেমনি ঐ সাহিত্য আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণে কোনো উপকারে আসে না। তবে ইদানিং কিছু কিছু আদিবাসীদেরও স্ব স্ব ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে দেখা যায়। বিশেষ করে চাকমাদের। যেমন চাকমা ভাষায় কবিতা, ছড়া, গল্প, নাটক ইত্যাদি দেখা যায়। মারমা ও ত্রিপুরাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা সামান্য দেখা গেলেও তা যথেষ্ট নয়। অন্য আদিবাসীদেরও মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগী হতে হবে[১৪]। আদিবাসী সাহিত্য আলোচনায় খান (২০০৮) বলেছেন, বাংলাদেশের আদিবাসীরা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্রজাতির কবিরা সঙ্গত কারণেই তাদের মাতৃভাষায় লেখালেখি করবার প্রবল আগ্রহবোধ করেন। এটা বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে, উপলক্ষে প্রকাশিত তাদের ছোট ছোট প্রকাশনাগুলোর ওপর নজর ফেললে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদিবাসী উচ্চারণের বাংলা হরফে এসব কবিতা বা গদ্য ছাপা হলেও পাশাপাশি নিটোল বাংলা (কেন যে লেখক আদিবাসীদের বাংলাকে *নিটোল বাংলা* বলে অভিহিত করলেন! এটি কি অপরত্বের কোনো প্রবল উপস্থাপন তৈরি করছে?) ভাষায়ও তাদের অজস্র মৌলিক কবিতা বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হচ্ছে। এসব কবিতার সমকালীন জীবনের নানা আকুতি, রূপাবয়ব, মুখশ্রী ও মুখোশ, নানা প্রশ্ন ও সদুত্তর না-পাওয়া বেদনা যেমন রয়েছে, তেমনি চোখে পড়ে নিবিড় সারল্যমণ্ডিত জীবনের সবুজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুভূতিঘন ইহচেতনাও। চাকমা কবিতায় অনায়াসে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে জীবন অনুষঙ্গের লোকায়ত উদ্ভাসসমূহ[১৫]। একটি লেখায় ত্রিপুরা (১৯৯৪) জানিয়েছেন, চাকমাদের লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধশালী। তাদের কাহিনীমূলক লোকগীতি আছে। এই লোকগীতি বা কাহিনীমূলক গানকে উবগীত-এর সুরে গাওয়া হয় এবং এই গানের গায়ককে গেংগুলি বলে। রাধামন-ধনপুদী পালা, চাদিগাং ছারা পালা, কুগীডর বা চরামিত্ত্যু পালা ও নরধন-নরপুদিপালাতে অতীতের শৌর্যবীর্য কাহিনী, বীরত্ব গাথা, সমাজব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়। 'গোজেনলামা' নামক ধর্মীয় গীতিকা, তান্যাবীর পালা নামক পালা ছাড়াও 'চান্দবীর বারমাস', 'কির্পাবীর বারমাস', 'মেয়ারীর বারমাসে'র মতো অনেক চাকমা বারোমাসী আছে। তাঁর লেখায় আমরা আরো জানতে পারি, যে, চাকমা ও বাংলা হরফে লেখা তাহ্লিক শাস্ত্র, শাঙেচ ফুলু তারা, ত্রিপুদুরা, মালমতারা, ৫১টি চাকমা ছড়া, আঘরতারা, পুদুম ফুলু তারা, কদম ফুলু তারা, বুদ্ধ ফুলু তারা, সাঙচ ফুলু তারা, রাকেম ফুলু তারা, ছোট কুরুক তারা, বুদ্ধ ফুলু তারা, সাভাদিঝা তারা, জয়মঙ্গল তারা, আনিজা তারা, সানেকফুলু তারা, সামেং ফুলু তারা, উদাংপারেত তারা, বুজংগ সূত্র, বরতংদা তারা, রাধামন ধনপুদী পালা (ফুল পারা পর্ব), বিদ্যাসুন্দরপুদী, চান্দবী বার মাস, চাকমা মন্ত্র ফি, সৃত্তি পত্তন, স্বর্গপালা, বুদ্ধপালা, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, গোজেনলামা, জ্ঞানপ্রদীপ, কলি চদিঝা, বৈদালী, লদি শাস্ত্র, জ্ঞানভেদ,

খঞ্জন বচন, বায়ুভেদ, চাকমা দাগকধা, গোরক্ষ বিজয় পুঁথি, নরপুদীলামা, কাজলপতি বারমাসী, আলসি কবিতা, যুত্তপুদীর বারমাসী, দিনফিউ, কামরত্ন ও ঝারা নামের বেশ কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত রয়েছে[১৬]। দেওয়ান (২০০৩) তাঁর এক বাণীতে চাকমাদের দুটি প্রাচীন বারোমাসী গীতিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, চাকমা সমাজের মধ্যে দুটি জনপ্রিয় কাব্য হল 'চান্দবী বারমাস' এবং 'চিত্ররেখা বারমাস' প্রায় শতবর্ষ পূর্বে চাকমা বর্ণে বাংলাভাষায় এ দুটি বারমাস রচিত হয়েছিল। বিখ্যাত চাকমা কবি ধর্মধন চাকমা 'চান্দবী বারমাস' রচনা করেন আর 'চিত্ররেখা বারমাস' রচনা করেন পুষ্পমনি। 'চান্দবী বারমাসে' শতবর্ষ পূর্বেকার চান্দবী নামক এক সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য, প্রেম ও সুখ-দুঃখের কাহিনী রয়েছে। এতে তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, বিচার-আচার ইত্যাদিসহ পাহাড়ি নদী বরকল ও ঠেগা নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নৈসর্গিক পরিবেশের কথাও পাওয়া যায়। 'চিত্ররেখা বারমাসে'র বেলাতেও একই কথা বলা যায়[১৭]।

পৃথিমী আলাম ন মানি
নিজ গরজে হাম গরং
ইদিকখা গরি জিংগানিয়ান হাদে জাঙর
সারা আ-দা মর হারবারি অঙর।
(বকধার্মিক। পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস না জেনে/নিজের স্বার্থে ইতিহাসকে ব্যবহার করি ও লিখি/এভাবেই কেটে যাচ্ছে আমার জীবন ও যৌবন/পরিণতি, একাকী নিঃসঙ্গ তালমাতাল জীবন[১৮])

চাকমা (২০০১) তার লেখা তিনটি গান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, বিগত শতকের সত্তর-পরবর্তী সপ্ত দশকে চাকমা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীতে প্রথমবারের মতো জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এ সময় নতুন প্রজন্ম তারুণ্যের উদ্দীপনায় সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠে। চাকমা সমাজের এই নবজাগরণের যুগে বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মলাভ করে। ১৯৭২ সনে রাঙ্গামাটি শহরে জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ), মুড়োল্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠী এবং গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী নামে তিনটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯৭২ সনেই বিঝু উপলক্ষে জুভাপ্রদ তাদের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'বিজু' এবং মুড়োল্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠী 'লুরা' নামে সংকলন প্রকাশ করে। ১৯৭৪ সনে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা ভাষার কিছু 'আধুনিক গান' নিয়ে প্রকাশ করে গানের সংকলন 'শিঙ্গা'। ১৯৭০ সনে ১২টি শিশুতোষ চাকমা কবিতা নিয়ে রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত হয় সুগত চাকমার (ননাধন) ছোট কলেবরের কবিতার 'রাঙামাত্যা'। চাকমা (২০০১) তার বইটি সম্পর্কে নিজে লিখেছেন, চাকমা ভাষায় এটিই ছিল এ-জাতীয় প্রথম আধুনিক চাকমা কবিতার বই। প্রকৃতপক্ষে রাঙামাত্যা কবিতা বিষয়ক বইটিই

চাকমা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারকে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত করেছিল[১৯]। চাকমা কবিতার ধারা বিষয়ে আলোচনায় খান (২০০৮) উল্লেখ করেছেন, চল্লিশের দশকে 'চাকমা কবিতা (১৯৪৫) প্রকাশ ও সম্পাদনার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট চারুশিল্পী চুনীলাল দেওয়ান চাকমা সাহিত্যে যে প্রবাহের সূচনা করেছিলেন, বলা যায়, তাই আরো স্রোতবহ হয়ে উঠে উল্লিখিত কবিদের হাতে[২০]।

চাকমা (১৯৮২) তাঁর এক লেখাতে বাংলাদেশের 'সাম্প্রতিক চাকমা কবিতার' ধারা প্রসঙ্গে বলেছেন, ষাট দশকের শেষ ও সত্তর দশকের শুরুতে চাকমা কবিতায় রোমান্টিক সৌন্দর্যকল্পনার অর্ন্তবাস পরে যে নতুনতর প্রয়াসে সাম্প্রতিক কবিতা-আন্দোলন আসে, যার দ্বিতীয় বরপুত্র দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা। ১৯৭০ সনে ননাধন চাকমার 'রাঙামাত্যা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমেই সাম্প্রতিক কবিতা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর পরপরই ফেলোযেয়ো চাকমার 'জুম্মবী পরানী মর', হরেন্দ্র চাকমার 'মার্বেল পাথরত নিলোজমন', নিরঞ্জন চাকমার 'দোকদোক্যা কোচপানাত এক্কান দেঝ' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশের মাধ্যমেই চাকমা কবিতায় আধুনিক কবিতা আন্দোলনের জোয়ার আসে[২১]। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, শিল্প বিষয়াদির চর্চা, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রচারণার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সনে ঢাকায় গঠিত হয় 'রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল (রা-ক), পরবর্তীতে রাঙ্গামাটির স্থলে জুম বসিয়ে করা হয় জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)[২২]। মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ ১৯৮০[২৩] ও রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল ১৯৮১[২৪] সনে চাকমাদের নিজস্ব উদ্যোগে পরপর রাঙ্গামাটি থেকে বাংলা বর্ণমালা ও চাঙমা ভাষায় রাধামন-ধনপুদির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। মৃত্তিকা চাকমার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ চাঙমা ভাষায় বাংলা হরফে ত্রৈমাসিক 'কবিতাপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় রাঙ্গামাটি থেকে ১৯৮১ সনে[২৫]।

জুম্ম সাহিত্য জগতে নিবেদিতপ্রাণ সকল ব্যক্তি এবং যারা কবিতাকে ভালোবাসে সেইসব কবিতাপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত চাঙমা শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ 'রান্যাফুল' হেমল দেওয়ান, শরৎজ্যোতি দেওয়ান, হিরন মিত্র চাকমা ও পলব চাকমার যৌথ সম্পাদনায় ২০০৬ সনের অক্টোবরে ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন মনি স্বপন দেওয়ান। বইটির ভূমিকায় সম্পাদকেরা লিখেছেন, চাকমা ভাষায় বাংলা বর্ণে লিখিত কবিতাগুলো বাংলা অনুবাদ করে পার্বত্য অঞ্চলে চাকমাভাষী কবিদের আবেগ, অনুভূতি ইচ্ছাগুলো বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপন করাই আমাদের এই উদ্যোগের আসল উদ্দেশ্য। পাহাড়ে জুমচাষের পর পতিত জমিতে ফোটা পাহাড়ি বনফুলকেই চাঙমা ভাষায় বলে রান্যা ফুল। কবিতা সংকলনটির নাম রান্যাফুল রেখে সম্পাদকগণ আরো বলেছেন, আমরা পার্বত্য অঞ্চলের কবিতা লিখতে চাই নিজ ভাষায়, নিজ বর্ণে পড়তে চাই নিজের ভাষায়। শুনতে চাই মায়ের মুখ থেকে ঘুমপাড়ানি গান। কবি ফিরিংচানের প্রকৃত নাম

প্রবোধ চন্দ্র চাকমা। রাঙ্গমাটি জেলার বরকল উপজেলার হালাম্বা দুয়ারের এই কবি বিশ শতকে আলসি কবিতা লিখে চাকমা সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা পান। ১৯২৬ সালে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় তার কবিতার বই প্রকাশিত হয়। কবি ফিরিংচানসহ চুনীলাল দেওয়ান, সলিল রায়, মুকুন্দ তালুকদার, ডা. ভগদত্ত খীসা, দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা, ফেলাজেয়া চাকমা, বিজয় কেতন চাকমা, সুহৃদ চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, শিশির চাকমা, শ্যামল তালুকদার, কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা, সুগত চাকমা ননাধন, বারেন্দ্র লাল চাকমা, কবিতা চাকমা, সুসময় চাকমা, অমর শান্তি চাকমা, তরুণ কুমার চাকমা, বীর কুমার চাকমা, জগৎজ্যাতি চাকমা, প্রগতি খীসা, সঞ্জীব চাকমা, সীমা দেওয়ান, কিশলয় চাকমা, রোনাল্ড চাকমা, পদ্মলোচন চাকমা, নিকোলাই চাকমা, রিপরিপ চাকমাদের কবিতা রান্যাফুলে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

মামা হরত গুরিনেই
বাবা হানাত চুরিনেই
নানু পিদিত বুগিনেই
....
....
শান্তি চুক্তি উয়েদে এবার ঘরত যেবং
আমা দেচ্ছান হেজান্যে দ্বিচোগেদি চেবং
ফেনি গাঙর পুল পার ওই এলং এ ধাগত
নিজ দেচ্ছান ন দেগং এলং ভারদত।
(ছোটবেলায় পরিবারের সঙ্গে নিজ দেশ, বাস্তুভিটা ফেলে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়া এক শিশুর কথা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। যে কখনো নিজের গ্রাম, নিজের জন্মভূমি দেখেনি। আজ সে বড় হয়েছে। দীর্ঘ শরণার্থী জীবন পার করে অন্য সবার সঙ্গে সে-ও ফিরছে তার নিজ গ্রামে, দেশে। গানটি রণজিৎ দেওয়ানের সুরে এবং বনশ্রী চাকমা কচির কণ্ঠে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়[২৬])

কেবল চাকমা নয়, দেশের সকল নিপীড়িত জাতির শিল্প-সাহিত্যের এক লড়াকু শ্রেণী-ইতিহাস রয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিকাশে ত্রিপুরা জাতির রয়েছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু রাষ্ট্রে নিপীড়িত আদিবাসীদের সাহিত্যও নিপীড়িতই থাকছে বারবার। এ প্রসঙ্গে দেববর্মা (২০০৪) জানিয়েছেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্ম, পূজিত দেবদেবী, অনুসৃত নৃত্যকলা এবং পালিত পূজা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানাদির বৈচিত্র্য আজও যাদুঘরের বস্তুনিচয়ের মতোই বৃহত্তর লোকসমাজের চোখে অনাবৃত। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপকরণ যা জাতীয় ইতিহাস পরিকাঠামোর পরিপূরক[২৭]। ত্রিপুরা (২০০২) ত্রিপুরাদের সাহিত্য চর্চার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ককবরক ভাষা যেহেতু

সমৃদ্ধময় প্রাচীন ভাষা এবং হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাসীন ছিল সেহেতু এ ভাষার পরিধি বহুগুণে সম্প্রসারিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ককবরক শুধু রাষ্ট্র ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ ভাষা বহুগুণে সম্প্রসারিত ছিল। ত্রিপুরা মহারাজ বীররাজ হামতর কা ৫৯০ খৃস্টাব্দে বঙ্গজয় করেছিলেন। এই বঙ্গবিজয়কে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি বর্ষপঞ্জিকা ত্রিপুরাব্দ প্রবর্তন এবং 'ত্রিপুরা রত্নাকরনিধি' কাব্য রচনা করিয়েছিলেন। চতুর্দশ দেব মন্দিরের চোন্তাই সম্পূর্ণ ককবরকে তালপাতায় এটি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা মহারাজ সেংতুংফার সময়ে 'রাজমালা' ও 'বিজয়িস্ত্রী' মহাকাব্য রচিত হয় ককবরক ভাষাতেই। ত্রিপুরা মহারাজ ধর্মমানিক্য ৮৬০ ত্রিপুরাব্দে (১৪৫০ খৃস্টাব্দ) শুক্রেশ্বর এবং বানেশ্বরকে দিয়ে 'রাজমালা' বাংলায় অনুবাদ করান। ত্রিপুরা জাতির সাহিত্য চর্চার সুবর্ণ অধ্যায় সূচিত হয়েছিল ১৮৬০ খৃস্টাব্দ থেকেই। ত্রিপুরা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তিন কন্যা অনঙ্গ মোহিনী দেবী, গিরীন্দ্র বালা দেবী ও মৃণালিনী দেবী সাহিত্যচর্চা করতেন। অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কবিতার বই 'কর্ণিকা' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সনে। ১৯০৩ সনে 'শোকগাঁথা' এবং ১৯০৭ সনে তাঁর 'প্রীতি কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্র কুমার দেববর্মা 'ত্রিপুরা ভাষা' নামে একটি সাহিত্যপত্রও প্রকাশ করেন ১৯০৩ সনে। ১৯১৭ সনে মহেন্দ্র দেববর্মার নাটকের বই 'পতিব্রতা' প্রকাশিত হয়, রাধামোহন দেববর্মার 'ককবরক' 'মা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। বাংলাদেশে ১৯৩৬ সনে খুশী কৃষ্ণ ত্রিপুরার গীতি সংকলন 'খা কাচাংমা খুম্বার' প্রকাশিত হয়। ১৩৭০ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হয় তার 'ককবরক ককতাং' গ্রন্থটি। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বরেন ত্রিপুরা, নববিক্রম ত্রিপুরা, প্রবাংশু ত্রিপুরা, মহেন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও শোভা ত্রিপুরাদের নিজস্ব ককবরক ও বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা নানান বাধা আর নির্যাতনকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে। বরেন ত্রিপুরার নঙ কাচাকছার জীবন মোর্চা, অজানা পাহাড়ি সুর, বরোক এবং প্রভাংশু ত্রিপুরার ত্রিপুরা জাতির লোককাহিনী, ত্রিপুরা লোকসঙ্গীত, খুম সাংদারী বেশ উল্লে-খযোগ্য রচনা[২৮]। ত্রিপুরা জাতি কেবল ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষাতে নয়, সাহিত্য আন্দোলনে বাংলাকেও করেছেন আপনজন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা (২০০১) লিখেছেন, ত্রিপুরা রাজন্যবর্গ বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও বাংলার প্রতি সব সময় অনুরাগ দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং করিয়েছেন এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে আগরতলা বইমেলা ২০০০ উপলক্ষে প্রকাশিত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পত্রিকা 'গোমতী'তে রমাপ্রসাদ দত্ত লিখেছেন, এ-কথা স্মরণ করতে হবে মূল সাহিত্যবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল ত্রিপুরার মাটিতে রাজাদের দ্বারাই এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই সর্বসাধারণের সাহিত্য অনুশীলনে মহীরূহে পরিণত হয়েছিল[২৯]।

তঞ্চঙ্গ্যা (২০০৩) জানান, বিষুকে ঘিরে তঞ্চঙ্গ্যাদের রয়েছে সাহিত্যকর্মের বিশাল ভাণ্ডার। বিষুকে নিয়ে অনেকে লিখেছেন কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ আরও কত কী। বিষুকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের এ বিপুল সৃষ্টির পথ ধরে তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতমনা সচেতন সমাজ গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করে চলেছেন বিভিন্ন প্রকাশনা[৩০]। নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালায় সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে যেয়ে তঞ্চঙ্গ্যা (২০০৩) জানান, তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা কালের চর্চার অভাবে তারা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন[৩১]।

কাবা ঈখ্যাইংজি কাবা স্বায়াজি
রাইংম্যোহজুং কাংসাংবাজি
লু খ্যাংখ্যাং খ্যইক্খাংবাজি
নিহ্বাইং লাইঃগো ম্রাংবাজি।
(জগৎ সুখময় হোক, জগৎ শান্তিময় হোক
সকল দ্বেষ-হিংসা নির্মূল হোক
মানুষে মানুষে মৈত্রী বন্ধন হোক
নির্বাণ মার্গ এ'ভাবে দর্শিত হোক)[৩২]।

মারমা কবিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে খান (২০০৮) বলেছেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার কবি ক্যশৈপ্রু, উচহ্লা, মংক্যশোয়েনু নেভী, চ থুই ফ্রু, মংসিংঞ্জো কিংবা খাগড়াছড়ির উশোপ্রু মারমার কবিতায় স্বভাবসম্মত পরিচর্যা বেশ বলিষ্ঠ সরলতা ও গীতলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে[৩৩]। মারমাদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় ঞ্যোহলাম (২০০৩) বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমারা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় সমৃদ্ধ এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের বর্তমান সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম তাজিনডং। এটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। তাজিনডং একটি মারমা ভাষার শব্দ, এর বাংলা করলে দাঁড়ায় 'গহীন অরণ্যের পাহাড়'। কিন্ত এই তাজিংডং শব্দটি তৎকালীন সরকার পরিবর্তন করে রাখেন 'বিজয়'। আমরা খুব খারাপ লেগেছিল আমি, চিন্তা করে পাই না মারমা ভাষার শব্দটি থাকলে কী হতে পারত? বাংলাদেশের মানুষ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করেছিল। আর এই দেশেই নাকি তাজিনডং নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বিজয়। তাহলে কোথায় মারমা ভাষার স্বীকৃতি?[৩৪]

ফরিদ (২০০৬) তার 'পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া : ভাষা ও সাহিত্য' বইতে পাংখোয়াদের সাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া লোকসাহিত্য মূলত তাদের মৌখিক সাহিত্য যার কোনো লিখিত রূপ নেই বলেই আমাদের ধারণা। পাংখোয়াদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রূপকথা, কিংবদন্তী, কিসসা, ছড়া,

কবিতা, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি। এসব লোকসাহিত্যে তাদের অরণ্যচারী জীবনব্যবস্থা, জুমচাষ, শিকারজীবী সভ্যতা ইত্যাদির বর্ণনা প্রকাশিত। পাংখোয়া লোকসাহিত্যের আড়ালে আদিম অরণ্যচারী পাহাড়ি আদিবাসী জনগণের সহজ সরল নিস্তরঙ্গ জীবনের যে মধুর চিত্র অংকিত রয়েছে তা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান। পাংখোয়াদের ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনকে থৌংপিং, ধাঁধাকে সিং ইনতেন বা সিং মেথ্রেং বলে। তুইচং ও সুয়ানলু সুয়ানলা পাংখোয়াদের ঐতিহ্যময় লোককাহিনী[৩৫]।

আর তে উই লা
আর তে এই মু-মুদ
না-নু চাং চেল এক থাই কাল কাল না-পা-সা-বি
মে ফুর কাল কাল ইন চুং আন রামো আম, ইনথ খূয়াই আন
সা ঙার আম, নাং চিত, কেই চিত, আ-ই-ই
(পাংখোয়া শিশুরা মুরগির বাচ্চাকে ধরে মুরগির বাচ্চা ঘুমপাড়ানি গানটি করে। মুরগির বাচ্চা ঘুমাও ঘুমাও/তোমার মা কেঁচোর গু আঁচড়াতে গেছে/তোমার বাবা হরিণের মাংস আনতে গেছে/তোমার ঘরের উপর চিল, নিচে বনবিড়াল/তোমার ভয়, আমার ভয় আ ই ই)[৩৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের রচিত নাটক এবং নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে চাকমা (২০০৮) জানান, ১৯৮১ সনে রাঙামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল গঠিত হয় যা পরবর্তীতে জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) নামে পরিচিত হয়। জাক চিরজ্যোতি চাকমার লেখা আনাত ভাজি উধে কা-মু নাটকের মাধ্যমেই নাট্যমঞ্চেও তাদের যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় চব্বিশটি নাটক মঞ্চে আনে জাক। ১৯৯১ সালে সামরিক সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বদল হয় গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে। ঠিক ঐসময়টাতেই বিঝুর সময় জাক মঞ্চায়ন করে মৃত্তিকা চাকমার নাটক 'মহেন্দ্রর বনভাঝ'[৩৭]।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর আদিবাসীদের সাহিত্য পরিস্থিতি প্রসঙ্গে চাকমা (২০০৩) বলেন, সাহিত্য যেমন ভাষা টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঠিক তেমনি সাহিত্য সমাজের দর্পণ হিসেবেও কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে বম, পাংখোয়া, লুসাই, খুমি, চাক ও খিয়াংদের সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। তাছাড়া আদিবাসীদের পূর্ব পুরুষদের অনেক সাহিত্যকর্মগুলোও তেমন সংরক্ষণ করা হয়নি, যার ফলে পূর্বপুরুষদের অনেক সাহিত্যকর্ম অযত্ন অবহেলায় হারিয়ে গেছে। আর বর্তমানে আদিবাসীদের সাহিত্যকর্ম সাহিত্যের মর্যাদা শিক্ষিত (!) অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এই শিক্ষিতের মধ্যে বেশির ভাগ অংশ ও মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা না করে বাংলা ভাষায় করে। যার ফলে ঐ সাহিত্য অন্য ভাষার (বাংলা ভাষার) সাহিত্যতে

যেমন যথাযথ স্থান পায় না তেমনি ঐ সাহিত্য আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণে কোনো উপকারে আসে না। তবে ইদানিং কিছু কিছু আদিবাসীদেরও স্ব স্ব ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে দেখা যায়। বিশেষ করে চাকমাদের। যেমন চাকমা ভাষায় কবিতা, ছড়া, গল্প, নাটক ইত্যাদি দেখা যায়। মারমা ও ত্রিপুরাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা সামান্য দেখা গেলেও তা যথেষ্ট নয়। অন্য আদিবাসীদেরও মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগী হতে হবে[৩৮]। সাত্তারের (১৯৭৫) বিবরণও বলছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য *উপজাতিদের* মতো লুসাইদের সাহিত্যও বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে[৩৯]।

উত্তরবঙ্গ ও বরেন্দ্র জনপদ
খাদ্দি চান্দো হিওরে লাদনা
ফাগগু চান্দো হিওরে লাদনা
ভার চান্দো, চান্দোরে লাদনা
বিরিম চান্দো, হোড়স, লেনা
খাঁ হয়ান এর; অর হিওরে লাদনা
খেড়ওন এরং অর হিওড়ে লাদনা
ভার চান্দো চান্দোরে লাদনা
বিরিম চান্দা জোড়স লেনা
(সাঁওতালদের সারহুল পরবের একটি গীত। সারহুলের চাঁদ দেখে হৃদয় নাচেরে/ফাগুয়ার চাঁদ দেখে হৃদয় নাচেরে/ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে হৃদয় নাচেরে/চাঁদের ক্ষয়ে যাওয়া দেখে হৃদয় নাচেরে/নতুন বধূর আগমে হৃদয় নাচেরে/দেবর দর্শনে বধূর হৃদয় নাচেরে/পূর্ণিমার চাঁদ দেখে হৃদয় নাচেরে/পূর্ণিমার ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ দেখে হৃদয় ব্যাথাতুর হচ্ছে[৪০])

আমরা এবার আলোচনাকে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ এবং বরেন্দ্র জনপদে নিয়ে যাব। উত্তরবঙ্গের মূলত সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাহালী, পাহান, কর্মকারদের ভেতরেই মুদ্রিত সাহিত্যচর্চার কিছু কিছু না হদিশ আমরা জানতে পারি। সিকদার ও কিস্কু (২০০৫) সাঁওতাল সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে যেয়ে বলেন, অতি প্রাচীন সাঁওতাল জাতির নিজস্ব কোনো লিখিত সাহিত্য না থাকায় তাঁদের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা অতি জটিল সমস্যা। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা না থাকার জন্য মিশনারিদের রচনাগুলোও হয়েছে একদেশদর্শী ও প্রায়শ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফলে সত্য আবিষ্কার এখানের প্রধান অন্তরায়। যে কোনো লোকসমাজের মতোই সাঁওতালদের মধ্যেও মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যশালী ভাণ্ডার রয়েছে। গল্প-কাহিনী ছাড়াও তাদের ধর্মীয় ভাবনা, সাংস্কৃতিক চিন্তার যে প্রসার ঘটেছিল, বিস্তারিত মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়[৪১]। ১৮৫৫ সনের সাঁওতাল হুল বা বিদ্রোহ নিয়ে কলিকাতার কর মজুমদার এন্ড কোম্পানি থেকে

১৩৩০ বাংলায় প্রকাশিত হয় 'সাঁওতাল কাহিনী বনবীর-গাথা'। রচয়িতা শ্রী লোকনাথ দত্ত একে '১৮৫৫-৫৬ খৃস্টাব্দের সাঁওতাল-সমর অবলম্বনে' লেখা হিসেবে দেখিয়েছেন[৪২]। ১৯৫১ সনে মাঝি রামদাস টুডু রেস্কা সাঁওতাল সমাজের ধর্ম ও কাহিনী সংগ্রহ করে 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' রচনা করেন। বইটির প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, এই কাহিনী আমাদের খেরওয়াল বংশের সব লোকেরাই বুঝতে চেষ্টা কর। সবাই শুনে রাখ, সবাই শিখে নাও। এই গ্রন্থ বারোবছর ধরে অনুসন্ধান করে প্রকাশিত হল। বারো বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে। আর তার জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে। তবেই এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। খেরওয়াল বংশের মানুষ আমরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করি, কিভাবে আমাদের জীবনধারণ করতে হবে, তা এই ধর্মগীতিকাব্যে বিধৃত হয়েছে[৪৩]।

ধীরে ধীরে বসতভিটা, গাছপালা সবই শেষ হয়ে গেল
আমি এখন নিজ দেশে পরবাসীর মতো।
ওরা এখন আমাকে বলছে
যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারো তুমি[৪৪]।

'বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক বইতে রাজবংশীদের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে বিশ্বাস (২০০৫) লিখেছেন, রাজবংশী সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে জাগরণী ভাওয়াইয়া, জাগ, গাজন, হুদুমাগান প্রভৃতি। রাজবংশী সমাজে ছেলে-ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, পারিবারিক-সামাজিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক-আচার অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে[৪৫]।

জলিল (১৯৯৯) ওঁরাওদের সম্পর্কে লিখেছেন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওঁরাও সমাজে প্রচলিত রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান লোককাহিনী। এসব লোককাহিনীর বিচার-বিশ্লেষণও পরিলক্ষিত হবে বিশ্বের অপরাপর প্রান্তের লোককাহিনীর টাইপ মটিফ ইনডেক্সের অপূর্ব সাদৃশ্য[৪৬]। প্রতিটি মানবজাতির একটি ইতিহাস আছে তেমনি কুড়ুখ জাতিরও নিজস্ব একটা ইতিহাস রয়েছে[৪৭]। এক্কা (২০০৪) ওঁরাও সমাজের লেখকদের বিষয়ে তার একটি লেখায় বলছেন, আশার কথা যে আমাদের ওঁরাও সমাজে বৈদ্যনাথ টপ্য, অরুণ খালকোর মতো লেখক হিসেবে বেশ কজন নবীন-প্রবীণ লেখক স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সেমিনার সমাবেশে বেশ কিছু খুদে লেখক-লেখিকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এসব উদীয়মান লেখকরা যদি সুশিক্ষিত, সচেতন, উদারনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন হন এবং ধর্মীয় আবর্তের বাইরে থেকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে ওঁরাও সমাজের সার্বিক চিত্র অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন তবে ওঁরাও সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হবে[৪৮]।

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল

আমরা এবার পাহাড়-বনভূমি-বরেন্দ্র ও সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে রাখাইনদের সাহিত্যআন্দোলন ভূমিতে। অং (২০০৩) রাখাইনদের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে বলেন, খৃ.পূ ৩৩২৫ অব্দ হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কালাদান নদীর তীরে গড়ে ওঠা সুসভ্য রাখাইন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক পটভূমিকে ভিত্তি করে রচিত সাহিত্যভাণ্ডারকে যথাযথভাবে প্রকাশনার উদ্যোগ নিলে বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হত। বিভিন্নসময়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিলালিপি, স্মৃতিস্তম্ভ, পুঁথি ও গুহাদেয়ালে উৎকীর্ণ লেখা থেকে ধারণা করা যায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে রাখাইন প্রে তথা আরাকানে খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের সাহিত্যিকগণ ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করতেন। খ্রিস্টীয় ৬০১ সালে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা আর ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রাজকুমারী চপ্রেঞোর (সুবর্ণ দেবী) 'ছিংকেঙমিংটঙ' বিরহগীতিকাখানি রাখাইন সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। ৭৬৮ সালে ধম্মজেয়ার লেখা 'লেটঅছেং' গীতিকাটিও রাখাইন সাহিত্যের অনন্য কীর্তি। উইধুরা, উইমালা, উককব্যেং, পাইঞাবংশ, সোয়েছের মতো দক্ষিণাঞ্চলের রাখাইন সাহিত্যিকরা ১৭ শতকেই নিজ ভাষায় সৃষ্টি করে গেছেন অমর সাহিত্য। চলতি সময়ে উ তান সিয়েন, সাউ তুন ও, উসিট মং, মং থান ওয়ে, ক্যথিংঅং, মংউসাং, উক্যথিন, অংথিংমং, মংছেনচীং (মংছিন), মংহ্লাপ্রু, তাহান, উএনু, অংক্যচিন, উহ্লামং, উবাচং, উসিট মং, মংছালু লেখকেরা বাংলা-ইংরেজি এবং কেউ কেউ রাখাইন ভাষাতেও লেখালেখি করছেন[৪৯]। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত রাখাইন নামক সংকলনে 'সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চায় রাখাইন সম্প্রদায়' নিবন্ধে নন্দলাল শর্মা রাখাইনদের সাহিত্য ও সাংবাদিকতা-চর্চা নিয়ে আলোচনা করেন[৫০]।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়ালগড় অঞ্চল

মেআসা : ও....ও....ও....
বরুয়া ওয়ানি রঙ্গিও (চিচরৎ মাংগিনিং) ২
হাই, ননো রিবাবো, রেরে রিংনা সাকিগিনিং
হারেরে হারেরে।।

মেচিক : ও....ও....ও....
রে রে খালনান্ রিবানু (রাং খারাম গাম্মানা) ২
নাম্মেন খুসি হংবিজক রে রে খালনা রিক্গামানা
হারেরে হারেরে ।।

(পুরুষ : ও....ও....ও....
বরাক বাঁশের আগায় বসে (দুটি চড়ুই নিরালায়)২

এসো, বোন, রেরে গাই, মনের সুখে দুজনায়
হারেরে হারেরে । ।
মেয়ে : ও....ও.....ও.....
থাকতে আমি পারিনিকো (রাং খ্রামের মূর্চ্ছনায়)২
আরো খুশি হলাম আমি, রেরের সঙ্গী পেয়ে তোমায়
হারেরে হারেরে । ।)[৫১]

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুর এলাকার মান্দি, কোচ, হাজং, বানাই, ডালু, হদি, রাজবংশী, লেঙাম জনগোষ্ঠীদের ভেতর মূলত মান্দি ও হাজংদের ভেতরেই চলতি সময়ে মুদ্রিত সাহিত্যচর্চা বেশি দেখা যাচ্ছে। মান্দিদের 'দিগ্নিবান্দি' ও 'শেরানজিংপালা' মহাকাব্যদ্বয় এখনও রাষ্ট্রের অধিপতি সাহিত্যবিলাস বিবেচনায় আনেনি। নেত্রকোণার দুর্গাপুরের বিরিশিরিতে ১৯৭৭ সনে প্রতিষ্ঠিত 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী' থেকে আদিবাসী সমাজের সাহিত্য দর্পণ ঘোষণা করে প্রায় অনিয়মিত 'জানিরা' নামে একটি প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় মূলত কিছু গান-কবিতা এবং খুবই গতানুগতিক আলোচনা ছাপানো হয়। যার কোনো শ্রেণীদার্শনিক এবং যাপিতজীবনের রাজনৈতিক ভিত্তি ও জোর নেই। দারিং (১৯৯৯) রোমান হরফে কিন্তু মান্দিদের আ.চিক ভাষায় (যদিও খ্রিস্টীয় মিশনারিরা এই কিছু পরিবর্তিত রোমান হরফকেই আ.চিক বর্ণমালা হিসেবে ব্যবহার করছেন) মোট সতেরটি গল্প লিখেছেন ছোটদের জন্য[৫২]। মান্দিদের ভেতর জেমস জর্নেশ চিরান, মতেন্দ্র মানখিন, সঞ্জীব দ্রং, জেমস ওয়ার্ড খকসী, বচন নকরেক, বাবুল ডি নকরেক, পরাগ রিছিল, রাখী ম্রং, মিঠুন রাখসামদের কবি ও লেখকেরা মূলত বাংলা ভাষাতেই নিজস্ব সাহিত্য আওয়াজ তুলেছেন।

ইয়া নাংনি ককাসিল আমা
ইয়া নাংনি গাগরি ও রানী।
নাংনা ফাতনাজক হাই, হাই রেবা
হাই রেবা নকগোনা হাই রেবা।
(এই তোমার টিকলি মা/এই তোমার পায়ের ঝুমুর ওগো রানী/তোমাকে পরাবো লক্ষ্মী সোনা/ঘরেতে ফিরিয়া তুমি আস[৫৩])

রায় ও অন্যান্যরা(২০০৯) তাদের 'বাংলাদেশের ডালু' বইতে জানিয়েছেন, যতদূর জানা যায়, ঐতিহ্যগতভাবে ডালুরা বৈচিত্র্যময় সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় পারদর্শী ছিল। ডালুদের অধিকাংশ শিল্পচর্চার কোনো লিখিত রূপ না থাকায় এবং সংরক্ষণের অভাবে কালের আবর্তনে সেইসব চর্চা আজ বিলুপ্তপ্রায়[৫৪]।

শালিক মানি কেচ ক্যাচায়
জাম পাকা খাইয়া
পলানু বাপ পলাই গেছে
মাগু লাঠি খাইয়া ।
হিটিং হাটাং বনের মাঝে
বড় বাঘের ভয়
তুই কেনে আইছস রাধে
আমি গেলাম হয়[৫৫] ।

হাজংদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আইয়োব (২০০৯) জানিয়েছেন, হাজংদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা না থাকলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্যচর্চা থেমে থাকেনি। ব্রিটিশ-বিরোধী গণচেতনামূলক গানগুলোকে হাজংরা টেংলাগাহেন বলেন। হাজংদের সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ ছড়া-কবিতা ও গানের কোনো গীতিকার বা সুরকারের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না[৫৬]। হাজংদের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে হাজং (২০০৯) লিখেছেন, গ্রামীণ লোকের দ্বারা সৃষ্ট হাজংদের লোকসাহিত্য লিখে রাখার কোনো উপায় ছিল না বলে এগুলো স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে। আর স্মৃতিনির্ভর বলে এগুলো যুগপ্রবাহে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে বিভিন্ন আকৃতিতে গড়ে উঠেছে[৫৭] ।

ও সং...ও লুলা...
আমলা চান জোনাকলা
আবু কুমায় ঘালে,
জুলকা-জুলকি চরমাগা
ওরাও কুমায় যালে!
উমাগে আফির ফিরিয়া আনিবাগে
উঠিক বিলালা আগে
ও সং উঠিক পুখি ডুকরালা আগে
ও লুলা উঠিক বিলালা আগে ।
(ও সখা....ও সখী/ জোছনা রাতের দাদী/কোথায় চলে গেল/বোকা-বোকী চরমাগা/ওরা কোথায় হারালো/তাদের ফিরে আনার জন্যে/ তুমি উঠ সূর্যের আগে/ ও সখা উঠ পাখি ডাকার আগে/ ও সখী উঠ সূর্য উঠার আগে[৫৮])

আইয়োব (২০০৫) জানিয়েছেন, ছড়াকে হাজংরা হিংলা বলে। ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলিছড়াসহ খেলার ছড়ারগুলোর পাশাপাশি গীতে-প্রেম-বিরহ প্রকৃতি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। একই সঙ্গে শাসন-শোষণের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার রূঢ় চেতনার

কবিতার সন্ধান হাজংদের লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। হাজংরা গীত বা গানকে গাহেন বলে। ভারত উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বারোমাসী গীতের সন্ধান হাজংদের লোকসাহিত্যেও পাওয়া যায়। এ গীতকে হাজংরা রসিগাহেন বলে। হাজং নারীরা নদী-খাল-বিলে বাঁশের তৈরি জাখা দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জাখামারা গাহেন করে থাকেন। বর্ষায় ক্ষেতে ধানের চারা লাগানোর সময় হাজং নারী-পুরুষ রোয়া লাগানো গাহেন করে থাকেন। নিজস্ব তাঁত বানাতে কাপড় বোনার সময় নারীরা বানাগড়া গাহেন করে থাকেন। পাহাড়-জংগলে আগাছা পরিষ্কারের সময় লতা ধরে টানতে টানতে লেওয়াতানা গাহেন করে থাকেন। আশ্বিন-কার্তিক মাসে চরমাগা ও দেউলী উৎসবে গোপিনী গাহেন এবং ভাঙানৌকা গাহেন প্রচলিত আছে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গানগুলোকে হাজংরা টেংলা গাহেন বলেন। ধাঁধাকে হাজংদের ভাষায় হীলুক বলে[৫৯]।

জন্মিয়া হাজং কুলে ধন্য জন্ম মানো
শ্বাশত মানবজন্ম সংখ্যা নাহি জানো[৬০]।

প্রবাদবাক্যকে হাজংরা থাচিকথা বলে। আবার চাকমারা প্রবাদ-প্রবচনকে ডাগহধা বলে[৬১]। পৌষসংক্রান্তির নিশিরাত জাগরণের সময় হাজং ছেলেমেয়েরা যে উপকথাগুলো বলে থাকে তা নিয়ে লেখক শ্রী হাজং নিখিল রায় সনে 'জোনাকীর আলো' নামে একটি বই লেখেন। ১৯৮৬ সনে নেত্রকোণার বিরিশিরিতে অবস্থিত *উপজাতীয়* কালচারাল একাডেমী বইটি প্রকাশ করে[৬২]।

বৃহত্তর সিলেট ও হাওর অঞ্চল

সিলেটের আদিবাসীদের ভেতর মূলত মৈতৈ মণিপুরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, খাসিয়া, মান্দি, হাজং, লেঙাম এবং চা-বাগানের বিশাল আদিবাসী বাগানিয়া জনগণ বেশ জোরেসোরে সাহিত্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ঐতিহাসিকভাবেই। খাসিয়াদের সাংস্কৃতিক পাটাতন নিপীড়িত হওয়া নিয়ে লামিন (২০০৯) তার এক লেখায় লিখেছেন, দীর্ঘদিন ধরে মিথষ্ক্রিয়ার কারণে মূলধারার সংস্কৃতি খাসি সমাজের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে এবং আস্তে আস্তে সেই সংস্কৃতি খাসিদের জীবনব্যবস্থায় শেকড় গাড়ে। এভাবে প্রতিনিয়ত মূলধারার সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সাথে মিথষ্ক্রিয়ার কারণে খাসি সমাজের নিজস্ব কাঠামো, সংস্কৃতি হারিয়ে যায়[৬৩]। পাশাপাশি সৌরভ (২০০৮) জানিয়েছেন, বর্তমানে রোমান হরফ ব্যবহার করে খাসিয়ারা নিজেদের ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং পত্র আদানপ্রদানও করে থাকেন। তবে এদের প্রাচীন সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না[৬৪]। খাসিয়াদের নিয়ে একটি গবেষণায় আহসান (১৯৯৭) জানিয়েছেন, অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন উপজাতীয় লোকসাহিত্যের ভেতর খাসিয়া লোকসাহিত্যই সম্ভবত বেশি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, খাসিয়া সমাজে এরূপ কোনো লোক-সাহিত্যের উপাদান বর্তামান গবেষকের চোখে পড়েনি[৬৫]।

আকমু চিকারি দিয়া কথা এতা মাতিস ইত্তাউ
নিবে যারগা হাকহানদে তোর কথাতারাগি শাতক
কথা দিয়া না-থছিলা মানু লাজে আহিগি জিপাগা
আধারর তলে আজি খংচেলর বেদিশা মিঙালে
বাজিস হে খঞ্জনিগ হৃৎনর্তর তালে তালে ।
(একবার চিৎকার করে বলো বন্ধু কথাগুলো
নিভে যাওয়া আকাশে তোমার কথানক্ষত্র ফুটুক
কথা দিয়ে না রাখা মানুষ চোখ ঝিমাক লজ্জায়
আঁধারের তলে আজ দিশাহারা কণ্ঠমণিজালে
বেজে ওঠো হে খঞ্জনি হৃৎনর্তনের তালে তালে[৬৬] ।)

মৈতৈ মণিপুরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি এবং মৈতৈ মুসলিম বা পাঙন এ ধরনের জাতি-ধর্ম-শ্রেণী বিভাজন থাকা সত্ত্বেও যখন একটি একক পরিচয়ে 'মণিপুরি' শব্দটি বহাল হয় তখন অধিপতি ব্যবস্থার নিপীড়নগুলো চকচক করে উঠে । তাই আমরা দেখতে পাই সাত্তারের (১৯৭৫) মতো অনেক ডাকসাইটে লেখক-গবেষকেরা এখনও পর্যন্ত এটি বহাল রেখে বলেন, অন্যান্য উপজাতিদের মতো মণিপুরি লোকসংস্কৃতিও খুব সমৃদ্ধ । মৈতৈ মণিপুরি ভাষার বিশিষ্ট কবি একে শেরাম (২০০৮) মণিপুরি সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ । মনিপুরি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের চাইতে প্রাচীন বলে বিবেচিত । উৎকর্ষের বিচারেও মণিপুরি সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত[৬৭] । মণিপুরি লোকগীতিগুলো লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার[৬৮] । আহসান (১৯৯৮) তাঁর 'মণিপুরিদের' নিয়ে এক গবেষণায় মণিপুরিদের শিল্প ও সাহিত্য অংশে তিনি মূলত মৈতৈ মণিপুরিদের নৃত্যকলা নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি লিখেছেন, লাইহারাওবা নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গিমা উপস্থাপনা অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশে দেখা যায় না । তবে ঐতিহ্য হিসেবে এখনও লাইহারাওবা জাগোই-এর কথা মণিপুরিদের মুখে মুখে ফিরে । মানুষের মানসপটে অঙ্কিত অপর নৃত্যটি হচ্ছে খাম্বা খোইবীর প্রেমমূলক অমর সাহিত্যনির্ভর খাম্বা-খোইবী জাগোই । সাধারণত মোইরাং কুলদেবতা থাংজিং-এর সামনে এই অমর কাহিনীর মিলনাত্মক রূপের আনন্দময় উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে । তিনি আরো লিখেছেন, কলাক্ষেত্রে মণিপুরিদের ঐতিহ্যের পাশাপাশি এই নৃ-গোষ্ঠীর সাহিত্য-ঐতিহ্যও প্রশসংনীয় । নানা ধর্মীয় পুরাণসংশিষ্ট সাহিত্য ছাড়াও এদের রয়েছে মানবিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার । কাল পরিক্রমায় অনেক সাহিত্যগাথাই যদিও আজ ধংসপ্রাপ্ত তবু খাম্বা থৌবীর অমর সাহিত্যগাথাটি উল্লেখযোগ্য[৬৯] । কবি এ কে শেরামের সম্পাদনায় বাংলা হরফে মৈতৈ মণিপুরিদের ভাষায় 'মণিপুরি শক্তাক-খুদম' নামের এক শিল্পসাহিত্যের ছোটকাগজ প্রকাশিত হয় সিলেট থেকে যেখানে মৈতৈ মণিপুরিদের জাতিগত আহাজারি প্রবাহিত । ১৯৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল এটি প্রকাশ করে ইন্টিগ্রিটেড

মণিপুরি এসোসিয়েশন (ইমা) বাংলাদেশ। মিয়া (২০০৫) জানিয়েছেন, প্রায় দেড়হাজার প্রবাদ-প্রবচন মণিপুরি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন, মণিপুরি লোককথা বা গ্রামীণ গল্পকে বলা হয় 'ফুঙ্গাওয়ারী'। ফুঙ্গা হচ্ছে মণিপুরিদের গরের ঠিক মাঝখানে যে আগুন রাখা হয় তার নাম এবং ওয়ারী মানে গল্প। এর আরেক নাম চাকঙাই ওয়ারী। চাকঙাই মানে ভাতের জন্য অপেক্ষা করা। দিনের কাজকর্ম সেরে মা যখন রান্না করতে যান তখন মুরুব্বিরা বাচ্চাদের একত্রে বসিয়ে ভাতের অপেক্ষা করে গল্প বলেন[৭০]। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের মণিপুরি থিয়েটার স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে বেশ লড়াকু নাট্যদল এবং জনইতিহাস থেকে গণবিপ্লবের দ্রোহ ছড়িয়েছে চাবাগান থেকে সকল মণিপুরি বসত অবধি।

ডুংগুরীর উপরে কেরে ঝাটি কাটে?
হামি বটি গো নাগবংসী বাজার বেটা
সরু দাতন কাটি[৭১]।

আদিবাসী সাহিত্যের আদিবাসী বৈভব

জাগো জুম্ম নারী জাগো
ঐক্য শিক্ষা সাম্য মৈত্রী গড়বো
গড়ে তুলবো
জাগো জুম্ম নারী জাগো[৭২]।

আদিবাসী সাহিত্যের বৈভব নিয়ে আলোচনায় আমাদের পয়লাই বলতে হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা আদিবাসীদের ভাষায় কিংবা বাংলা হরফে আদিবাসী ভাষায় বা আদিবাসীদের নিজস্ব হরফ এবং ভাষায় মূলত কবিতাচর্চা করতেই দেখি বেশিরভাগ কবি ও লেখককে। গল্প-উপন্যাস খুব একটা দেখা যায় না। তবে আদিবাসীদের ভেতর অনেকেই গবেষণা প্রবন্ধ, মুক্তগদ্য, স্মৃতিচারণ, আলোচনা লিখে থাকেন। সম্পূর্ণ চাঙমা বর্ণমালা ও ভাষায় দেবপ্রিয় চাকমার উপন্যাস 'ফেবো' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে, এটি প্রকাশ করে পোগাদাঙ, এর প্রচ্ছদ করেছেন হাপং ত্রিপুরা মিলন। এছাড়াও কিছু বাংলায় লেখা গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন কেউ কেউ, বেশকিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটক এবং নাট্যচর্চা অব্যাহত আছে আদিবাসী ভাষায় এবং আদিবাসী এলাকায়।

ইসলাম (১৯৯১) জানিয়েছেন, বাংলাদেশেও ইদানিং শিক্ষিত গারো হাজংগণ যারা নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে ভাবেন তারা তাদের চিন্তাচেতনা লিখিত আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। তাই এদেশের শিক্ষিত গারো হাজংরা নিজেদের ইতিহাস, পুরাকীর্তি, লোকসাহিত্য তথা

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধানে এবং তার আলোকে জাতীয় সাহিত্য রচনার করার তাগিদ অনুভব করছেন[৭৩]। কিন্তু সাংমা (১৯৯৪) এটি এতটা মনে করেন না, তিনি নিজস্ব ভাষা ও জাতিগত উপাদানকে উল্লেখ করে বলেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উপজাতি যুবক-যুবতীদের কিছু অংশের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা লক্ষ করা গেলেও অবচেতন মনে এবং অনিবার্যভাবে তারা তাদের ভাষা এবং সাহিত্যের উপাদানগুলো ভুলে যাচ্ছেন[৭৪]। কিন্তু চলতি সময়ে আদিবাসী বসতি এবং জাতিগোষ্ঠীর ভেতরে মুদ্রিত সাহিত্যচর্চার একটা দারুণ চল তৈরি হয়েছে। বৈসুক, বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, হকতই, বড়দিন, ছোটদিন, নববর্ষসহ নানান ধর্মীয় ও সামাজিক পরবের সাথে যুক্ত হয়েছে নানান মানবাধিকার দিবস এবং আন্দোলন-সংগ্রামের স্মৃতিবহ কিছু দিন এবং বেশকিছু জাতীয় দিবস। এসব দিবস এবং দিনে নিজেরা মিলে ছোট কাগজ প্রকাশের একটা চল তৈরি হয়েছে মূলত প্রায় সব আদিবাসী অঞ্চল এবং জাতির ভেতরেই। প্রমোদ সিংহ, চন্দ্রজিৎ সিংহ, এইচ. নানাচা, সোহেল হাজং, ত্রিঝিনাদ চাকমা, পিপিকা ত্রিপুরা ও হরেন্দ্রনাথ সিং মিলে ২০০৯ সনে 'নৃ-তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মুখপত্র' হিসেবে *কথা* নামে একটি ছোট কাগজ প্রকাশ করেন। 'কথা'র ভূমিকায় তারা লিখেছেন, বাংলাদেশের নৃ-তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে লেখালেখির চর্চা যে সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল, তাকে আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যেই মূলত 'কথা' প্রকাশ করার উদ্যোগ। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা কিংবা গ্রন্থ দেশের অন্যপ্রান্তের কাছে কোনোভাবে এসে পৌঁছায় না, আবার সিলেট কিংবা ময়মনসিংহ অঞ্চলের মণিপুরি ভাষা, আচিক ভাষা কিংবা হাজং ভাষার পত্র-পত্রিকা কিংবা সাহিত্যচর্চার কোনো খবর গিয়ে পৌঁছায় না দেশের অন্য প্রান্তে, আর সিলেট কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঠকদের কাছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার কবিতা-গল্পের সাথে কোনো পরিচয় নেই, অর্থাৎ একই দেশে থেকেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার লেখক-পাঠকদের মধ্যে যোগাযোগ নেই একেবারে। তাছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর ভাষার যে সমৃদ্ধ সাহিত্য, কাব্য-চর্চা কি গদ্য-চর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তা মূলধারার অধিকাংশ পাঠকদের কাছে আজও অজানা[৭৫]।

কোথায় যাচ্ছ যুবক?
যুদ্ধে।
কিসের যুদ্ধে?
গৃহযুদ্ধে।
মারতে নাকি মরতে?
মরতে তো নয় মারতে।
কাকে?
শত্রুকে।

কিসের শত্রু?

চুক্তির ।

চুক্তিতে পেয়েছো কী?

অধিকার ।

অর্জন নাকি বর্জন করেছো, ভেবেছো?

না ।

তবে কার পক্ষে লড়বে?

চুক্তির পক্ষে ।

কেন?

যা পেয়েছি আর যা পাইনি তা পাওয়ার লক্ষ্যে[৭৬] ।

আদিবাসীরা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষে যেসব স্মরণিকা, বিশেষ প্রকাশনা, ছোট কাগজ প্রকাশ করে থাকেন তার অধিকাংশের নামেই বিচ্ছুরিত হয় প্রকৃতি ও প্রতিবেশের বহমান ধারা। জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) এপ্রিল ২০০১ 'শিঙোর' নামে একটি প্রকাশনা বের করেন। চাঙমা ভাষায় শিঙোর মানে বাংলায় শেকড়। খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত বৈসুক-সাংগ্রাই ও বিজুর বিশেষ সংকলন 'তারুমে'র ভূমিকা অংশে লেখা হয়েছে, তারুম একটি চাকমা শব্দ, এর বাংলা অর্থ গহীন অরণ্য। মারমা ভাষায় তগ্রী, ত্রিপুরা ভাষায় বলং হাকারা। এক সময় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল তারুম। বলা যায় সংরক্ষিত বন। পার্বত্য অঞ্চলে যে বন ছিল তাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ আর সেই বন নেই। পুরো এলাকাকে যেন মরুভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। আজ সে হৃৎপিণ্ড দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। এ বোধ থেকেই প্রকাশনার নামকরণ তারুম[৭৭]। আদিবাসীদের রচিত বা আদিবাসী বিষয়ে অ-আদিবাসীদের মাধ্যমে রচিত সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে কোনোভাবেই 'আদিবাসী সাহিত্য' বিষয়ে কোনো একক বিশেষণ বা মন্তব্য বা সিদ্ধান্তে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ মাতৃভাষার হাহাকার ও আবশ্যকীয়তা, প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠতা, বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহ, জাতিগত টানাপোড়েন, প্রেম এইরকম বিষয়সমূহই আদিবাসী চলমান মুদ্রিত সাহিত্যের ভেতর সর্বাধিক ঝিলিক দিয়ে উঠে। খীসা (২০০৯) যেমন এই আহাজারি বলতে থাকেন এভাবে, নাগরিক হতে পারি না বলে বিজুর নগরায়ন আমাকে পীড়া দেয়। নগর সংস্কৃতির ভয়াল গ্রাস থেকে বিজুকে বাঁচানোর পথ খুঁজি। যে কারণে আমি ফিরে যাই আমার সংস্কৃতির কাছে। জুমের মামারা-সিন্ডারা আমাকে ডাকে, ক্ষেতগুলো আমাকে যাকে। রান্যার পথে পথে আমি হারিয়ে যেতে চাই। পাহাড়ি ঝরনার দু'হাত পেতে পানি পান করতে সাধ জাগে। জুমঘরের ইজরে বসে দিনরাত উভগীত গাইতে, রাধামন-ধনপুদি পালা শুনতে মনটা আমার আনচান করে। চুলে নাকশা ফুল গুজানো,

ছদরক ফুলের মালা পরা, রাঙা খাদি জড়ানো কোনো এক জুম্মবী আমার পানে চেয়ে আছে যেতে মনটা উতলা হয়ে যায়[৭৮] ।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যৌথ ও নিরাপত্তাবাহিনীর হেফাজতে নির্মমভাবে নিহত হন মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিল । এই ঘটনাকে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে চিরান (২০০৭) লিখেন,

এ কেমন কারাগার কিংবা আদালত?
যেখানে মাস্তির নামে চলে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন ।
জানি না সেই দিন কবে হবে
যেদিন থেকে আদিবাসীদের বিনা কারণে আর অত্যাচার করা হবে না
ধর্ষিত হবে না আর একটি আদিবাসী মেয়েও[৭৯] ।

চাকমা কবিদের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন 'রান্যাফুল' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চাকমা (২০০৭) লিখেছেন, আজকের আধুনিক চাকমা সাহিত্যের মধ্যে কাব্য-শাখাটি তুলনামূলক সমৃদ্ধ বলা চলে । কবিতার বিষয়, বিস্তৃতি, গভীরতায় সমসাময়িক প্রভাব লক্ষণীয় । সময়ের ব্যবধানে চাকমা কবিতারও বিষয়বস্তু, কাঠামো এবং অনুসৃত ভাষাশৈলীর উত্তরণ ঘটেছে । সময় পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার সাহস হয়ে ওঠে অসীম, আকাঙ্ক্ষা মুক্তির আর চেতনা সঞ্জীবনী[৮০] । সিনহা (২০০৯) তার অক্ষর নতুন করে চিনি : নুয়া করে চিনুরি মেয়েক বইতে বারোটি কবিতা সম্পর্কে ভূমিকা অংশে লিখেছেন, এই কবিতাগুলো আমার বড়ো আদরের, ভালোবাসার । খুবই নাজুক কবিতা, একটু বকাঝকা করলে কেঁদে ফেলবে, চড় মারলে তো বিপদ । চিৎকার চেঁচামেচি জুলুম আর ঝঞ্ঝাপীড়িত দুনিয়ায় এই নীরব নির্জন আলুলায়িত কবিতার শরীর ভেতরে যে একটি প্রান্তিক বেতনার আত্মাকে ধারণ করে আছে, সেইখানে নিমন্ত্রণ[৮১] ।

নাটোরের বনলতা নয় আমরা দেখব
বিরিশিরি সিমসাংয়ের মান্দি যুবতী
যার মুখখানা বিজয়নগর চিনামাটির
মতো ধবধবা, আঠালো কাদায় গড়াগড়ি
চুল[৮২] ।

মিঠুন রাকসামের 'মন্ত্রধ্বনি' কবিতার বইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আজম (২০০৭) লিখেছেন, মিঠুন বর্ণনাত্মক নন । ফলে ক্রম রক্ষা করে কোনো পটের আদি-মধ্য-অন্ত তৈরি করা তার স্বভাব নয় । বিশেষণের তুলনায় সঙ্কোচন কিংবা প্রকাশের তুলনায় গোপন করাই তার কৌশল । ফলে অল্প আয়তনেই তার বলার কথা শেষ হয় ।

এই স্বল্প আয়তনের মধ্যে একটা ভাব বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দু'তিনটি বা ততোধিক ছক আবর্তিত হতে থাকে। প্রতিটি ছক পৃথকভাবে ইঙ্গিতময়, প্রতীকী এবং অস্পষ্ট[৮৩]।

আমিও সাংসারেক ছিলাম
নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির ধারক
এখন হয়েছি খৃস্টান গারো
ঈশ্বরের পানপাত্র বাহক[৮৪]।

খাসিয়া চিন্তায় পৃথিবী হল মানুষের অস্থায়ী বসবাসের স্থান। পৃথিবীকে বাসা নামে অভিহিত করা হয়, এটা কখনও কোনো ব্যক্তির বাড়ি হতে পারে না[৮৫]। যেমন মিজোরা মনে করেন তারা বনপাহাড়ের সন্তান, মান্দিরা মনে করেন তারা প্রাণবৈচিত্র্যের একটুকরো অংশ, সাঁওতালরা মনে করেন জল থেকে দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে, বর্মণরা মনে করেন কুম্ভীরানীর পিঠের মাটি থেকে পৃথিবী জন্ম নিয়েছে। এই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন জগত ও জীবনদর্শন, বৈচিত্র্যময় জীবনাচার তা কিন্তু কোনোভাবেই একটি একক পদ্ধতি বা নিয়মে কথিত 'সাহিত্য ছক' দিয়ে বিচার করা যায় না। তাই এমন কোনো মাপকাঠি নেই যা দিয়ে সাহিত্য প্রশ্নহীন কায়দায় লোক বা আধুনিক, গ্রামীণ বা শহুরে হয়ে যাবে। কিন্তু অনিবার্য কায়দায় সেই চিহ্নিতকরণের বলপ্রয়োগই বহাল আছে। অবলীলায় ঐতিহাসিক কায়দায় এখনও সমাজে বহমান এবং বিকাশমান থাকার পরও কোনো প্রান্তিক সমাজের সাহিত্য হয়ে যাচ্ছে অনাধুনিক লোকসাহিত্য। এ প্রসঙ্গে রায় (২০০৭) জানিয়েছেন, বাংলাভাষী ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, জাতিগত ঐতিহ্য, শিল্প আর ললিতকলাও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলধারার লোকাচার বা সংস্কৃতিতে আদিবাসী বা বহুজাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষণীয় নয়। অনেকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সাদামাটা, 'রোমান্টিক' আদিম অথবা সময়-উপযোগী নয় বলে মনে করে থাকেন। আদিবাসীদের ভাষাকে 'উপভাষা' বা 'আঞ্চলিক ভাষা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের সাহিত্যকে 'লোকগাঁথা' হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে[৮৬]। চলতি আলাপের মূল উদ্দেশ্য হল এ ধরনের অধিপতি উপনিবেশিক ধারণা ও মতাদর্শকে রাজনৈতিক কায়দায় প্রশ্ন করা, কারণ এর ভেতর দিয়েই অনিবার্যভাবে তৈরি হচ্ছে এক প্রশ্নহীন জাতীয় সাহিত্য, যেখানে নিপীড়িত আদিবাসীর সাহিত্য নিপীড়িতই থেকে যাচ্ছে।

মাতৃভাষার বীজে সাহিত্য জুম

দেকোতে আলম রড় বয়হা হড়তে রড়মে
গগোয়া: বলি হেড়েম হেড়েম গে
বাবায়া: বলি আডি সাফা গেয়া ।
(অন্যের বুলি মুখে না তুলি মাতৃভাষায় বল
মাতৃভাষা মধু অতি, পিতৃভাষা স্বচ্ছ স্ফটিক জল[৮৭] ।)

আদিবাসীদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নিজ জাতির মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গখানি সবচে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন সবাই । বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা 'কলাখুর কন্যা' নামে বাংলা হরফে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় একটি গল্প লিখেছেন, লেখক যাকে *রূপকথা* বলেছেন । এই রূপকথাতেও মাতৃভাষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে । লিয়ন ত্রিপুরা বাংলা হরফে ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষায় লিখেছেন খাকামা (আবেগ) নামের দুই দৃশ্যের মুক্সীমা (জীবন্তিকা) । লিয়ন যেখানে দেখিয়েছেন, খলাধন ও খিরিংবী নামের দুই ভাইবোন প্রবীণ বয়সে উপলব্ধি করেন তাদের নাতি-নাতনিরা ককবরক ভাষা ভুলে যাচ্ছে । পরবর্তীতে তারা নাতি-নাতনিকে নিজের ভাষায় লিখতে-পড়তে বলেন । নাতি-নাতনি তাদের এই উপদেশ মান্য করলে তারা খুশি হন[৮৮] । মাতৃভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক জাতিদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে খান (২০০৮) আরো জানান, বাংলাদেশের আদিবাসীরা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্রজাতির কবিরা সঙ্গত কারণেই তাদের মাতৃভাষায় লেখালেখি করবার প্রবল আগ্রহবোধ করেন । এটা বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে, উপলক্ষে প্রকাশিত তাদের ছোট ছোট প্রকাশনাগুলোর ওপর নজর ফেললে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদিবাসী উচ্চারণের বাংলা হরফে এসব কবিতা বা গদ্য ছাপা হলেও পাশাপাশি নিটোল বাংলা ভাষায়ও তাদের অজস্র মৌলিক কবিতা বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হচ্ছে। এসব কবিতার সমকালীন জীবনের নানা আকুতি, রূপাবয়ব, মুখশ্রী ও মুখোশ, নানা প্রশ্ন ও সদুত্তর না-পাওয়া বেদনা যেমন রয়েছে, তেমনি চোখে পড়ে নিবিড় সারল্যমণ্ডিত জীবনের সবুজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুভূতিঘন ইহচেতনাও[৮৯] । চাকমা বর্ণগুলো দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ওঝারা তাদের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তালিক শাস্ত্র লিখে থাকেন । ইতোপূর্বে এ বর্ণগুলো কখনও ধর্মীয় এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হত । আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে চাকমারা অধিকহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় চাকমা ভাষার শব্দভাণ্ডারে পূর্বাপেক্ষা অধিকহারে বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । তদুপরি আধুনিক চাকমা কবি সাহিত্যিকগণ অনেকেই বাংলা বর্ণে চাকমা সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন । এতে অনেকক্ষেত্রে সুবিধা হলেও উচ্চারণের বেলায় বেশ অসুবিধা হয়[৯০] । আবার এই যে চলতি সময়ের নিজস্ব জাতিগত বর্ণ-হরফ-ভাষা কেন্দ্রিকতা একেও রাজনৈতিক কায়দায় পাঠ করা জরুরি । কারণ চাকমা (২০০৬) তাঁর বাল্যস্মৃতিতে জানাচ্ছেন, ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে চাকমা

রাজ্য দখল করে, ১৮৬৩ সালে চন্দ্রঘোণাকে জেলার সদর দপ্তর ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালে রাঙ্গামাটিতে জেলার সদর দপ্তর স্থানান্তর করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করে। নতুন স্কুলে চাকমা ও বার্মিজ ভাষা পড়ানো বন্ধ হয় কারণ সম্ভ্রান্ত চাকমারা চাকমা ভাষা শেখার আগ্রহ দেখায়নি[৯১]। তার মানে মাতৃভাষার দাবির বিষয়টি একইসাথে শ্রেণীপ্রশ্নকেও হাজির করে। ১৯৮৭ সনে রাঙ্গামাটি থেকে জাকের উদ্যোগেই প্রথম 'দিকপাদা' নামে চাঙমা বর্ণমালা শেখার এক ত্রৈমাসিক সাময়িকী প্রকাশিত হয়[৯২]। ম্রো (২০০৯) জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের অনেকেরই নিজস্ব বর্ণমালা বা ব্যবহৃত লিপি রয়েছে। চাকমাদের নিজস্ব হরফে লেখা আঘরতারা, তাহ্লিক শাস্ত্র, গোঝেনলামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মারমারা আদিকাল থেকে অদ্যাবধি নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে আসছে। নিজস্ব বর্ণমালা দ্বারা লিখিত নাটক, কবিতা ও বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ গান বর্তমানে মারমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। ১৮৯৪ সালে লন্ডন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রি Lorain Ges Savidge রোমান হরফের মাধ্যমে লুসাই-বম ও পাংখোয়াদের ভাষা লেখার উপযোগিতা তৈরি করেন। ১৯৮৪ সনে ম্রো যুবক মেনলে ম্রো ম্রো বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। সাহিত্যচর্চা এবং ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্ণমালার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ণমালা ব্যবহার ও চর্চা না থাকলে সেই ভাষা কোনোদিন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছবে না বরং একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে রয়ে যাবে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য কোনোটাই প্রসার লাভ করবে না। মাতৃভাষা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিজেদের বর্ণমালায় সাহিত্য ইতিহাস রচনা করা। যদি নিজেদের বর্ণমালায় সাহিত্য ইতিহাস চর্চা না করা হয় তাহলে কোনোদিন মাতৃভাষা প্রসার লাভ করবে না বরঞ্চ ধীরে ধীরে একদিন নিজস্ব হরফ বিলুপ্ত হয়ে যাবে[৯৩]। সাহিত্যআন্দোলন ও এর ধারাবাহিক বিকাশ মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই হবে কি হবে না এই আলাপটি হয়তো আমরা পরে কোনো সময়ে বেশ জোরেসোরেই আনব কিন্তু এটি তো আর অস্বীকার করা যাবে না যে, চলতি কর্পোরেট অধিপতি দুনিয়ায় 'মাতৃভাষা' বলতে আদতেই আর কোনো কিছু বিরাজিত আছে কিনা। কারণ যেখানে বারবার মাতৃভাষার জমিন রক্তাক্ত ও নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষার দাবি কী ধরনের রণকৌশলের ভেতর দিয়ে এগোবে আজ এটিই জোরকায়দায় চূড়ান্ত করা জরুরি।

গেংখুলি, দিগ্নিবান্দি, ধামাইল, টেংলাগাহেন হোক জাতীয় সাহিত্যকুসুম

প্রুউয়াও ইবদেয়াবা ইনজাঅ
প্রুউয়াও ইবদেয়াবা ইনজাঅ
এনপা ওয়ান বা
লায়েন ঙুইয়ুম বা ইনজাঅ
প্রুউয়াও ইবদেয়াবা ইনজাঅ।

(সুখে ঘুমাও সোনামণি/সুখে ঘুমাও সোনামণি/তোমার বাবা নিয়ে আসবে/ জুমের পাকা চিনার ফল/ওহে সোনামণি/সুখে ঘুমাও সোনামণি[৯৪])

ম্রো ভাষায় ওয়াংনিম মানে বাংলাতে মেঘ। বান্দরবানের মং মং সিং-এর সম্পাদনায় এঞা ঊ ক্রে থেকে ওয়াংনিম নামে একটি ছোট কাগজ বের হয়। ওয়াংনিমের ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার ভূমিকাতে লেখা হয়েছে, সাহিত্যচর্চা হয় না বলে সাহিত্যমনা জন্ম নেয় না। একটি সুশীল সমাজ বিনির্মাণের আশায় এঞা উ ক্রে জন্ম নেয়। নবীন কলমে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম। পাঠক সমাজে বিপুল আগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাঁচটি সংখ্যার পর এটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে[৯৫]। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী অংশে লিখেছেন, আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চিরায়ত জ্ঞান, নৃত্য-গীত, সাহিত্য, জীবনের মূল্যবোধ পৃথিবীর জন্য অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশে হাজং, কোচ, বানাই, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, উঁরাও, মুণ্ডা, খাসিয়া, মণিপুরি, খুমি, খিয়াং, লুসাই, বম, ম্রো ও রাজবংশীসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন[৯৬]। যদি আমরা সকলেই আদিবাসী সাহিত্যের ওপর থেকে এবং সাহিত্যচর্চাকারীদের যাপিতজীবন থেকে রক্ত-বারুদ আর জলপাই বাহাদুরি সরাই তবেই ওয়াংনিম আর বন্ধ হবে না, চলবে আপন ভাষায় সাহিত্যবিকাশ। আর এই দুঃসহ অধিপতি গরাদ সরাতেও চাই গর্জে ওঠা আদিবাসী সাহিত্য, আদিবাসী সাহিত্যের রাজনৈতিক বিপ্লব। 'একটা চাকমা উপন্যাস চাই' নিবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এই ধারণাটিকেই বলতে চেয়েছেন। পাশাপাশি চাই আদিবাসী সাহিত্য-আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক-সাহিত্যিক ঐক্য। নিচের চিঠিটি পাঠ করলে আমরা হয়তো একটা পথ পেতে পারি। মানে হচ্ছে আমাদের যার যার জায়গা থেকে নিপীড়িত আদিবাসী এবং নিপীড়িত সাহিত্যের আপন বিকাশে সহযোগিতা ও কার্যকরী ঐক্য তৈরি করা, যা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *একটি চাকমা রূপকথা* রাষ্ট্রের পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত করে ঐক্য তৈরি করেছিলেন।

প্রিয় শান্তিময় বাবু

আপনার সংকলিত চাকমা রূপকথা 'টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ' আমার খুব ভালো লাগল। মৃত্তিকা বাবুর কাছে হয়তো শুনেছেন যে ১৯৯৪ সালে প্রচলনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড চতুর্থ শ্রেণীর যে বাংলা পাঠ্য বই প্রণয়ন করছে তার একজন লেখক ও সম্পাদক হিসেবে আমি কাজ করছি। কয়েক বছর আগে ওরা সব ক্লাশের পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে, যেখান থেকে এক চুল সরা খুব কঠিন কাজ। আর আমি ওদের কোনো কাজে জড়িত হলাম জীবনে এই প্রথম। তবু অনেক বলে চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইতে রূপকথা হিসেবে ওদের নির্ধারিত 'গালিভারের গল্প' বাদ দিয়ে একটি চাকমা রূপকথা সংযোজন করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করানো গেছে। আপনার ঐ গল্পটিকে আমি একটু সম্পাদনা করে এই বইতে অর্ন্তভুক্ত করতে চাই। তবে এই বইতে খুব প্রতিষ্ঠিত ও

খ্যাতিমান লেখক ছাড়া (যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী ও সুকুমার রায়) কোনো গদ্য রচনায় কারো নাম থাকবে না। গল্পটি সম্পাদনা করার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করার জন্যে কিছু অদলবদল করতে হবে।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ১৯ জুলাই ১৯৯২, ঢাকা[৯৭]

ঝিমিত ঝিমিত জুনি জ্বলে
মুড় দেজর দেবা তলে
ইয়ান আমার দেজ, ইয়ান তমার দেজ।
ইয়ান বেগর দেজ।
(দেওয়ান রঞ্জিত খেমটা তালে এই গানটির সুর করেছেন। যে পাহাড়ের আকাশ তলে/মিটিমিটি জোনাক জ্বলে/এটি আমার দেশ, এটি তোমার দেশ এটি সবার দেশ[৯৮])

মণ্ডল (২০০৯) জানিয়েছেন, ২০০৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যে ৬ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ক'জনা আবৃত্তি সংগঠন আয়োজন করে বাংলাদেশের প্রথম শুধু আদিবাসী ভাষার কবিতা নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠান। চাকমা ভাষার শব্দ ম' আওঝর অরক বা 'আমার প্রাণের বর্ণমালা' নামের এই আয়োজনে চাকমা, মান্দি, সান্তাল, হাজং, মারমা, চাক, ওঁরাও, তঞ্চগ্যা, ত্রিপুরা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মৈতৈ মণিপুরি, ম্রো, মালো ও কোচ ভাষার কবিতা আবৃত্তি করা হয়। চাকমা ভাষার কবি শিশির চাকমা, ফিরিং চান, রিপরিপ চাকমা, কবিতা চাকমা; মান্দি ভাষার কবি লুইস বাবুল ম্রং ও বচন নকরেক; সান্তাল ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ সরেন; হাজং ভাষার কবি হাজং আশুতোষ রায়; মারমা ভাষার কবি হ্লা থোয়াইচিং মারমা; চাক ভাষার কবি অংখ্যইং চাক; ওঁরাও ভাসার কবি নবদ্বীপ কুমার লাকড়া; তঞ্চংগ্যা ভাষার কবি রতিকান্ত তঞ্চংগ্যা; ত্রিপুরা ভাষার কবি প্রভাংশু ত্রিপুরা; বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার কবি শুভাশিস সিনহা; মৈতৈ মণিপুরি ভাষার কবি একে শেরাম; ম্রো ভাষার কবি সিংইয়ং ম্রো; মালো ভাষার কবি সৃজল তিগ্যা এবং কোচ ভাষার কবি নিকোলাস নরেন্দ্র কোচের কবিতা নিজ নিজ ভাষায় এবং বাংলা অনুবাদে আবৃত্তি করা হয়[৯৯]। আদিবাসীদের সাহিত্য-আন্দোলনের সাথে ঐক্য তৈরীতে এ ধরনের উদ্যোগও গুরুত্ব তৈরি করে। কিন্তু রউফের (২০০৪) মতো অনেকে মনে করেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপজাতি একাডেমি, যেমন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সিটিটিউট, আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমি ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে আদিবাসীদের চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণা, মৌলিক চাহিদা প্রভৃতির বিকাশ ঘটানো এবং তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মীয় রীতিনীতি চর্চার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে[১০০]। আদিবাসীদের ভেতরে অনেকে তা মনে করেন না, অনেকেই রাষ্ট্রীয় এইসব লোকদেখানো দরদকে বলপ্রয়োগ এবং অপর হিসেবে পাঠ করেন। তবে আদিবাসীদের ভেতরেও অনেকেই নিজস্ব জাতিগত বিষয়েও তেমন মনোযোগী হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মনে করেন। বাঙালি ও অধিপতি

রাষ্ট্রের মনন এবং যে পাঠের অনিবার্যতা তৈরি করে অনেকেই তা প্রশ্ন করেন না এবং ক্ষমতার চোখ দিয়েই নিপীড়িত আদিবাসী সমাজকে পাঠ করতে চান, যা, তাদের সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়ে উঠে। যেমন, সুগত চাকমা আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে একটি বই লিখেছেন, যেখানে অধিপতি বাঙালিদের চোখেই তিনি আদিবাসী জীবন পাঠ করেছেন এবং সংস্কৃতি ও জীবন থেকে সাহিত্যকে বাদ রেখে আলোচনা চালিয়ে গেছেন। যদিও বইটি 'প্রথম আলো'র নির্বাচিত দশটি মননশীল বইয়ের ভেতর স্থান পায় (১১ মে ২০০১, দৈনিক প্রথম আলো) কিন্তু বইটিতে আদিবাসীদের সাহিত্য-বিষয়ে কোনো আলোচনা জায়গা পায়নি[১০১]। উচিমং মারমা যেমন বলেছেন, আদিবাসী সাহিত্যের বিকাশ হলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী উভয়ের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার খুলে যাবে। এ বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন আদিবাসী ও বাঙালি লেখকদের আত্মনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন[১০২]। ত্রিপুরা (২০০১) সাহিত্যের ভেতর দিয়ে ভাষা এবং জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা টেনে বলেন, একটি জাতিকে ঐতিহাসিক জাতি রূপে উত্তরণের পূর্বশর্ত হল তার সাংস্কৃতিক উন্মেষ। এই সাংস্কৃতিক উন্মেষের প্রধান মাধ্যম হল তার ভাষা। তাই একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন তার ভাষা এবং সাহিত্যের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন[১০৩]। পালিতের মতো (২০০৫) আমারও বিশ্বাস, এ দেশের আদিম আধিবাসীরা–হড়, হো (কোল) নামক জাতি, এরাই এদেশের আদিব মানব; তারাই তাদের দেশকে বলত 'বাংলো'। এদেশটা জলবহুল দেশ, জলাভূমি যথেষ্ট, ছেঁচে জল ক্ষেত্রে দিতে হত না। বাং মানে না, আর লো মানে পাত্র ডুবিয়ে জল তোলা। তা থেকে জল ছেঁচাও বোঝায়। যে দেশে ছেঁচে জল দিতে হয় না, জল ছেঁচার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ ধান্যক্ষেত্রে জলের অভাব হয় না সেই দেশই 'বাংলোদিশম'। ইহাই তাদের জন্মভূমি (আয়ু-দিশম)। আর্য বৈদিকেরা এদেশের নাম করেন নাই[১০৪]। পালিতের যুক্তি এবং দেখাবার প্রক্রিয়াকে মেনে নেওয়াটা অধিপতি ব্যবস্থার জন্য এক জটিলতম কাজ। কারণ কথিত মূলধারার সাহিত্য কেবলমাত্র ক্ষমতা এবং চলতি সময়ে কর্পোরেট বাজারেরই মতাদর্শ তৈরি করে এবং বহন ও ফেরি করে চলে। কিন্তু নিম্নবর্গের সাহিত্য চলমান দুনিয়ার মহাবয়ানকে আপন লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে সমুন্নত রাখে। আর ঠিক এখানটাতেই আমরা বাংলাদেশের নিপীড়িত জাতির নিপীড়িত সাহিত্যকে পাঠ করতে জানতে বুঝতে আগ্রহী। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কুসুম ভ্রুণ এখানেই বিরাজিত আছে। জরুরি হবে তারে সকল নিপীড়নের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করা আর এজন্য জরুরি নিপীড়িত সাহিত্যের গণবিপ্লব। দেশের নিপীড়িত আদিবাসী সমাজে যার হদিশ ও ইশারা রয়ে গেছে, আশা করি নয়াপ্রজন্ম সেইসব ইশারা ও ডাক বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পারার মতো সাহসী হবে।

জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই!
যিয়ান পরানে কয় সিনে গরিবে-
বযত্তান বানেবে বিরানভূমি
ঝাড়ান বানেবে মরুভূমি,
গাভুর বেলরে সাঝ
সরয মিলেরে ভাচ ।

জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই!
যিয়ান পরানে কয় সিয়ান গরিবে-
জন্মভূমত মানুচ বন্দী
মিলেরে কিন্যে দাসী বান্দী,
পহররে কানা
সুষ্টির বানা ।

অবহেলা অপমানে ক্রোধ
ভিদির তুবোল লোর স্রোত
পাথর খুনি খুনি ভাঙে বিঘ্ন,
চেতনার সাগরত রণ তীক্ষ্ণ ।

-মর পরিপূরক গাই মুই-ই
জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই!

(রুখে দাঁড়াবো না কেন!/ যা ইচ্ছে তাই করবে-/বসত বিরানভূমি/নিবিড় অরণ্য মরুভূমি,/সকালকে সন্ধ্যা/ফলবতীকে বন্ধ্যা ।/রুখে দাঁড়াবো না কেন!/যা ইচ্ছে তাই করবে-/জন্মভূমে পরবাসী/ নারীকে ক্রীতদাসী,/দৃষ্টিকে অন্ধ/সৃষ্টিকে বন্ধ!/অবহেলা অপমানে ক্রোধ/ধমনীতে তুমুল রক্তের স্রোত/আঘাতে আঘাতে ভাঙে বিঘ্ন,/চেতনার সমুদ্রে তারুণ্যে তীক্ষ্ণ ।/-আমার সম্পূরক একমাত্র আমিই/রুখে দাঁড়াবো না কেন!)
সূত্র: জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই : কবিতা চাকমা, জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯২)

টিকা

১. চাক, অং খ্যাইন। ১৯৯৮। চাক উপজাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি, বিজু-সাংগ্রাই-বৈসু ১৯৯৮ উপলক্ষে মং নু চিং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত রাকাহ্ নামক স্মরণিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান, পৃ. ৭

২. Mohsin, Amena. 2002 (2nd ed), The politics of nationalism : the case of the Chittagong hill tracts Bangladesh, The University press limited, Dhaka, p.1

৩. সূত্র : evtmtgyt-৩১১২ জি-০৯/১০ (কম/জি), ১,১০০ কপি, ২০০৯

৪. দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১০-১১

৫. লনচেও, এস। ২০০৪। বম ছড়া (সংগ্রহ), পাহাড়ের ছড়া ও লোককথা নিয়ে টংগ্যা প্রকাশিত 'মিলিং' নামক পুস্তক থেকে এই ছড়াটি নেয়া হয়েছে, রাজবাড়ি সড়ক, রাঙ্গামাটি, পৃ. ১৯

৬. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ। ২০০৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ)। বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক প্রভাব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ভারত, পৃ. ১১৬

৭. দীপংকর ঘোষের সংকলন ও সম্পাদনায় ভারতের প্রাক-স্বীনতাপর্বে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব ও আদিবাসীচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা' নামক পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, ভূমিকা অংশ

৮. ত্রিপুরা, প্রশান্ত। ১৯৯৯। ইতিহাসের মুখোমুখি : নৃবিজ্ঞানের উত্তর-ঔপনিবেশিক সংকট, প্রশান্ত ত্রিপুরার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নৃবিজ্ঞান পত্রিকা : সংখ্যা ৪' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, পৃ. ১৯

৯. মারমা, উচিমং। আদিবাসী সাহিত্য : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রঁ-দে-ভূ প্রকাশনা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও উচিমং মারমা কর্তৃক সম্পাদিত রঁ-দে-ভূ নামক একটি ছোট কাগজ থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। সন উল্লেখ নেই। পৃ. ৪৮-৫১

১০. যাফর, পূরবী। ১৪১২ বাঙলা। আদিবাসী কাব্যের পটভূমি, পূরবী যাফর সম্পাদিত আদিবাসী কাব্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা 'সেরমা সেতঙ' এর শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, পূর্বাপর সাহিত্য পাঠ অনুশীলন ও

আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত ১৯ মার্চ ২০০৪ তারিখে 'প্রথম আদিবাসী কাব্য উৎসবে' এটি পাঠ করা

হয়েছিল। আদিবাসী কাব্য শিল্পনিকেতন (আকাশিনি), রাজশাহী, পৃ. ৯-২৩
১১. নেওয়ার, মা সিং। ২০০২। আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস : পার্বত্য উপজাতীয়দের ভাষা-সংস্কৃতির সন্ধানে, এস এ প্রুর সম্পাদনায় 'পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি' নামক পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। এটি ১৯৯৯-২০০১ পর্যন্ত ভাষা বিষয়ক সেমিনারের একটি সংকলন, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান, পৃ. ১০২
১২. রান্যাফুল : চাঙমা শ্রেষ্ঠ কবিতা, বইটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন হেমল দেওয়ান, শরঃজ্যোতি চাক্‌মা, হিরণ মিত্র চাক্‌মা, পল্লব চাকমা। বইটি প্রকাশ করেছেন মণি স্বপন দেওয়ান, ঢাকা, ২০০৬
১৩. রহমান, মিজানুর। ২০০৭। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভুবন, ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি' নামক পুস্তক থেকে এটি নেয়া হয়েছে। শেড, ঢাকা, পৃ. ১৮-১৯
১৪. চাকমা, সুগম। ২০০৩, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মাতৃভাষা, বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু ২০০৩ উপলক্ষে রনেল চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আমাঙ' শীর্ষক সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে। আমাঙ 'শিল্প জীবনের জন্য'এই জায়গাটিকে সামনে রেখেই সংকলনটির কাজ করেছে। জুম ঈসথেটিকস কান্সিউল (জাক), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, পৃ. ১২০
১৫. খান, হাফিজ রশিদ। ২০০৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য। মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল সম্পাদিত 'জুম পাহাড়ের জীবন' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১৮৬-১৯৩
১৬. ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল। ১৯৯৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, পৃ. ৪৭-৪৯
১৭. দেওয়ান, মনি স্বপন। ২০০৩। বাণী, চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি (বইটির ভূমিকায় বাণী অংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর ভাষ্য, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেই এটির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে)।
১৮. পরমেশ্বর। ২০০৫। নং-হাং ন-হাং বুদ্‌অ-মা, দীপায়ন খীসা সম্পাদিত মাওরুম পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যা থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে, হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম, ঢাকা, পৃ. ৩৫-৩৬
১৯. চাকমা, সুগত (ননাধন)। ২০০১। বিংশ শতকের সপ্ত দশকে আমার লিখিত তিনটি চাকমা গান ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) কর্তৃক প্রকাশিত 'শিঙোর' সংকলন হতে এটি নেয়া হয়েছে, ছড়াথুম পাবলিশার্স, বনরূপা, রাঙ্গামাটি, পৃ. ২১-২৬
২০. খান, হাফিজ রশিদ। ২০০৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য। মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল

সম্পাদিত 'জুম পাহাড়ের জীবন' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১৮৬-১৯৩
২১. চাকমা, সুহৃদ। ১৯৮২। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার চাক্‌মা কবিতা : ভাব ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ, লেখাটি দীপেন দেওয়ান ও কৃষ্ণ চাকমা সম্পাদিত ইরুক পত্রিকার ১৩৮৯ সনের বিজু সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে, রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি, পৃ. ১৬
২২. চাকমা, মঙ্গল কুমার ও চাকমা, শিশির। ১৯৮৪। জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল : কিছু কথা, লেখাটি হরিকিশোর চাকমা সম্পাদিত সাঙেত নামের এক বিশেষ সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চট্টগ্রাম, পৃ.১৪
২৩. চাকমা, সুগত (ননাধন) ও চাকমা, সুসময়। ১৯৮০। রাধামন ধনপুদি (১ম খণ্ড), মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, রাঙ্গামাটি
২৪. চাকমা, চিরজ্যোতি (সম্পাদনা)। ১৯৮১। রাধামন-ধনপুদি (২য় খণ্ড), রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি
২৫. চাকমা, মৃত্তিকা। ১৯৮১। ইরুক (তিনমাস্যা কবিতা সংখ্যা), পথম বঝর পথম সংখ্যা, ইরুক প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি
২৬. খীসা, ডা. ভগদত্ত। ২০০৬। চাকমা গান, রামবাদু ত্রিপুরা স্টিভ, বাতায়ন চাকমা, উর্মী খীসা, ক্যসিংমং মারমা ও সুইজার চাকমার সম্পাদনায় জুম পত্রিকার বৈসুক-সাংগ্রাই-বিজু-বিষু সংকলন ২০০৬ থেকে এটি নেয়া হয়েছে, জুম লিটারেচার ইয়াং সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৬
২৭. দেববর্মন, সুরেন (সম্পাদনা)। ২০০৪। ত্রিপুরার উপজাতীয় আদিধর্ম, নৃত্যকলা ও দেবদেবী, জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত, সম্পাদকীয় অংশ
২৮. ত্রিপুরা, প্রভাংশু। ২০০২। ত্রিপুরা ভাষা ও সাহিত্য পরিক্রমা, শুভাশীষ চাকমা সম্পাদিত 'বৈ-সা-বি স্মরণিকা তারুম হতে লেখাটি নেয়া হয়েছে, রেগা ফাউন্ডেশন, খাগড়াছড়ি, পৃ. ১০-১৫
২৯. ত্রিপুরা, মথুরা। ২০০১। ত্রিপুরা : বাংলা সাহিত্যের উর্বরভূমি, নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনজাতি : ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' নামক পুস্তক থেকে এটি নেয়া হয়েছে, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, চট্টগ্রাম, পৃ.৩৬-৪৬
৩০. তঞ্চঙ্গ্যা, জয়সেন। ২০০৩। প্রকৃতি ও তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে বিষু, পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা সম্পাদিত বিষু ১৪১০ উপলক্ষে প্রকাশিত 'পহর জাঙাল' নামক স্মরণিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, পহর জাঙাল প্রকাশনা পর্যদ, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৬-৩৭
৩১. তঞ্চঙ্গ্যা, কর্মধন। ২০০৩। তঞ্চঙ্গ্যাদের রাষ্ট্রভাষা চর্চা ও একটি প্রস্তাবনা, পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা সম্পাদিত বিষু ১৪১০ উপলক্ষে প্রকাশিত 'পহর জাঙাল' নামক স্মরণিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, পহর জাঙাল প্রকাশনা পর্যদ, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৭

৩২. হ্লা, উ চা । ১৯৯৩ । অংম্রাংবাজি (জয় হোক), পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ওয়াগ্যোয়াই (আশ্বিনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে এস.এ প্রুর সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মরণিকা 'ওয়াগ্যোয়াই' থেকে এটি নেয়া হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান, পৃ. ১-২
৩৩. খান, হাফিজ রশিদ । ২০০৮ । পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য । মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল সম্পাদিত 'জুম পাহাড়ের জীবন' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১৮৬-১৯৩
৩৪. ঞ্যোহলামং । ২০০৩, আমার কিছু কথা, বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু ২০০৩ উপলক্ষে রনেল চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আমাঙ' শীর্ষক সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে। আমাঙ 'শিল্প জীবনের জন্য' এই জায়গাটিকে সামনে রেখেই সংকলনটির কাজ করেছে। জুম ঈসথেটিকস কান্সিউল (জাক), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা,পৃ. ১০৭-১০৮
৩৫. ফরিদ, শাওন । ২০০৬ । পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য, হিলি সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এইচ.এস.ডি.ও), রাঙ্গামাটি, পৃ. ১১৫-১৭৪
৩৬. পূর্বোক্ত । পৃ. ১২১-১২২
৩৭. চাকমা, মৃত্তিকা । ২০০৮ । পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নাটক ও কিছু কথা । মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল সম্পাদিত 'জুম পাহাড়ের জীবন' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ২৩৮-২৫৫
৩৮. চাকমা, সুগম । ২০০৩, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মাতৃভাষা, বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু ২০০৩ উপলক্ষে রনেল চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আমাঙ' শীর্ষক সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে। আমাঙ 'শিল্প জীবনের জন্য' এই জায়গাটিকে সামনে রেখেই সংকলনটির কাজ করেছে। জুম ঈসথেটিকস কান্সিউল (জাক), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা,পৃ. ১২০
৩৯. সাত্তার, আবদুস । ১৯৭৫ । আরণ্য জনপদে, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা
৪০. তালুকদার, জাকির । ২০০৬, ফাগগু চান্দো হিওরে লাদনা, ড. আতিউর রহমান সম্পাদিত 'প্রান্তস্বর : ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, সমুন্নয়, ঢাকা, পৃ. ১১
৪১. সিকদার, সুকুমার ও কিস্কু, সারদা প্রসাদ (অনুবাদ ও সম্পাদনা) । ২০০৫ । খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি (সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ), নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ভারত, পৃ. ৯ (ভূমিকা অংশ)
৪২. দত্ত, লোকনাথ । ১৯৯৮, সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা, (এটি সম্পাদনা করেছেন অরুণ চৌধুরী) লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত

৪৩. সিকদার, সুকুমার ও কিস্কু, সারদা প্রসাদ (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। ২০০৫। খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি (সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ), নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ভারত, পৃ. ৮৭-৮৮
৪৪. সরেন, রবীন্দ্রনাথ। ২০০৮। বরেন্দ্র ভূমিতেই জন্ম নিয়েছি আমি চুনু মাঝি, দেবাশিষ প্রামাণিক দেবু সম্পাদিত ও প্রকাশিত আদিবাসীদের অধিকারভিত্তিক মাসিক বুলেটিন 'আস্থা : সংখ্যা ১২' থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে, রাজশাহী, পৃ. ৩
৪৫. বিশ্বাস, অশোক। ২০০৫, বাংলাদেশের রাজবংশী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৫-৯৬
৪৬. জলিল, ড. মহম্মদ আবদুল। ১৯৯৯, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৮৮
৪৭. টপ্য, বৈদ্যনাথ। ২০০৪। আদিবাসী (উঁরাও) ভাষা ডিকশনারি ও কিছু তথ্য, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮
৪৮. এক্কা, স্বপন। ২০০৪। সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা : ওঁরাও। সুবাস কুজুরের সম্পাদনায় বড়দিন নববর্ষ ও বিগত কারাম উৎসব ২০০৪ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'পূণা বিলী : ১০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ওঁরাও ছাত্র সংগঠন, ঢাকা, পৃ.২৭
৪৯. অং, মংবা। ২০০৩, বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা, প্রকাশক লেখক নিজেই, কক্সবাজার, পৃ. ৪৬-৪৮
৫০. প্রু, ক্য শৈ। ১৯৯৮। মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, উ চ নু সম্পাদিত সাংগু পত্রিকা (বর্ষ ৬ সংখ্যা ১) থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান, পৃ.৮৫
৫১. সাংমা, সৃজন। ১৯৯৯ (সংখ্যা-১৫), রে রে, সৃজন সাংমা সম্পাদিত 'উপজাতীয় গবেষণা সাময়িকী' জানিরা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ.৪৩-৪৪
৫২. Daring, Kohima. 1999. Mandi Di.sarangna golpo (stories for Garo children), The University Press Ltd, Dhaka
৫৩. চিরান, জেমস জর্নেশ (সংগ্রহ)। ১৯৮৪। আজিয়া, বিভা সাংমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উপজাতীয় গবেষণা
সাহিত্য সাময়িকী' জানিরা : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ.১৩৭
৫৪. রায়, অভিজিৎ; আলী, মো. এরশাদ ও সেন, সুকান্ত। ২০০৯, বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ১৩০-১৩৩
৫৫. রায়, অভিজিৎ; আলী, মো. এরশাদ ও সেন, সুকান্ত। ২০০৯, বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ১৩০-
১৩৩। ডালুদের একটি গীতালু গান

৫৬. আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান। ২০০৯। হাজংদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাবু রহমান ও প্রতিভা রেমা সম্পাদিত 'হাজং সমাজ ও সংস্কৃতি' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ১৭২-১৭৪
৫৭. হাজং, সোহেল। ২০০৯। হাজংদের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য, কথা (নৃ-তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি মুখপত্র), সম্পাদক : প্রমোদ সিংহ, ২০০৯, কথে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা, পৃ. ৪২
৫৮. রায়, হাজং যশোদা। ১৯৯৭। কুমায় হারালে, সৃজন সাংমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উপজাতীয় গবেষণা সাহিত্য সাময়িকী' জানিরা : জুন ১৯৯৭, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ ৬১
৫৯. আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান। ২০০৫, বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়, সূচীপত্র, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৯৩
৬০. সরকার, হাজং ভূপতিভূষণ। ২০০৫, হে দুর্ভাগা জাতি, ইলিমেন্ট হাজংয়ের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা দুহারের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে। পৃ. ১০
৬১. চাকমা, শুভাশীষ (সম্পাদিত)। ২০০২, তারুম, 'বৈ-সা-বি স্মরণিকা', রেগা ফাউন্ডেশন, খাগড়াছড়ি, পৃ.৫২
৬২. রায়, শ্রী হাজং নিখিল। ১৯৮৬। জোনাকীর আলো, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা
৬৩. লামিন, সিলভানুস। ২০০৯, বিপন্ন খাসি সমাজ, বিপন্ন খাসি সংস্কৃতি-ভাষা। সজল স্বার্তির সম্পাদনায় হকতই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন 'হকতই' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, খাসিয়া সেবা সংঘ, জৈন্তাপুর, সিলেট, পৃ. ৪২-৪৩
৬৪. সিকদার, সৌরভ। ২০০৮। বাংলাদেশের খাসি ভাষা ও সংস্কৃতি, সিলভানুস লামিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জিংশাই' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, এটি খাসি স্টুডেন্টস সোসাইটির বাৎসরিক মুখপত্র। ঢাকা, পৃ, ২৪
৬৫. আহসান, মুহাম্মদ সাজ্জাদ। ১৯৯৭। খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পূর্বাপর প্রেক্ষিত শীর্ষক গবেষণাকর্ম, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, কলা ও মানবিকী অনুষদের প্রকল্প ১৯৯৬-৯৭ হিসেবে প্রস্তুতকৃত, অপ্রকাশিত, পৃ. ২৯-৩০
৬৬. কবিতাটি শুভাশিস সিনহার 'নয়া করে চিনুরি মেয়েক' মানে অক্ষর নতুন করে চিনি বই থেকে নেয়া হয়েছে। বইটিতে কবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই কবিতাগুলো লিখেছেন। ভাষাচিত্র, ঢাকা থেকে ২০০৯ সনে এটি প্রকাশিত হয়েছে। পৃ. ১১
৬৭. শেরাম, এ.কে। ২০০৮। আমাকে আমার ভাষায় কথা বলতে দাও, মো. আবদুল খালেকের সম্পাদনায় প্রত্যয় নামের একটি অনিয়মিত ছোট কাগজ থেকে এটি নেয়া হয়েছে। শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, পৃ. ৭

৬৮. সাত্তার, আবদুস । ১৯৭৫ । আরণ্য জনপদে, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, পৃ. ৩০৮-৩০৭
৬৯. আহসান, মুহাম্মদ সাজ্জাদ । ১৯৯৮ । বাংলাদেশের মণিপুরি নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, কলা ও মানবিকী অনুষদের প্রকল্প ১৯৯৭-৯৮ হিসেবে প্রস্তুতকৃত, অপ্রকাশিত, পৃ. ৫৮-৬২
৭০. মিয়া, মুহাম্মদ মাহফুজ । ২০০৫ । মণিপুরি সম্প্রদায়ের জীবন ব্যবস্থা (একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের গবেষণা সমীক্ষা হিসেবে প্রস্তুতকৃত, অপ্রকাশিত, পৃ. ৩৪-৩৬
৭১. দাস, মিলন । ২০০২, আদিবাসী মুণ্ডাদের জীবন বৈচিত্র্য, পরিত্রাণ, তালা, সাতক্ষীরা, পৃ. ১১ । দাস (২০০২), দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুণ্ডাদের নিয়ে লেখা এক ছোট পুস্তিকায় মুণ্ডাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অংশে গোকুল চন্দ্র মুণ্ডার গাওয়া একটি লোকগানের কথা উল্লেখ করেছেন ।
৭২. চাকমা, জড়িতা । ২০০৫ । জাগো জুম্ম নারী, কল্পনা চাকমা স্মরণে ইথিকা চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা 'কল্পনা স্মরণে' থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙামাটি, পৃ. ২৭
৭৩. আকনজি, ডা. মো: জহিরুল ইসলাম । ১৯৯১ । উপজাতীয় সাহিত্য প্রকাশনা প্রসঙ্গে, মো. শাহ আলমের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উপজাতীয় গবেষণা সাহিত্য সাময়িকী' জানিরা : ১০ সংখ্যা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ. ৮০
৭৪. সাংমা, সৃজন । ১৯৯৪ । জানিরা : জুন ১৯৯৪, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, ভূমিকা অংশ
৭৫. কথা (নৃ-তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি মুখপত্র), সম্পাদক : প্রমোদ সিংহ, ২০০৯, কথে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা
৭৬. দেওয়ান, তনয় । ২০০৩ । দুটি কবিতা, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথপ্রকাশনা 'জাগরণ' থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে, এটি সম্পাদনা করেছেন অরুমিতা চাকমা ও সিংকো চাকমা, রাঙামাটি, পৃ.২৭
৭৭. চাকমা, শুভাশীষ (সম্পাদিত) । ২০০২, তারুম, 'বৈ-সা-বি স্মরণিকা', রেগা ফাউন্ডেশন, খাগড়াছড়ি
৭৮. খীসা, দীপায়ন । ২০০৯ । নাগরিক না হওয়ার যাতনা, হিরন মিত্র চাকমা সম্পাদিত জুম পত্রিকা থেকে এই লেখাটি নেয়া হয়েছে, জুম লিটারেচার ইয়াং সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১০৮-১০৯

৭৯. চিরান, লিপা এ। ২০০৭, ব্যথিত প্রাণ, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠনের বাৎসরিক মুখপত্র চিরিংয়ের ২০০৭ সংখ্যা থেকে কবিতাটি নেয়া হয়েছে, এটি সম্পাদনা করেছেন পিন্টু হাউই, বাগাছাস, ঢাকা, পৃ. ৩৫।
৮০. চাকমা, মুক্তা। ২০০৭। 'রান্যাফুল' : চাকমা কাব্য সাহিত্যের দৃপ্ত উচ্চারণ, দীপায়ন খীসা ও পলব চাকমার সম্পাদনা সমন্বয়ে সাংগ্রাই-বিষু-বৈসুক-বিজু-বিহু উপলক্ষে মাওরুম ও জুম পত্রিকার যৌথ প্রকাশনা 'মাওরুম ও জুম যৌথতায়' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, সৌম্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.১০৬-১০৭
৮১. সিনহা, শুভাসিস। ২০০৯। অক্ষর নতুন করে চিনি : নুয়া করে চিনুরি মেয়েক, ভাষাচিত্র (টিমওয়ার্ক সহযোগী প্রকাশনা), ঢাকা, পৃ. ৫
৮২. রাকসাম, মিঠুন। ২০০৭, মান্দি মেয়ে, মন্ত্রধ্বনি পুস্তক থেকে নেয়া, শালুক, ঢাকা, পৃ. ৪৪
৮৩. আজম, মোহাম্মদ। ২০০৭। প্রমিত বাংলায় মান্দি-বসতির বিত্তান্ত, দীপায়ন খীসা ও পলব চাকমার সম্পাদনা সমন্বয়ে সাংগ্রাই-বিষু-বৈসুক-বিজু-বিহু উপলক্ষে মাওরুম ও জুম পত্রিকার যৌথ প্রকাশনা 'মাওরুম ও জুম যৌথতায়' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, সৌম্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯৭
৮৪. মানখিন, মতেন্দ্র। ২০০৭, সাংসারেক গারো ছিলাম (কবিতাটিতে তিনি কবি রফিক আজাদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন), মিঠুন রাখসামের সম্পাদনায় 'ওয়ান্না উদযাপন কমিটি ২০০৭' ঢাকা থেকে এই সংকলন প্রকাশিত হয়। ঢাকা, পৃ. ৩৮
৮৫. পতাম, রুশ। ২০০৫, খাসিয়া জনগোষ্ঠী : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সিলবানুস লামিন কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, পৃ.১৫৯-১৬৪
৮৬. রায়, রাজা দেবাশীষ। ২০০৭। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার ও বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান, ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি' নামক পুস্তক থেকে এটি নেয়া হয়েছে। শেড, ঢাকা, পৃ. ১-৫
৮৭. রহমান, মিজানুর। ২০০৭। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভুবন, ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি' নামক পুস্তক থেকে এটি নেয়া হয়েছে। শেড, ঢাকা, পৃ. ১৮-১৯
৮৮. চাকমা, মঙ্গল কুমার (সম্পাদিত)। ২০০২। আমানি কক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০২ উপলক্ষে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। পৃ.৪২-৫০
৮৯. খান, হাফিজ রশিদ। ২০০৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য। মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল সম্পাদিত 'জুম পাহাড়ের জীবন' পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১৮৬-১৯৩

৯০. তালুকদার, সুপ্রিয়। ২০০০ (৪র্থ সংস্করণ), চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ, বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান ও সুগত চাকমা রচিত বইয়ের ভূমিকা অংশ থেকে লেখাটুকু নেয়া হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গমাটি, ভূমিকা অংশ
৯১. চাকমা, শরদিন্দু শেখর। ২০০৬। আমার বাল্য স্মৃতি, লেখকের 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মেলা উৎসব এবং অন্যান্য প্রবন্ধ' নামক পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪০-৪১
৯২. চাকমা, মঙ্গল কুমার (সম্পাদনা)। ১৯৮৭। দিকপাদা : চাকমা বর্ণমালা শিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাময়িকী, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি
৯৩. ম্রো, সিংইয়ং। ২০০৯। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও দ্বিতীয় ভাষা চর্চা, পৃ.১০০
৯৪. একটি ম্রো ঙকলাই (ম্রোদের ঘুমপাড়ানি ছড়া), এটি সংগ্রহ করেছেন চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া। ২০০৫। হাফিজ রশিদ খান ও চৌধুরী বাবুল বড়ুয়ার যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম সমন্বয়বাদী লিটল ম্যাগাজিন' সমুজ্জ্বল সুবাতাস থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, চট্টগ্রাম, পৃ. ৭২
৯৫. সিং, মং মং। অক্টোবর ২০০৩, ওয়াংনিম, বান্দরবান
৯৬. দ্রং, সঞ্জীব (সম্পাদিত)। ২০০৯। সংহতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের বিশেষ প্রকাশনা। বাণী অংশ
৯৭. চাকমা, শান্তিময়। ২০০৪, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং কিছুকথা, রনেল চাঙমা সম্পাদিত ২০০৪ এর বিঝু-সাংগ্রাই-বৈসুক সংকলন 'কাওয়াং' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি, পৃ.৪৩-৪৬
৯৮. চাকমা, দেবজ্যোতি। ১৯৮৩। বিধি পিটার দাংগের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উপজাতীয় গবেষণা সাহিত্য সাময়িকী' জানিরা : ৫ম সংখ্যা, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ ৬৯-৭০
৯৯. মণ্ডল, নিমাই। ২০০৯। বাংলাদেশের আদিবাসী কবিতা আবৃত্তির ইতিহাস, পৃ.৪২
১০০. রউফ, জাহান আরা। ২০০৪, বাংলাদেশের আদিবাসী, হোপ মাল্টিমিডিয়া, ঢাকা, পৃ. ১৭
১০১. চাকমা, সুগত। ২০০২। বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
১০২. মারমা, উচিমং। আদিবাসী সাহিত্য : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রঁ-দে-ভূ প্রকাশরা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও উচিমং মারমা কর্তৃক সম্পাদিত রঁ-দে-ভূ নামক একটি ছোট কাগজ থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। সন উল্লেখ নেই। পৃ. ৪৮-৫১
১০৩. ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল। ২০০১। ত্রিপুরা ভাষা ও সাহিত্য, নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনজাতি : ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' নামক পুস্তক থেকে এটি নেয়া হয়েছে, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, চট্টগ্রাম, পৃ.৩৪

১০৪. পালিত, শ্রী হরিদাস। ২০০৫ (এই লেখাটি কায়স্থ সমাজ পত্রিকায় ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল)। বাংলার আদিম জাতি ও সভ্যতা, দীপংকর ঘোষের সংকলন ও সম্পাদনায় ভারতের প্রাক-স্বাধীনতাপর্বে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব ও আদিবাসীচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা' নামক পুস্তক থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, পৃ. ৫৪-৫৫

[লেখক: গবেষক।]

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে 'আদিবাসী' অধিকার: বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিকতা

সাইফুল্লাহ মেহেদী

গল্প-উপন্যাস নিছক বিনোদনের খোরাক নয় তা সমাজচিন্তা, ইতিহাসের সাক্ষী। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার পাশাপাশি তুলে ধরা সম্ভব অতীত ইতিহাস এমনকি ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা। 'আদিবাসী'[১] নিয়ে বাংলাদেশী লেখালেখি পড়লে একধরনের নিস্পৃহ, অনড়, পরিবর্তনহীনতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এর মানে এই নয় যে 'আদিবাসী' জীবনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। কালের বিবর্তনে এবং বহিঃশক্তির (এখানে বহিঃশক্তি বহিঃদেশ নয়) অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, জীবনমান এসবের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তা যেমন হয়েছে সেটেলারদের মাধ্যমে তেমনটি হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নীতিগত ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমেও।

লক্ষণীয় বিষয় হল আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিশেষত জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিয়ে, সমাজ-ব্যবস্থা বিশেষত মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, উৎসব বিশেষত নাচ, গান-এর বিষয়গুলো গবেষণাকার্যে যতটা উদ্‌যাপন করি তাদের জীবনবাস্তবতার বিষয়টি গবেষণাকার্যে কিংবা লেখালেখিতে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাই কিংবা এড়িয়ে যেতে চাই। একজন গবেষক হিসেবে কিংবা একজন লেখক হিসেবে সামাজিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক

গবেষণাকাজ কিংবা গবেষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করা উচিত কিনা কিংবা লেখালেখিতে রাজনৈতিক অবস্থান (প্রচলিত ক্ষমতার রাজনীতি নয় বরং গণমানুষের কল্যাণের জন্য তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে) নেয়া উচিত কিনা– এক্ষেত্রে সাহসী অবস্থান হওয়া উচিত ।

গণমানুষের অধিকার আদায়ে বিশেষত আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে মহাশ্বেতা দেবী এক অনবদ্য নাম । তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই অধিকার আদায়ের, লড়াই সংগ্রামের বিষয়টিকে তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন । তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে আধুনিক সমাজের অসঙ্গতির চিত্র তেমনি রয়েছে 'অনগ্রসর' সমাজের টিকে থাকার লড়াই, যা বাংলাদেশী অধিকাংশ লেখনীতে খুঁজে পাওয়া যায় না ।

মহাশ্বেতার উপন্যাস পড়ে তাঁকে আমার অ-রাজনৈতিক মনে হয়নি । যদিও তিনি নিজেকে অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন । অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর এবং হরিরাম মাহাতো– এ তিনটি উপন্যাসে তিনি যে রাজনীতির কথা বলেছেন তা শাসকশ্রেণীর রাজনীতি নয়, শোষিতের রাজনীতি । তিনি নিম্নবর্গের কথা, স্বরকে তিনি তুলে এনেছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে । তাই তাঁর উপন্যাস নিছক পড়ার জন্য পড়া কিংবা সস্তা বিনোদন দেয় না, বরং ভাবতে শেখায়, নতুন চিন্তনের খোরাক যোগায়, ইতিহাসকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে, জীবনগাঁথার মধ্য দিয়ে অনুধাবনের পথ বাতলে দেয় । আমাদের ইতিহাস চর্চায় এখনও রাজ-রাজড়ার বন্দনার যে ইতিবৃত্ত– তা হতে আমরা বের হতে পারিনি এখনো কিন্তু মহাশ্বেতার উপন্যাস পড়লে এ থেকে বেরোনোর পথটা সহজেই অনুমেয় ।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন নিম্নবর্গের স্বর[২] । যারা ইতিহাসের কাছে, তথাকথিত শাসনযন্ত্রের কাছে, ক্ষমতাবানদের কাছে অবহেলিত, পদদলিত । যাদের নিজেদের কোনো "ইতিহাস" নেই । তারা তাদের জীবনের চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনা এসব কিছুকে ধরে রাখে গানের মধ্য দিয়ে, গল্পের মধ্য দিয়ে, বংশ-পরম্পরায় তাদের উত্তরপুরুষরা সেসব সম্পর্কে জানে গানের মধ্য দিয়ে, কিংবদন্তীর মধ্য দিয়ে । 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী তেমনি তুলে ধরেছেন মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর জীবনের কথা, তাদের লড়াই সংগ্রামের কথা, তাদের প্রকৃতিপ্রেম, প্রকৃতির সাথে বেড়ে ওঠার কথা, দিকু ও ইংরেজদের অত্যাচারের কথা, প্রকৃতি ধ্বংসের কথা সর্বোপরি মুণ্ডাদের ঐক্যের কথা ।

এ প্রবন্ধে মূলত মহাশ্বেতা দেবীর তিনটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য আলোচনা করেছি । উপন্যাস তিনটি হল: অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর এবং হরিরাম মাহাতো । প্রথম দুটি উপন্যাসের মূল নায়ক হল মুণ্ডারী জনগোষ্ঠী ও অরণ্য রক্ষায় তাদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস ও লালিত স্বপ্নপথ ।

প্রথম উপন্যাস; 'অরণ্যের অধিকার'-এ লেখিকা বীরসা মুণ্ডার (১৮৭৫-১৯০০) মাধ্যমে মুণ্ডারী জীবনের বাস্তবিক ও সত্যিকার লড়াই-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন ।

মুণ্ডারা ভারতের সিংভুম, রাঁচি, মালদহ, পালামৌ এসব অঞ্চলে বসবাস করত, এখনো কিছু মুণ্ডা এ অঞ্চলে বসবাস করে। এক সময় যখন তারাই ছিল এসব অঞ্চলের অধিকর্তা, বনভূমি তাদের উজাড় করে দিয়েছিল তার সব দান। ইংরেজ শাসনের বিভীষিকা, বসতবাড়ি ও আবাদি জমি বৃদ্ধির জন্য দিকুদের আগমন, তাদেরকে অধিকর্তা হতে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করে। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্য দিকুদের (অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠী) সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

মুণ্ডাদের আদিপুরুষ ছোটনাগপুরে তাদের বসতি পত্তন করে। কিন্তু অন্য রাজা হওয়ায় মুণ্ডাদের মাটিতে জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশের মানুষ। "চারদিক থেকে মানুষ এসেছিল। যারা এসেছিল, তারাই দিকু। যারা এসে মুণ্ডাদের প্রাচীন খুটখাট্টি গ্রামব্যবস্থা ভেঙে গেল, যারা মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে জমি-জিরাত দখল করে নিল, তারাই দিকু। তারা "বেঠবেগারী"র নিয়ম করল। বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার্ত মুহূর্তগুলো মুণ্ডারা গানে-গানে ধরে রাখে। সে গান কে বাঁধে, কে সুর দেয়, কেউ জানে না (অরণ্যের অধিকার: পৃ ২৩)।

মুণ্ডাদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর তাড়না হচ্ছে দিকুদের চাওয়া ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এক মুণ্ডার কথায় "হা দেখ্, দিকু ঘোড়া চায়, মুণ্ডা পয়সা দিবে, দিকু পালকি চায়, মুণ্ডা দাম দিবে, কাঁধে বইবে। দিকু যা চায়, সব দিবে মুণ্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা যোগাবে মুণ্ডারা। তা বাদে জোর করে টাকা ধার লিয়া করাবে মুণ্ডাকে, তা বাদে উচ্ছেদ করে দিবে"।

মুণ্ডাদের হাসিখুশি, সুখী সমৃদ্ধ জীবনে একের পর এক ঢুকে পড়েছিল মহাজন, জমিদার, মিশনারি, জেল-কাছারি, বাঁধানো রাস্তা, রেলগাড়ি, বেয়নেট, বন্দুক, খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, আড়কাঠি, বেঠবেগারি... ...মুণ্ডারা তাদের জমি, জঙ্গল, পাহাড়, জন্মসূত্রে পাওয়া মুণ্ডারী দুনিয়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল।

বৃটিশ উপনিবেশিক ব্যবস্থাকে আরও সংহত করার জন্য আদিবাসী কৃষিজ ব্যবস্থাকে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা মুণ্ডার চরিত্রের মাধ্যমে। ট্রাইবাল কৃষিজ ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বন্দোবস্ত না থাকায় ছোটনাগপুরের তৎকালীন রাজ্যপ্রধান অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সেখানে নিয়ে আসেন। তাঁর এ উপন্যাসে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যতটা লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে মুণ্ডাদেরকে তার থেকে বেশি করতে হয়েছে ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে। কেননা ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীরা কেবলমাত্র বন দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আদিবাসীদের ওপর বিভিন্ন ভাবে করারোপ করতে থাকে এবং তাদেরকে বিনা শ্রমে কাজ করাতে থাকে। ফলে মুণ্ডারী আন্দোলনের একটি প্রধান ইস্যুই ছিল বেঠবেগারি (বিনা পারিশ্রমিকে কাজ) বন্ধ করা। তাতে অবশ্য 'আদিবাসী'রা সফলও হয়েছিল। কিন্তু তার

জন্য যে লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে তা অবর্ণনীয়। ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীদেরকে মুণ্ডারা দিকু নামে ডাকত। মহাশ্বেতার উপন্যাসে তাদের অবর্ণনীয় জীবনসংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। আমরা যদি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সমতলের আদিবাসীদের কথা বিবেচনায় আনি তাহলে মুণ্ডাদের মতোই পরিণতি দেখতে পাই। যেখানে সমতলের আদিবাসীরা কেবলমাত্র তাদের জমি, জঙ্গল, পাহাড়, জন্মসূত্রে পাওয়া বন-দুনিয়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে না বরং তারা তাদের আত্মপরিচয়ই হারিয়ে ফেলছে। 'আদিবাসী' রাজনীতির পুরোটা জুড়েই রয়েছে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, ফলে সমতলের আদিবাসীরা কেবল তাদের স্বকীয়তাই হারাচ্ছে না বরং হারাচ্ছে জীবনযাপনের ন্যূনতম অধিকার।

দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি মুণ্ডাদের চাওয়া-পাওয়া ও লালিত স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন চোট্টি মুণ্ডা'র মধ্য দিয়ে। চোট্টি মুণ্ডা তাঁর কাল্পনিক চরিত্র যার মধ্য দিয়ে তিনি বীরসার না-পাওয়া 'অরণ্যের অধিকারে'র লড়াই চালিয়ে গেছেন। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আদিবাসী জীবনের মধ্যে নগরসভ্যতার ছোঁয়া দিয়েছেন। দিকুদের হাতে বন উজাড় হয়ে যাওয়ার কষ্ট তা মুণ্ডাদের জীবনচেতনা, তাদের মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে বিধৃত করেছেন। মুণ্ডারা আর তাদের আদিবাসী জীবনযাপন বন হতে ফলমূল সংগ্রহ, শিকার এসবের মধ্যে নেই। তাদের জীবনে নতুন শোষণরূপে আবির্ভূত হয়। বন কেটে ইটভাটা তৈরি, রাস্তাঘাট, দালান করার জন্য নির্মাণশ্রমিকে পরিণত হওয়া। একই সাথে তিনি মুণ্ডাদের সাথে তিনি শহরকেন্দ্রিক নকশাল আন্দোলনের সম্মিলন করেছেন। মুণ্ডাদের জীবনে মাস্তান, চাঁদাবাজদের অনুপ্রবেশ, তাদের নতুন রূপে শোষণের কথা তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা তাঁর 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসে 'অরণ্যের অধিকার'র বীরসা মুণ্ডার উলগুলানের চলমানতাকে তুলে ধরেছেন। মুণ্ডাদের অধিকার আদায়ের জন্য, বেঠবেগারি বন্ধের জন্য তাদের যে সংগ্রাম তার কথা তুলে ধরেছেন। বীরসা যে উলগুলানের শেষ করতে পারেননি, চোট্টি তা বহমান রাখে মুণ্ডাদের জীবনে। ১৮৭৬ সালে বেঠবেগারি বন্ধে আইন হয়। সেই আইনের বাস্তবায়ন তারা করতে পারে। মালিকশ্রেণীর কাছ হতে তারা তাদের শ্রমের মূল্য উঠাতে পারে। ঘাটোর সাথে নুনের স্বপ্ন তারা বাস্তবে নিয়ে আসে।

'হরিরাম মাহাতো' মুণ্ডাদের নিয়ে লেখা উপন্যাস নয় কিন্তু এটি বাছাই করার প্রধান কারণ হল একজন সমাজ-গবেষক হিসেবে কিংবা সামাজিক মানুষ হিসেবে কী ভূমিকা পালন করা উচিত তার উল্লেখ তিনি করেছেন এখানে। কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ লেখা কিংবা গবেষণা নয় বরং গবেষিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করার যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত– তার পথ দেখান তিনি এ উপন্যাসে। একই সাথে সামাজিক অসঙ্গতি ও সমাজকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থ চরিতার্থ করার যে মনন ও অদম্য ইচ্ছা ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান লালন করে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন এ উপন্যাসে। 'হরিরাম মাহাতো' উপন্যাসে মূলত দেখানো হয়েছে একজন পর্যবেক্ষকের আত্মপরিচয়ের সংকটের (identity crisis) বিষয়টি। একজন গবেষক কিভাবে গবেষিত জনগোষ্ঠীর

কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন/আলাদা করে ফেলে, কিভাবে তাকে একটা ব্যবস্থাপনার/সিস্টেমের মধ্য দিয়ে চলতে হয় যেখানে তার নিজস্ব স্বকীয়তা থাকে না, যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পায় না। নিজেকে খুঁজে পাবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা দেখিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন মিশনগুলো কিভাবে ধর্মের নামে, সাহায্যের নামে এ দেশীয় রাজনীতির দালালি করে। নিজেদের স্বার্থের জন্য বলি দেয় নিরপরাধ জনগণকে। এ উপন্যাসে মহাশ্বেতা তুলে ধরেছেন ভারতের আদিবাসী, কৃষক, শ্রমিক-জীবনের বাস্তবতা। সাহায্যের নামে মিশনের স্বার্থান্বেষী কাজকর্ম। সরকারের নিশ্চুপ অবস্থান। তাঁর উপন্যাস নিছক উপন্যাস নয় বরং তা হল শাসন, শোষণের চিহ্নিত চিত্র। এ উপন্যাসের মিশনারি আর আমাদের উন্নয়ন সহযোগী এনজিও'র ভূমিকা (সকল এনজিও যে এর মধ্যে পড়ে তা নয়) যেন আপাতদৃষ্টে একই রকম মনে হয়।

সমতলের 'আদিবাসী' অধিকার ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে মুণ্ডাদের মতোই পরিণতি হয়েছে প্রায় ৮-১০ লক্ষ আদিবাসীর জীবন। তবে 'আদিবাসী'দের মধ্যেও যে বিভিন্নতা রয়েছে– পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর জীবন আর সমতলের আদিবাসীর জীবন ও যুদ্ধ যেমন একই ধরনের নয় তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী যে গুরুত্ব পায় তা সমতলের আদিবাসী পায় না।

বাংলাদেশে মোট 'আদিবাসী'র পরিসংখ্যানগত উপাত্ত পাওয়া খুবই কঠিন। ১৯৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯৭৪৪৪৭ জন যার মধ্যে আদিবাসী হল ৫০১১১৪। ১৩ টি 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠী মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি। রংপুর জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৮০১৬ (উপজেলা নির্বাহী অফিসের ২০০৯ সালের দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। ১৯৮০ সালের একটি খ্রিস্টান মিশনারির হিসাব হতে দেখা যায় এদেশে মোট সাঁওতালের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ যা ১৯৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী ২ লক্ষেরও বেশি। দিনাজপুর জেলার আদিবাসীর সংখ্যা ৬১৭৪৪ জন যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৪.৪২%। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী ২১২ টি মুণ্ডা পরিবারে মোট ১১৬৩ জন মুণ্ডা সুন্দরবন এলাকায় বিশেষত সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় বসবাস করে। লক্ষণীয় বিষয় হল 'আদিবাসী' হিসেবে যে পরিচয় তা বৃটিশ সময়কালে শুমারিতে (যেমন ১৮৮১ সালের শুমারিতে কিংবা ১৯৪১ সালে সাঁওতালদের ওপর পরিচালিত জরিপ হতে দেখা যায় সে সময় ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ২৫ জন সাঁওতাল ছিল যা পরবর্তীতে কমে আসে) উল্লেখ থাকলেও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পরবর্তী শুমারিগুলোতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। যা রাষ্ট্রের নিস্পৃহতাকেই প্রকাশ করে।

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বসবাসরত 'আদিবাসী'রা যতটা গুরুত্ব পান সমতলের আদিবাসী'রা তার সিকিভাগ গুরুত্বও পান

না। এ কারণে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সুন্দরবন এলাকা, দিনাজপুর কিংবা রংপুরে বসবাসরত 'আদিবাসী' সাঁওতাল, মুণ্ডা, গারো, ওঁরাও, মালপাহাড়ি, মুসহর, হামলে, কোলহে, কোড়া, ভুঞ্জার, মালো প্রমুখ আদিবাসীরা অবহেলিত থাকে রাষ্ট্রের কাছে। যার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি। এটি হতে পারত 'আদিবাসী'/'উপজাতি' অধিকার সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়। কিন্তু তা হয়নি। রাষ্ট্রের কাছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' গুরুত্বপূর্ণ 'আদিবাসী' নয়। আর যদি আদিবাসীই গুরুত্বপূর্ণ হত তাহলে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত থাকত।

সমতলের আদিবাসীদের অধিকাংশই বসবাস করেন বনভূমিতে এবং এই বনভূমি দিনকে দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বনভূমি বৃদ্ধিকরণে সামাজিক বনায়নকে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বিদ্যমান বনভূমির সকল জায়গাতে বনভূমির ঘনত্ব বাড়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই বসবাস করে কিছু বনাঞ্চলে। তাদের জমিজমার মালিকানার বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারিত নয় এবং তারা তাদের ইচ্ছামতো বনের জমি ভোগদখল করে। তাই তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি রেখে বাকিটা ছেড়ে দিতে হবে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। যা সরকার সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে রক্ষা করবে।

সরকার কাগজে-কলমে বন সংরক্ষণের বিষয়ে যতটা আন্তরিক বাস্তবিকভাবে বন বিভাগ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের কাজে তার প্রমাণ মেলে না। যার প্রমাণ মেলে সবুজ বনায়ন বেষ্টনির গাছ কেটে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙার জন্য জায়গা দখল কিংবা বনদস্যু হিসেবে পরিচিত বন বিভাগের উচ্চতর কর্মকতা আব্দুল গনির পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

সারা বিশ্বজুড়ে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কথা হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো আমরাও খুবই শংঙ্কিত। জলবায়ু পরিবর্তন ও তার নেতিবাচক প্রভাব হতে রক্ষার জন্য জাতীয় অভিযোজন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম ২০০৫ (নাপা), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও ব্যবস্থাপনাপত্র, ২০০৯ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ দুটির কোনোটিতেই 'আদিবাসী'দের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য সরকারের পাশাপাশি ইউএনএর বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম থাকলেও সমতলের আদিবাসীদের বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি। এছাড়া উন্নয়ন-অংশীদার হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রমও অতি নগণ্য। এর কার্যকারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো আমার কাছে প্রতিভাত, সেগুলো হল:

ভূ-রাজনৈতিক ভাবে সমতলের আদিবাসীরা এমন সব জেলায় বসবাস করেন যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (সরকারি, বেসরকারি এমনকি ব্যক্তিক পর্যায়ে) গুরুত্বপূর্ণ নয়।

'আদিবাসী' জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের কারণে সমতলের আদিবাসীদের গুরুত্ব কম।

জীবন-জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে সমতলের আদিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারেনি।

সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে মানবসম্পদ বিকাশের বিষয়টি অবহেলিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের 'আদিবাসী'রা মানবসম্পদ বিকাশে (বিশেষত শিক্ষা, যোগাযোগ) যে ধরনের অগ্রগতি সাধন করেছে তা সমতলের 'আদিবাসী'রা পাননি।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির কারণে পার্বত্য 'আদিবাসী'রা যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে সেভাবে আসেনি।

সমতলের আদিবাসীর সংখ্যা কম।

সমতলের 'আদিবাসী'দের মধ্যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি।

পরিশেষ

বৃটিশ উপনিবেশিক ব্যবস্থাকে আরও সংহত করার জন্য আদিবাসী কৃষিজ ব্যবস্থাকে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা মুণ্ডার চরিত্রের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সমতলের 'আদিবাসী'দের মধ্যে এমন কোনো বীরসা বের হয়ে আসছে না যে তার লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে অধিকার আদায়ের জন্য। যেখানে আজ হতে প্রায় এক শতাব্দী আগে অরণ্যের অধিকার আদায়ে এক হয়েছিল মুণ্ডারা তেমনটি আর দেখা যায় না। কিন্তু কেন? কেননা জীবন যাপনের জন্য তাদের মালিকানায় থাকা বন উজাড় হচ্ছে দিন কে দিন। যে বনকে তারা রক্ষা করবে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সে বনই আজ কাজে আসছে না তাদের। বন কেবলমাত্র নামমাত্র বন হিসেবে রয়ে গেছে বাকিটা দখল হয়ে গেছে আব্দুল গনির মতো কর্মকর্তা আর ক্ষমতার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের হাতে। ফলে আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্র হিসেবে বন আর নেই। তাই তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী জীবনপ্রণালী হতে বের হয়ে কৃষিশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক কিংবা দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। দারিদ্র্যের এই কশাঘাতে তারা আর 'আদিবাসী' মুণ্ডা বা সাঁওতাল নেই কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে টিকে আছে।

টীকা

১.আমি এ প্রবন্ধে 'আদিবাসী' ও 'উপজাতি' বিতর্কে যাব না। ইংরেজি ইনডিজেনাস পিপল/ ট্রাইবকে 'আদিবাসী' অর্থে ব্যবহার করেছি। আমার এই শব্দচয়ন মূলত দুটো কারণে। প্রথমত, এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য হল মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে কিভাবে 'আদিবাসী' জীবনের লড়াই-সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরা এবং তাঁর উপন্যাসের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা তা জীবন ও জীবিকার তাগিদেই হোক আর

সম্প্রদায়ের আত্মপরিচিতি নির্মাণের জন্যই হোক যে চিত্র ফুটে উঠে তা বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসীদের জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা ।

২.'সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপ' নামে দক্ষিণ এশীয় একদল স্কলার ইতিহাসকে পুনর্পাঠের আহ্বান জানান এবং দিকনির্দেশনা দেন । তাদের এই পুনর্পাঠের মূল উপজীব্য হল প্রচলিত ইতিহাসে গণমানুষের স্বর, শোষিতের স্বর অনুপস্থিত । এ ইতিহাস হল রাজ-রাজড়ার ইতিহাস সেখানে ইতিহাসকে পাঠ করা হয়েছে 'উপর থেকে নিচে' ফলে একদিকে যেমন অতীতের সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না অন্যদিকে গণমানুষের অবদানকে, লড়াই-সংগ্রামকে অবজ্ঞা করা হয় সচেতন ভাবে । এই প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা ইতিহাসকে দেখতে বলেন 'নিচ থেকে উপরে'– গণমানুষই হল ইতিহাসের প্রবক্তা, তারাই নায়ক ।

তথ্যসূত্র

মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৭) অরণ্যের অধিকার
মহাশ্বেতা দেবী (১৯৮০) চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর
মহাশ্বেতা দেবী (১৯৮২) হরিরাম মাহাতো
জেলা তথ্য বাতায়ন: রংপুর, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ
http://www.banglapedia.org (various entry)
http://en.wikipedia.org (various entry)

[লেখক: গবেষণা সহযোগী, বিআইডিএস ।]

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বাধিকার রক্ষার লড়াই চিরন্তন

আ হ মে দ কা মা ল

আমরা পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এবং জনসংহতি সমিতির কর্মীদের কাছ থেকে পাহাড়ি জনগণের লড়াই, তাদের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন দেশের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী অর্থাৎ বাঙালিরা করেছে, সে কাহিনী শুনেছি। শুনতে শুনতে মনে হয়েছে সবাই যেন একই কথা বলছেন। ইতিহাসের শুরু একই জায়গা থেকে, অত্যাচারের ধরন সবাই একইভাবে বলে যাচ্ছেন। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ একটিই– এই পাহাড়ি জনগণের লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় মিত্র হচ্ছে তাদের ইতিহাস। সেই কারণেই মিত্রের কথা বারে বারে তাদের স্মরণ করতে হয়। যে কোনো জাতীয়তাবাদী লড়াই, যে কোনো স্বাধিকারের সংগ্রাম, নিপীড়িত যে কোনো সংগ্রামের সবচেয়ে বড় মিত্র কিন্তু তাদের ইতিহাস। এই ইতিহাস তার নিজের মনমতো করে করা, এই ইতিহাসের গল্প সে নিজেই তৈরি করে এবং এই ইতিহাসের গল্প থেকেই সে শক্তি সঞ্চয় করে।

এই ইতিহাসের বাইরেও ইতিহাস আছে। নিশ্চয়ই আছে, সে ইতিহাসটাও হয়তো একদিন প্রধান হয়ে উঠবে যখন আজকের এই পরিস্থিতি বদলাবে। সেই বদলানোর ব্যাপারে আমরা বাঙালিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করব। তখন সেই ইতিহাসের গল্প হবে, আদিকাল থেকে পাহাড়িদের সঙ্গে বাঙালিদের সম্পর্ক কত মধুর ছিল। সেই মধুর সম্পর্ক কীভাবে আবার ফিরে এসেছে। ঐ গল্পগুলো তখন খোঁজা হবে। অতএব ইতিহাস যে কোনো ক্রান্তিলগ্নের মিত্র। আজ পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে অস্তিত্বের সংকট। তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের ইতিহাস হবে শত্রুর চেহারা উন্মোচনের ইতিহাস। সেই ইতিহাসই আমরা শুনছি।

১৯৮৯ সালে আমার একবার রাঙ্গামাটি যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে ট্যুরিস্ট রেস্টহাউজে সন্ধ্যার পর আমাকে বলা হলো যে, পাহাড়ি গান শোনা যাবে। একটি বাচ্চা ছেলে পাহাড়ি গান করছিল, যার মানে আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম এর মানেটা কী, তখন বলা হল যে, "একটি মেয়ে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছে। ছেলেটি বিদেশে গেছে, দীর্ঘকাল কোনো চিঠি পাঠায়নি।

অনেকদিন পর চিঠি আসল। চিঠিটা পড়ে মেয়েটির মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কারণ অনেকদিন পরে চিঠি না পাওয়ায় তার মন খারাপ ছিল, তারপর ছেলেটি চিঠিটা লিখেছে আবার বাংলা ভাষাতে।"

প্রথমে আমি একটা ধাক্কা খেলাম। তখন আমার মনে হলো বাঙালি জাত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে না উঠলে এ গানের তাৎপর্য আমি কোনোদিনই বুঝতে পারব না। সেদিন এটিই ছিল পরীক্ষা যে এই গানটাকে আমি কীভাবে গ্রহণ করছি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি, যারা আরেকটি জাতিগত শোষণের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি, যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, আমরা অবাক হয়ে যাই, এই প্রজন্ম কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা ভুলে যায়! এখনো পর্যন্ত কাগজে-কলমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হয়েছে। এই চেতনারও বিভিন্ন রূপ আছে। আমরা কোন চেতনার কথা বলছি? আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ চেতনার কথা বলি, তাহলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তাদের পাশে থেকে লড়াই করতে হবে, যাতে করে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তৈরি করতে পারি। যে সমাজে আমরা সবাই একে অপরকে সম্মান করব, একে অপরের স্বার্থরক্ষা করে বাঁচতে পারব, একটা গণতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে পারব। সেটা লম্বা স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নের অংশীদার ছোট ছোট কয়েকটি রাজনৈতিক দল, যাদের কেউ কেউ এখানে এসেছেন। বড় দলগুলো এই স্বপ্নের অংশীদার নয়, তাই তারা এখানে নেই। যদি তারা এখানে আসতেন, যদি তারা কথা বলতেন, যদি তারা বুঝতে পারতেন একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে দায়িত্বটা কী, তাহলে হয়তো আজকের এই আলোচনা অনেক সার্থক হত। আমি মনে করি সে আলোচনা একদিন হতে পারে। আসলে সমস্যা কোথায়? আমি মনে করি, এ দেশে মন্ত্রী বদলেছে অনেকবার, প্রধানমন্ত্রী বদলেছে, সরকার বদলেছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বদলায়নি। যে আমলারা বা যে গোষ্ঠীটি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত নেয়, তারা কিন্তু থেকেই গেছে। আর প্রক্রিয়াটাও থেকে গেছে। এই-জাতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশে জাতীয় ঐকমত্যের ভেতর দিয়ে সিদ্ধান্ত হত।

শান্তিচুক্তি হয়েছে, কিন্তু কোনো জাতীয় ঐক্যমত্যের মধ্য দিয়ে হয়নি। সবচেয়ে বড় বিরোধী দল এই চুক্তির বিরোধিতা করছে। তাদেরকে এই চুক্তির গ্রহণ, বাস্তবায়ন, আলোচনার অংশীদার করা হয়নি। আকাশের কোণে কিন্তু কালো মেঘ থেকেই গেছে। চুক্তিটাকে আমি কোনো পারফেক্ট চুক্তি বলছি না। এই চুক্তি সূচনা মাত্র। এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা অন্তত অস্ত্র বিদায় করতে পেরেছি। টেবিলে আসতে পেরেছি, কথা বলতে পেরেছি এবং এই কথা বলার মধ্য দিয়েই হয়তো আরো ভালো সমাধান বেরিয়ে আসবে, যার ভিত্তিতে পাহাড়ি মানুষেরা আরো সুন্দর জীবন তৈরি করতে পারবে। তার সূচনা হয়েছে। এই সূচনা বা পথকে প্রশস্ত করার দায়িত্ব কিন্তু অনেকের।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি তৈরিতে আমরা যারা জড়িত তাদের সকলের কিছু দুর্ভাবনাও কাজ করে। যে কোনো জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে যে ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা জনগণের ভেতর তৈরি হয়, তার থেকে নেতৃবৃন্দ দূরে সরে যান। কিন্তু দরিদ্র জনগণ সেখানেই থাকে, যেখান থেকে তারা মুক্ত হতে চেয়েছিল। আমরা আশা করব, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নেতৃত্ব এই কথাটি মনে রাখবেন।

দুস্থ জনগণের পাশে যেন তারা থাকেন, তাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ যেন তারা তৈরি করে দেন। আমরা বাংলাদেশ করেছি, আমরা পাকিস্তান করেছিলাম, কিন্তু গরিব জনগণ গরিবই থেকে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, গরিব মানুষেরা কথা বলে, বাঙালি অধিবাসীদের কথা বলে, যে সিমপ্যাথি ম্যানুফেকচার করা হচ্ছে তার পেছনে উদ্দেশ্যটা কী? প্রশ্নটা খুব প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ তাদেরকে ক্যানন-ফডার বানানোর যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া কিন্তু চালু আছে। যদি তাদের রাজনৈতিক কারণে দরকার হয় আবার তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে। তাহলে একটা দুর্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। দুটো দুশ্চিন্তার কথাও বলা হয়। একটা হচ্ছে বাঙালির অধিকার নিয়ে, আরেকটা সংবিধানের সাথে আঞ্চলিক পরিষদের যে দ্বন্দ্ব, সেটা নিয়ে। কিন্তু আমরা যদি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে পারি, নেতৃত্ব বিপথগামী হলে জনগণ যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে আমাদের আরো আশ্বস্ত হওয়ার কারণ থাকবে। তাই পাহাড়ি নেতৃত্বের আজ প্রধান কাজ হচ্ছে সেই জনগণকে সচেতন করা। সচেতনতার একটা দিক হবে তাদের বিচ্যুতির লক্ষণ সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দেয়া। জনগণ বুঝতে পারবে, তারা বিচ্যুত হচ্ছে পথ থেকে।

আমাদের ছোট জাতিসত্তার বন্ধু স্বাভাবিকভাবেই ছোট ছোট রাজনৈতিক দল। সেই রাজনৈতিক দলের কয়েকজন বন্ধু বলেছেন যে শোষণহীন সমাজ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। আমি নিজে সেটা মনে করি না। এর কারণ হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস। এই ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সমাজতন্ত্র হলেই ছোট জাতিসত্তার সব সমস্যা দূর হয় না।

চীনেও ছোট জাতির সমস্যা আছে, কিন্তু সেখানে সমাধানের প্রাথামিক স্তরটা তৈরি হয়েছে। ছোট জাতির মানুষরা তাদের ক্ষমতা, জীবনের স্বস্তি ফিরে পাবে কি না, এটা নির্ভর করে পরবর্তী নেতৃত্ব সেই আন্দোলন সম্পর্কে কতটুকু সচেতন তার ওপর। অর্থাৎ এ লড়াই চিরন্তন, এ লড়াই চলবেই। এ লড়াই কোনো একটি রাষ্ট্রের চেহারা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই শেষ হবে না। ছোট মানুষের স্বাধিকার রক্ষার লড়াই চিরন্তন– তা থামার কোনো অবকাশ নেই। থামা মানেই হেরে যাওয়া।

ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে আজকের নেতৃত্ব এ লড়াইয়ে কতটুকু সৎ ছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র গণক নয় যে, সে বলতে পারবে এর ভবিষ্যৎ কী হবে। এখানে জানাজানির যে প্রক্রিয়াটা চালু হয়েছে, সেটাকে এগিয়ে নিতে হবে এবং এর মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আরেকবার আমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে না।

[লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্রকৃতির সন্তান আদিবাসীদের এ কী দশা!

আ তি উ র র হ মা ন

সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার সাথে তাল মেলাতে না-পারা কিছু মানুষ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই রয়েছে। গোটা পৃথিবী অর্থ-বিত্ত, আলোকচ্ছটা, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবেচনায় তিন ভাগে ভাগ করা গেলেও এসব মানুষকে আজও ভাগ করা সম্ভব হয় না। উন্নত, উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত সব দেশেই তাদের একই রূপ, একই জীবন-চলা। তথাকথিত সভ্য মানুষের নিরন্তর অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হয়ে তারা আজও পুরনো ধ্যানধারণা, উৎপাদন পদ্ধতি ও জীবনবোধ নিয়ে পড়ে আছে। সভ্যতার প্রথম দিকে যখন মানুষজন পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো শিখেছিল তখন কী যে অভাবনীয় আনন্দে উল্লসিত হয়েছিল, তা অনুভব করার শক্তি আমাদের নেই। কারণ এখন আগুন জ্বালানোর জন্য একটি ছোট্ট কাঠিই যথেষ্ট। বিদ্যুতের আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত। রান্নার জন্যে ইলেকট্রিক ওভেন, মাইক্রোওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাসের চুলার সুইচ টিপলেই এখন আগুন জ্বলে ওঠে। এ সবই শুধু আমাদের মতো তথাকথিত সভ্য মানুষের জন্যে। উন্নয়ন-আবিষ্কারের সুফল আমরা পাচ্ছি। অথচ আমাদের অবহেলার কারণেই প্রকৃতির সন্তান আদিবাসীরা এই সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাষ্ট্র-পরিচালকদের নিরন্তর অবহেলায় তাদের জীবনচলা আদি ও বর্তমান রূপ একই ফ্রেমে আজ বন্দী। আদিবাসীরা বাংলাদেশের সবচেয়ে অসহায় মানুষ। তারা প্রকৃতির সন্তান।

তাদের ছিল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। তাদের নিজস্ব নৃ-পরিচয় এবং জীবনচলার বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। আমরা যেমন বিশ্বায়নের দাপটে নিজেদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জীবনচলার ধরন বদলাতে বাধ্য হচ্ছি, একই ভাবে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর চাপে আদিবাসীরাও তাদের স্বকীয়তা হারাচ্ছে। ফলে তারা দিন দিন আরও দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদের পেশা বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় জীবন চালাতে না পেরে দেশ ছাড়তেও বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে, আমাদের দেশে পঁয়তাল্লিশটির মতো আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে। সবমিলে সংখ্যায় তারা তিরিশ লাখেরও বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ যে আদমশুমারি (২০০১) করেছে তাতে আদিবাসীদের কোনো হদিসই নেই। এর আগের আদমশুমারিতে (১৯৯১) বলা হয়েছিল তাদের সংখ্যা বারো লাখ। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার এই তথ্যবিভ্রাট থেকেই বোঝা যায় ক্ষুদ্র এসব জাতিসত্তার প্রতি আমাদের মূলধারার মানুষের ঔদাসীন্য কতটা। পরিসংখ্যানগত এই উপেক্ষাও ঔদাসীন্যেরই একটি দিক। উন্নয়নের স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করতে পারার বিষয়টিও এই দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল। আর সে কারণেই এদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ডও বেশি। সর্বক্ষণ তারা মূলধারার মানুষদের চাপের মুখে থাকে। তারা তাদের জমিজমা প্রাকৃতিক নিয়মেই পেয়েছে বলে আধুনিক মানুষের মতো দলিলপত্র রাখে না। আর সেই অজুহাত দেখিয়েই ক্ষমতাবান মানুষেরা তাদের জমি দখল করে নিতে সামান্য কসুর করে না। পাশের জমির মালিক আইন ভেঙে তাদের জমি দখল করে নিচ্ছে। তাদের রক্ষা করার মতো উপযুক্ত নীতি ও সদিচ্ছা আমরা এখনও পর্যন্ত লক্ষ করছি না। উল্টো তাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে তাদের জীবন ও জীবিকাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে নির্মাণ-পারদর্শী প্রশাসন 'ইকো-পার্ক' নামের অযৌক্তিক এক পরিবেশ-বিরূপ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পিছপা হয়নি। মধুপুরের আদিবাসীরা প্রকৃতিকে লণ্ডভণ্ড করতে উৎসাহী এই উন্নয়ন-উদ্যোগকে প্রতিরোধ করেছে। প্রতিবাদী একজন আদিবাসী সেই আন্দোলনে প্রাণও দান করেছে। প্রকৃতির জন্যে তাদের এই অনন্য ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। একইভাবে উন্নয়নের নাম করে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার উদ্যোগ নিয়ে অবিবেচক প্রশাসন হাজার হাজার আদিবাসীকে গৃহহীন করতে সামান্য দ্বিধা করেনি। তাদের অনেককেই এক সময় দেশ ছেড়ে চলেও যেতে হয়েছিল। তাদের সন্তানেরা সে কারণে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির প্রতি নির্দয় হলে এমনটি যে ঘটতে পারে তা আমাদের মূলধারার নীতিনির্ধারকরা অনেক সময় আমলেই নিতে চান না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে এমনটি হবার কথা ছিল না। সেই যুদ্ধের মূল স্পিরিটটিই ছিল সকলের বাসযোগ্য একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি নির্মাণ করা। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় গড়ে তোলার যে একরৈখিক পথ পাকিস্তানি এলিটরা বেছে নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের স্বাধীনতার স্থপতিগণ আন্ত

রিকভাবেই এমন একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি গড়ার মতো করেই একটি সুন্দর সংবিধানও রচনা করেছিলেন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক সেই সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মানবিক বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অসাবধানবশত আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা বিকাশের দিকটি আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। আর সংবিধানের এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সমতল ভূমির অনেককে পাহাড়ে বসবাসের প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে পাহাড়ের বাসিন্দাদের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার পরিণতি মোটেও ভালো হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা গেলেও তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমি-অধিকার এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি। শুধু পার্বত্য এলাকা কেন, উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমির আদিবাসীদের ভূমিও হরণ করেছে মূলধারার ক্ষমতাবান মানুষেরা। সাঁওতাল, গারোসহ অন্যান্য আদিবাসীদের জমি ও জীবন নিরন্ত র নানামাত্রিক হুমকির মুখে পড়ে আছে। আশার কথা বাহাত্তরের সংবিধানের এই অপূর্ণতা পূরণ করার বিরল সুযোগ সৃষ্টি করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধান সংশোধনের জন্যে সংসদীয় এক বিশেষ কমিটি এখন কাজ করছে। আশা করা যায়, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গোষ্ঠীগুলোর ন্যায্য অধিকার এবারে সংবিধানে ঠিকমতো যুক্ত করা সম্ভব হবে।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন কনভেনশন হয়, আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দেশ আবার স্বাক্ষর করে সেসব নীতি-পরিকল্পনায়। আবার কোনো কোনো দেশ এড়িয়ে যায়। যদি এসব নীতিমালায় স্বাক্ষর করি তাহলে আমাদের কুক্ষিগত সম্পদ দিয়ে দিতে হবে ঐসব নিরীহ জনদের, নিরন্ত রভাবে। তাই স্বাধীনতার পরপরই ২২ জুন ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার অনুস্বাক্ষর করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১৬৯ নম্বর কনভেনশনে। আদিবাসী জনগণের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এ কনভেনশনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়। ১৬৯ নম্বর কনভেনশনের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত জমির ওপরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দখল ও মালিকানার অধিকার স্বীকৃত হবে'। ১৬ ধারা ১ উপধারায় বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। ব্যতিক্রমী কোনো ক্ষেত্রে যদি তাদের স্থানান্ত র অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে নেয়া জমির অন্ত তপক্ষে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট ও বৈধ জমি প্রদান করতে হবে, যেখানে তারা তাদের বর্তমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ব্যবস্থাও করতে পারে।' কিন্তু দুঃখজনকভাবে পরবর্তীতে এ কনভেনশন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন ও প্রাথমিক খসড়া পিআরএসপিতে আদিবাসীদের কথা তুলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা আমাদের নীতিনির্ধারকগণ বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি রয়েছে। ফলে তাদের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের নীতিগতভাবে কিছুটা

দায়বদ্ধতা আছে। এছাড়া দেশ-বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীদের কথা সভা-সেমিনার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে আলাপ-আলোচনা এবং তাদের নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। তাই শেষপর্যন্ত আমাদের দেশের জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) ঠাঁই পায়। ইতোমধ্যে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র ২, 'দিন বদলের পদক্ষেপ' ২০০৯-১১ প্রকাশিত হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩২৯ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান দলিলের দু'পৃষ্ঠা। ঐ দু'পৃষ্ঠায় তাদের জন্য যেসব কথাবার্তা ও কৌশলের উল্লেখ আছে তা এখানে উপস্থাপন করছি।

আমাদের তিন বছর মেয়াদি এই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে দেয়া আছে, সরকার নৃ-জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৭ বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেনশন ১৬৯ এর অনুসমর্থন দান করবে। পিআরএসপিতে নেয়া আদিবাসীদের জন্যে উন্নয়ন পদক্ষেপগুলো হবে–

ভূমি অধিকার

নৃ-জনগোষ্ঠীর ভূমি-সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি যথোপযুক্ত ভূমি নীতি প্রণয়ন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য একটি শক্তিশালী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। নৃ-জন সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনায় নৃ-জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

নৃ-জন সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে নৃ-জনগোষ্ঠীর সনাতন জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। এছাড়া তাদের সনাতন খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্পর্শ না করে প্রযুক্তির ব্যবহারে সামাজিক সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে।

মানব উন্নয়ন কর্মসূচি

বিদ্যমান মানব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নৃ-জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃত্ব শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি এবং আবাসন সুবিধা যাতে নৃ-জনগোষ্ঠীর অধিগম্য করা যায় সে জন্য পরিবীক্ষণ ও তদারকি শক্তিশালী করা হবে।

ভাষা ও শিক্ষায় শিশুদের অধিকার

নৃ-জনগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার জন্য একটি জাতীয় ভাষা নীতি প্রণয়ন করা হবে। নৃ-সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করতে একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিদ্যুতায়ন ও টেলিযোগাযোগ

পাহাড়ি জেলাগুলোর বিভিন্ন উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড ও বিতরণ ব্যবস্থা প্রসার করা হবে। বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য পাহাড়ি জেলাগুলোতে গ্রিড সাব-স্টেশন স্থাপনসহ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হবে।

নিরাপত্তা বেষ্টনী ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি

বন্যা ও খরার কারণে জুম ফসলের ক্ষতির ফলে আকস্মিকভাবে উপার্জনের সুযোগ কমে গেলে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কর্মসুযোগ বৃদ্ধি ও তাদের সামর্থ্য বাড়াতে পাহাড়ি জেলাগুলোতে সহায়ক কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও অ-কৃষি অর্থনৈতিক কার্যক্রম

পাহাড়ি জেলাগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পোল্ট্রি ও পশু পালনের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানো হবে। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন এবং ফলমূল ও ওষধি চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া হবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর 'এক জেলা এক পণ্য' কার্যক্রমে সহায়তা করা হবে, যার অধীনে রাঙ্গামাটির জন্য বস্ত্রশিল্প, খাগড়াছড়ির জন্য আনারস এবং বান্দরবনের জন্য রবার চাষ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণের বিস্তার

দরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রসার করা হবে এবং তাদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দান করা হবে। গ্রামীণ সড়ক, হাট এবং কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য বাজার উন্নয়নের কাজ যথারীতি অব্যাহত থাকবে। কৃষি ও স্থানীয় পণ্য যাতে সহজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকতে পারে এক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন

রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে আকর্ষণীয় পর্যটন সুবিধা উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

আমাদের নীতি-বোদ্ধারা অনেক চিন্তাভাবনা করে পিআরএসপিতে দরিদ্রজনদের ভাগ্য বদলানোর বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করেছেন। কৌশলগুলোও প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু কাদের জন্যে এসব উন্নয়ন পদক্ষেপ? এ প্রশ্ন করলে আদিবাসীদের বঞ্চনার চিত্র আরও গভীরভাবে ফুটে ওঠে। সুবিধাবঞ্চিত ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকায় স্থান পেয়েছে ছোট পেশাজীবী জনগোষ্ঠী যেমন ধোপা, নাপিত, মুচি ও সনাতন নিম্নবর্ণের মানুষ। সনাতন নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে

কৈবর্ত/নমশূদ্র, জালো (মৎস্যজীবী)। অথচ সুবিধাবঞ্চিতদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে উন্নয়নের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠী আদিবাসী। তারা স্থান পেয়েছে একটি আলাদা পরিচয়ে। তাদের জন্যে গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ হবে আলাদা। তারা যেমন বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, মূলধারার উন্নয়নও তাদের জন্যে সুদূরপরাহত। তাদের জন্যে রূপকল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচর্যা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং জমিজমাসহ অন্যান্য সম্পদে তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্যে কোনো আলাদা উন্নয়ন উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। আলাদা জাতি হিসেবে স্থান পেলেও আলাদা বাজেট বরাদ্দ তাদের জন্যে দেয়া হয় না। দরিদ্রের ভাগ্য উন্নয়নের দলিল এডিপিতেও তাদের জন্যে আলাদা করে তেমন কোনো প্রকল্প নেয়া হয় না।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মূলত ঐ এলাকার রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু দেশের বাকি অঞ্চলের পাহাড়ি ও সমতলীয় আদিবাসী কিংবা বনবাসীরা সে রকম নেকনজরে আসেননি কারো। তাদেরকে যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে 'দুর্বৃত্ত' ও 'নিকৃষ্ট' মানুষ মনে করে নিচু চোখে দেখা হয়, তেমনিভাবে তাদের জন্য আলাদা করে উন্নয়ন কৌশলও গ্রহণ করা হয় না। মধুপুর ভাওয়ালের বনবাসী আদিবাসীদের প্রায়ই বনের শত্রু আখ্যা দিয়ে হামলা-মামলা গুলিবর্ষণ করা হয়। আদিবাসী গ্রামের সবাইকে মাঝেমধ্যে 'একঘরে' করে রাখা হয় নানা ছুতোয়। তাদের কপালে জোটে নিম্নতম ও নিকৃষ্টতম পেশা। আদিবাসীর সন্তানদের জোটে না শিক্ষা, ন্যূনতম আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, কিংবা সামান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা। তাদের জমি আর বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হয়, কেড়ে নেওয়া হয় তাদের উপাসনালয়। জীবনের প্রয়োজনে অবশ্য তারা মাঝেমধ্যে তীর-ধনুক নিয়ে রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানিকে রুখে দাঁড়ায়। তবে আদিবাসীদের অধিকাংশই শান্তিপ্রিয়, অন্তর্মুখী এবং সামান্যে তুষ্ট হবার কারণে তারা বঞ্চনার শিকার হয়। জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে তাদের কথা লেখা হয় না। ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আদিবাসীদের অধিকার সম্বলিত জাতিসংঘ ঘোষণা চূড়ান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সরকার আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে সার্বজনীন কোনো নীতি গ্রহণ করেনি। প্রণয়ন করেনি কোনো গ্রহণযোগ্য নীতিকাঠামো। আমাদের দেশে আদিবাসীদের সবচাইতে উন্নতমানের উপস্থাপন দেখা যায় তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে, অনুষ্ঠানে। কিন্তু যে-আন্তরিকতা নিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরার কথা তা কি সত্যি খুঁজে পাওয়া যায় এসব সাংস্কৃতিক আয়োজনে? বাংলাদেশের যেসব জেলায় আদিবাসী সংখ্যায় বেশি সেখানে স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা সবচাইতে কম। অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থাও খুব খারাপ। রোগ-ব্যাধির বিস্তার তুলনামূলকভাবে বেশি। তাদের কোনো কোনো সন্তান আদিনিবাস ছেড়ে শহরে চলে আসছে নতুন কাজের সন্ধানে। গারো মেয়েদের এখন শহরের আলোঝলমল বিউটি পার্লারে দেখা যাচ্ছে।

শুরুতে মজুরি কম থাকলেও দক্ষতা বাড়ার পর তাদের আয় বাড়তে থাকে। সেই আয়ের একটা অংশ তারা বাবা-মার কাছে পাঠায়। তবে আদিবাসীদের এই সন্তানেরা শহরে
এসে আরও ভালো কাজ খুঁজে পেতে পারত যদি তাদের খানিকটা লেখাপড়া লাভের সুযোগ থাকত। তাদের নিজেদের ভাষায় শুরুর দিকের শিক্ষাটা পেলে খুবই ভালো হত। কিন্তু সে সুযোগ তারা পাচ্ছে কই? মূলধারার স্কুলগুলোতেও তারা যথেষ্ট হারে ঢুকতে পারছে না। সে কারণেই তাদের শিক্ষার সুযোগ সীমিতই থেকে যাচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্যের অধিকারও পূরণ হচ্ছে না। এসব কারণেই তাদের মানব উন্নয়ন সূচক খুবই নিম্নমানের থেকে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জীবনে থেকে যাচ্ছে নানারকম দুঃখ ও বঞ্চনা।

এসব বঞ্চনা থেকে তাদের মুক্তি দিতে চাইলে জাতীয় নীতিমালা বিশেষ করে বাজেটে তাদের উন্নয়ন অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্রের সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত করবার উদ্যোগ বাজেটের মাধ্যমেই নিতে হবে। সেজন্যে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তাদের মতামত নিতে হবে। ইকো পার্কের মতো প্রকল্প ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে চলবে না। সুখের কথা, জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) আদিবাসীদের এসব সমস্যার কথা স্বীকার করেছে এবং কী কী পদক্ষেপ নিলে এসবের মোকাবেলা করা সম্ভব তারও ইঙ্গিত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এসব কথা শুধু নীতিতে থাকলেই কি আদিবাসীদের দুঃখ ও বঞ্চনার মোচন হবে? এসবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন না করা গেলে এসব ভালো ভালো কথা শেষপর্যন্ত অন্ত ঃসারশূন্যই থেকে যাবে।

[গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।]

বাংলাদেশে জাতিগত সমস্যা

আ বে দ খা ন

বর্তমান বিশ্বে একজাতি একরাষ্ট্র কোথাও নেই বল্লেই চলে। প্রায় সকল দেশই একাধীক জাতি এমনকি বহুজাতি নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশও বহু জাতির দেশ। প্রশ্ন হল বহুজাতির স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কি বহুদৃষ্টিভঙ্গী পোষন করবে? না, সেটা নিশ্চয়ই কোনো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যখন কোনো ভূ-খণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে তখন থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের নিশ্চিত করা দরকার যে, সে-রাষ্ট্রের সকল জাতির ওপর প্রশাসনিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, মানবাধীকারগত ইত্যাদি দায়-দায়িত্ব যেন সমানভাবে কার্যকর থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার সঙ্গে যে নামটি সবার আগে উঠে আসে, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে বসবাসকারী সকল জাতির প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী লালন করেছিলেন।

সন্তু লারমার বড় ভাই মানবেন্দ্র লারমা তৎকালীন সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের আবেদন জানিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "তোরা সবাই বাঙালি হয়ে যা"। অনেকে এই কথাটিকে কোট করে বঙ্গবন্ধুকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। আসলে সেই সময়ে পাকিস্তান-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের মূল স্পিরিট হিসেবে বাঙালিত্ব বোধ-ই ছিল প্রধান চেতনা। সেই অবস্থায় অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বাঙালি বোধ ক্রিয়াশীল ছিল না, ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীকে অবহেলার চোখে দেখা, তাদের খাটো করে দেখা কিংবা অবজ্ঞা করা– এসব বঙ্গবন্ধুর মধ্যে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তোরা বাঙালি হয়ে যা– এমন একটি কথা বঙ্গবন্ধু হয়তো সেই সময়ের মূল স্পিরিট-এর সঙ্গে এসে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে আহ্বান জানানোর জন্যই বলেছিলেন, তবে নিশ্চয়ই সেটা আদিবাসীদের নিজস্বতা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু মানবেন্দ্র লারমাকে অবশ্য এধরনের একটি কথা কেজুয়ালিও বলে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল, বঙ্গবন্ধু কখনো আদিবাসীদের বিরুদ্ধ শক্তি ছিলেন না; এধরনের কোনো একটি প্রমাণও কেউ হাজির করতে পারবেন না।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের ওপর শোষণ-এর নজির মোটা দাগে শুরু হয়েছিল পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ-এর মধ্যে দিয়ে। ওই বাঁধ দেয়ার ফলে পাহাড়িদের ভীষণ রকমের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের হাতে আদিবাসীদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়। প্রায় চার লক্ষের মত দরিদ্র এবং উচ্ছৃঙ্খল সমতলবাসীদের জিয়াউর রহমান আসলে পাহাড়িদের জমিতে নিয়ে বসতি গড়তে দেয়া হয়। ফলে বাংলাদেশে জাতিগত দ্বন্দ্বের চরম একটি পর্বের সূত্রপাত হয়। এসময় সমতলবাসী উচ্ছৃঙ্খল বাঙালিরা আদিবাসিদের জমিজমা দখল করতে শুরু করে, তাদের নারীদের সম্ভ্রম কেড়ে নিতে উদ্যত হয় এবং সর্বোপরি ওদের কৃষ্টির ওপর নানা রকম আঘাত হানতে শুরু করে। এতে করে আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে যেতে আরম্ভ করে। অথচ সরকার তখন পাহাড়িদের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়নি বরং সেই সরকারের প্রশাসন-আর্মিও পাহাড়িদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পাহাড়িদের ওপর আর্মি ও সমতলবাসীদের যৌথ লুটপাটের ফলে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়। জমা-জমি, ঘর-বাড়ি, বৃক্ষ, ফল-মূল-ফসল সবই লুটপাটের মাধ্যমে আর্মিরা জবর দখল করত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে শুরু করে, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমলে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যে শোষণ-নির্যাতন আদিবাসীদের ওপর হয়ে আসছিল, তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে একটি প্রধান উদ্যোগ হল ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি। শান্তিচুক্তির মাধ্যমেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম নিরাপদ জীবনের স্বাদ এবং আশ্বাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি দ্বিতীয় জিয়া অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়ার সরকার পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ায় সেই শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। এর ফলে শান্তিচুক্তির সঙ্গে চেতনাগতভাবে যারা জড়িত ছিলেন স্বাভাবিকভাবে তারা তাদের স্বপ্ন ও করণীয় উদ্যোগ থেকে দূরে ছিটকে পড়েন।

আর্মিদের মধ্যে যারা উচ্ছৃঙ্খল এবং অপরাধী, অধিকাংশ সময়ে তাদেরকে পাহাড়ে বদলি করা হয়। কাজেই এধরনের আর্মি সদস্যরা সেখানে গিয়ে নানা রকম অসামাজিক অপকর্ম করে থাকে। উল্লেখ্য পাহাড়ের কোনো কোনো গোত্রের নারীরা এখনোও উর্ধ্বাঙ্গে কোনো কাপড় পরিধান করে না– উচ্ছৃঙ্খল আর্মি সদস্যরা এধরনের সরল নারীদের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়ে থাকে– এটা পাহাড়ি সমাজে প্রায় প্রাত্যহিকভাবে ঘটছে।

এছাড়া আদিবাসিরা বৃক্ষকে দেবতা মনে করে। অথচ সে বৃক্ষ নিধন করে দেবতা-বধ-এর মতো কষ্ট তাদেরকে দেয়া হয়। জমি-জমা সংক্রান্ত বিশ্বাসও তাদের প্রকৃতির মতোই; সূর্য যেমন সবার জন্য সমানভাবে আলো ও তাপ দেয়ার জন্য উঠে, একইভাবে জমি-জমাকেও ওরা প্রকৃতির দান হিসেবে নিজেদের ব্যক্তি-মালিকানায় নিতে না-রাজ। ওদের প্রকৃতিপূজার মধ্যে বৃক্ষ, সূর্যপূজার মতো মাটিকেও পূজা করে। সেই নমস্য মাটিকে নিজের মালিকানায় নেয়ার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। সুতরাং ওদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না-হয় রাষ্ট্রকে সেভাবেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ওপর যে ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবিচার করা হয়েছে তাতে মানবতা সেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

আদিবাসীদের ওপর যে আগ্রাসন সেটা বিশ্ব আগ্রাসনেরই একটি রূপ। শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সাম্রাজ্যবাদ একেক সময় একেক চেহারা নিয়ে হাজির হয়; সাম্প্রদায়িকতার চেহারায়, কখনো বর্ণবাদের চেহারায় আবার কখনো জাতিগত দ্বন্দ্বের চেহারায় আবির্ভূত হয়। কাজেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ অর্থাৎ যে-কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই আদিবাসী বা অধস্তন কোনো জাতির ওপর অবিচার-অমানবিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি। সুতরাং এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রকে বৈষম্যমূলক সকল ধরনের কর্ম-প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাঙালি ও আদিবাসী সমস্যার সঙ্গে সকল বাঙালি নির্যাতকের ভূমিকায় রয়েছে, তা কিন্তু নয়। গুটিকয় মানুষ ও প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব। বর্তমানে আদিবাসীদের অবস্থা ভালো না, কেননা শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন সে-অর্থে হয়নি তাই এর সুফলও আদিবাসিরা পায়নি। তবে যে-সরকারের আমলে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, সেই সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন; ফলে আমরা আশা করতেই পারি এই সরকারের আমলে শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটবে এবং এর সুফল সকল আদিবাসী পেতে শুরু করবে।

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি হওয়ার পরে খালেদা জিয়ার আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী সাত বছর রাষ্ট্র-ক্ষমতা চলে যায় শান্তিচুক্তি বিরোধীদের হাতে। এমতাবস্থায় শান্তিচুক্তিকে নানাভাবে বিতর্কিত করা হয়েছে, প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। শান্তিচুক্তি যাতে বাস্তবায়িত না হতে পারে, সে জন্য যত রকম কুৎসা ও ষড়যন্ত্র এর বিরুদ্ধে করা যেতে পারে– তাই করা হয়েছে।

আদিবাসিরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য একসময় যে-আন্দোলন শুরু করেছিল, এমনকি শসস্ত্র আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল নিজেদের অধিকার অর্জন। অথচ তাদের সেই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নেতাগণ এবং সেই সকল নেতাদের সহযোগে শিক্ষিত ধনী আদিবাসীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চাকমারা নিজেদেরকে অধিক উচ্চাসনে আসীন করেছেন। অর্থাৎ আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে এখন শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অঙ্কুরোদগম করা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক বেশি অগ্রগামী; শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে চাকমারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত চাকমাদের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রায় বাঙালিদের মতই হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদিবাসিদের জাতীয় ঐক্য এসব কারণে অনেকটা চিলেচালা হয়ে যাচ্ছে।

এতে করে তাদের জাতীয় অধিকার আন্দোলন গতিহীন হয়ে পড়ছে এবং অধিকাংশ সাধারণ আদিবাসির ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দিনে দিনে আরও ফিকে হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এক সরকার কিছুটা ভালো কাজ করে গেলেও পরবর্তী সময়ে ভিন্ন মতাদর্শের সরকার ক্ষমতায় আসীন হলে পূর্বের ভালো সিদ্ধান্তগুলোও বাতিল করে দেয়া হয়। শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। তবে এখন যেহেতু এই চুক্তির পক্ষের সরকার ক্ষমতায় আছেন, কাজেই এবার শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটবে– এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই আশাবাদী হতে পারি।

[লেখক: সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ।]

প্র ব ন্ধ

‘আদিবাসী’-বাঙালি বিরোধের স্বরূপ

আ বু ল বা র কা ত

আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা

বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার রাষ্ট্র নয়। সরকারি হিসেবে এ দেশে জনসংখ্যার ১.২% মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) ৩২টি (৪৮টি পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে) বিভিন্ন আদিবাসী নিয়ে গঠিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে “আদিবাসী মানুষ” হিসেবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা ও সংস্কার প্রশ্নে একথা স্বীকার করা উচিত যে তাদের ভূমি-বন মালিকানা বিশেষত “সার্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার” (common property rights) বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত। আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ঐ ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের

ভূমি অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তা-ও সহজে হরণ-যোগ্য। অন্যের দ্বারা এদের ভূ-সম্পত্তির জবরদখল যথেষ্ট বিস্তৃত। সমতলের সাঁওতালদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে জোর তালে চলে। সাঁওতালদের ৭২% এখন ভূমিহীন। আর পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের অবস্থা আরও খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছেন ভূমি-বনাঞ্চল আর সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫%, আর এখন তা মাত্র ৪৭%। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তিচুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কোনো ভূমি কমিশন নেই। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরীভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

প্রান্তিকতার যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই জাতীয় দৈনিকে এসব খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে। "নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা" শিরোনামে লেখা হয়েছে "সোমবার সকালে পত্নীতলা উপজেলার উত্তর কাজিপাড়া আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা ওই পল্লীতে বসবাসরত আদিবাসী নারী-পুরুষদের বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে। সেই সঙ্গে আদিবাসীদের অন্তত ২৪টি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে চালিয়েছে ভাংচুর ও লুটপাটসহ সন্ত্রাসী তাণ্ডব। এ ঘটনায় মহিলাসহ ১৫ আদিবাসী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে থৈয়, তারা, শান্তি, সুখো, মালতি ও শান্তিকে সাপাহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পত্নীতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ইউপি মেম্বার হেলালউদ্দিন, মতিবুল, আজিজার, লুৎফর রহমান সাগর নামে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, উপজেলার দিবর ইউনিয়নের উত্তর কাজিপাড়ায় প্রায় অর্ধশত আদিবাসী পরিবার পাকিস্তান আমল থেকে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে ওই পাড়াটি আদিবাসী পল্লীতে পরিণত হয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আদিবাসীরা পল্লীর পুকুরপাড়ে কেউ ঘর তুলে, কেউ-বা ফসল ফলিয়ে ভোগ দখল করে আসছিল। হঠাৎ শেখপাড়া গ্রামের ইদ্রিস আলী মাস্টার পুকুরপাড়ের জমি ১৯৯১ সালে সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিয়েছেন বলে দাবি করেন। এতে ভূমিহীন আদিবাসীরা তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু রক্ষার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে ছোটাছুটি করে। এ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা নিরসন করতে পত্নীতলা থানা পুলিশ উভয় পক্ষকে থানায় ডেকে বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়ার প্রস্তাব দেয় এবং মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এর এক পর্যায়ে

সোমবার সকাল ৭টায় ইদ্রিস আলী মাস্টার ও তার ভাই আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে ওই পল্লীতে সশস্ত্র হামলা চালায়। ঘটনার পর পত্নীতলার ইউএনও আব্দুল মান্নান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা খোলা আকাশের নিচে অনাহারে অর্ধাহারে অবস্থান করছে। এ ঘটনায় আদিবাসীদের পক্ষে পত্নীতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)।

আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত
হয়েছে (ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে) তা পূর্ণভাবে (কোনোভাবেই খণ্ডিত নয়) এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

২. শান্তিচুক্তির যে সকল ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনও কার্যকরী হয়নি সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া, যেমন ভূমি কমিশন সক্রিয় করা।

৩. আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার, স্থানীয়
শাসন ও ঐতিহ্যগত শাসনকাঠামোর সর্বোচ্চ সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা।

৪. জোরপূর্বক দখলকৃত পাহাড়ি জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি-শান্তি চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া মোতাবেক– ভূমি কমিশনে প্রেরণ ও সমাধান করা।

৫. সমতল ভূমির যে সকল বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন– তাদের স্বেচ্ছায়
সমতল ভূমিতে ফিরে আসার জন্য প্রণোদনা দেয়া।

৬. সমতল ভূমির বাঙালি বসতি স্থাপনকারী অথবা বসতি নন, বন বিভাগ, সেনা বিভাগসহ
সরকারের এজেন্সি (উন্নয়ন প্রকল্পসহ) কর্তৃক ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ভূমি-বন অধিগ্রহণ
এখন থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (complete moratorium)।

৭. আদিবাসী মানুষের ভূমি-অধিকার (যা আংশিকভাবে CHT Regulation 1900-এ স্বীকৃত) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ
নেয়া।

৮. ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির সাথে ভূমি কমিশন আইন ২০০১-এর যে সব ধারা সাযুজ্যহীন সেগুলো সংশোধন করা (শান্তিচুক্তি অনুযায়ী)।

৯. পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা নন অথচ রাবার চাষসহ অন্যান্য প্লানটেশন চাষের জমি নিয়েছেন

এবং গত ১০ বছর চাষাবাদ করছে না এমন সব চুক্তি বাতিল করা।

১০. আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া।

১১. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

১২. আদিবাসীদের ভূমি জোরদখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

১৩. বনের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা ও বনবিভাগের হয়রানি মামলা প্রত্যাহার করা।

১৪. ইকো পার্কের নামে বন উজাড় বন্ধ করা।

দুই.

সরকারি অবকাঠামোগত স্থাপনার মাধ্যমে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্নায়ন

ইউএসএইড (USAID)-এর দ্বিপাক্ষিক ঋণের মাধ্যমে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩-এ পাঁচ বছরে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে যে কৃত্রিম হ্রদ নির্মিত হয়, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট কৃষিজমির ৪০ শতাংশ বিনষ্ট হয়। হ্রদে পরিণত হওয়া প্রায় ২৫০ বর্গমাইল জমিকে ঐ এলাকার শ্রেষ্ঠ কৃষিভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে কাপ্তাই বাঁধ কার্যত আদিবাসীদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং গভীরতম মনোবেদনার কারণে পরিণত হয়েছিল। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ আদিবাসী, যাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকমা, উচ্ছেদ হয়েছিল। গাণিতিকিভাবে এ পরিসংখ্যানের অর্থ হল দেশের মোট উপজাতীয় জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ একটি মাত্র প্রকল্পের মাধ্যমেই দু'তিন বছরের মধ্যে উচ্ছেদ হয়ে যায়। উচ্ছেদকৃত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং বিকল্প বাসস্থান, দু'টোরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ বহু বছর পর দেখা গেল উচ্ছেদকৃত ১ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৬০ হাজার পরিবার কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং প্রায় ১০ হাজার পরিবারকে বাঁচার তাগিদে সীমানা পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ভূমি মালিকানা স্বত্বের অভাবে ৮ হাজার ঝুমিয়া পরিবারের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ এসব পরিবার কাপ্তাই বাঁধের পানিতে প্লাবিত হয়ে যাবার আগে পাহাড়ের পাশের জমিগুলোতে চাষাবাদ করত। এসব পরিবার এ কারণে সম্পূর্ণ নিঃসহায় হয়ে পড়ে। কাজেই কাপ্তাই বাঁধ প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তার মূল উৎপাদন উপকরণ (MEANS OF PRODUCTION) এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়, তথা কৃষিজমি থেকে উৎখাত করে। উল্লেখ্য যে, এ বাঁধ নির্মাণের আগে কোনো ধরনের সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা বা গবেষণা (SOCIAL IMPACT STUDY) করা হয়নি। উপরন্তু এ নির্মাণের পর কানাডীয় ফরেস্টাল ইনকরপোরেটেড (CANADIAN-FORESTAL INCORPORATED)-কে দায়িত্ব দেয়া হয় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকার/পার্বত্য এলাকার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং উপজাতীয়

সমাজের ওপর এ বাঁধ নির্মাণের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ গবেষণা অবশ্য স্বভাবতই প্রকাশ করে যে এই বাঁধ নির্মাণের পূর্বে–

"উপজাতীয় মানুষজন ভৌত পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যথেষ্ট সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মান অর্জন করেছিল এবং (বাঁধ নির্মাণ জনিত) উৎখাতের পর অতি চাষাবাদের এক দুর্যোগময় চক্র জমির উর্বরতা হ্রাস, বনায়ন নাশ এবং বিদ্যমান জমির আরও ক্ষয় এবং বর্ধিত চাপ সৃষ্টি করে।

(FORESTAL SURVEY, ১৯৬৭, ভলিউম ১, পৃ. ৫২)

এই বনায়ন গবেষণা যে সব সুপারিশ করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

র) জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং

রর) নতুন উদ্যানভিত্তিক উৎপাদন (HORTICULTURE PRODUCTUON) শুরু করা উচিত।

এসব সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, অথচ তাতে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের তেমন কোনো উপকার হয়নি। কারণ ফল উৎপাদন দ্বারা ধান চাষকে প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনার কারণে মানুষ ফলের বাগানে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং তারা ধানী জমিতে কাজ করার সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে বার বার খাদ্য উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়। স্বাভাবিক পরিণামে অল্পদিন পরেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে অনাহার এবং দুর্ভিক্ষাবস্থার (সংবাদ পাওয়া যায়)/ সৃষ্টি হয়।

কৃষি জমি হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দ্বিমুখী চাপে জুম চাষের যে চক্র আগে দশ থেকে পনের বছর ছিল, তা দু' থেকে তিন বছরে নেমে আসে। ফলে বাস্তুসংস্থানের ধ্বংস/ বিনাশ সূচিত হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি প্রকাশ (ADB) করে–

'বাস্তুসংস্থানগত ক্ষয়ক্ষতির সমাজ-বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ও জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিহিত রয়েছে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের (WELFARE MEASURES) (কাজের বিনিময় খাদ্য) ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যার মধ্যে এবং পূর্বের প্রকল্পের বড় বড় ব্যর্থতার পরেও সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত পরিবারের সংখ্যার মধ্যে।

(এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক/ Asian Development Bank, ১৯৭৬)

কাজেই কাপ্তাই প্রকল্প হল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ বা সুবিধা না দিয়েই তাদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত স্থানান্তরের একটি উদাহরণ। এই প্রকল্পের অধীনে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের প্রায় সবটুকু পার্বত্য এলাকার বাইরে শহরাঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। ১০ শতাংশেরও কম উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার সুযোগ পেয়ে থাকে। অন্যান্য সুবিধাভোগীরা হল সরকার, অফিস আদালত, থানা এবং সামরিক ব্যারাক। চাকমাদের মধ্যে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে শতকরা ৬৯ ভাগ চাকমা মনে করেন কাপ্তাই বাঁধ তাদের খাদ্য সমস্যা এবং আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি

করেছে। শতকরা ৯৩ ভাগ চাকমা মনে করেন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের আগেই ভালো ছিল (চৌধুরী প্রমুখ, ১৯৭৯ পৃ. ৩১)।

এই এলাকার বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্ণফুলী কাগজের কলের ৬০০০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৪০ জন পাহাড়ি। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিল্পায়ন, অবকাঠামোগত বা কৃষিভিত্তিক কোনো ধরনের প্রকল্পই আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম কোনো রকম উপকার করেনি। বরং এগুলো তাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। তাই ১৯৭৬ সালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে দেয়া পাবর্ত্য এলাকার মানুষের মেমোরেন্ডাম ন্যায্যত উল্লেখ করে–

'বিদ্যুৎ লাইনের তার দিয়ে কেবল বিদ্যুৎই নয়, বরং উপজাতীয় মানুষের কষ্টের দীর্ঘনিশ্বাসও বাহিত হয়।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসত স্থাপনের মাধ্যমে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নায়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত উপাত্ত স্পষ্টতই প্রতীয়মান করে এখান থেকে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিত বর্হিগমন (Out-migration) এবং বাঙালিদের (প্রধানত অন্যান্য জেলার ভূমিহীন) সংস্থাপনকারীদের পরিকল্পিত অন্তর্গমন (In-migration) আদিবাসী সংখ্যালঘুদের নিজভূমি থেকে বিচ্ছিন্নায়নের অন্যতম প্রধান উপায় হল পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের স্থাপনা তৈরি, যা ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্থিতাবস্থা (Special Status) রহিত করার পর শুরু হয়েছে। এ বিষয়টি বোঝা যায় যে তথ্যের মাধ্যমে, তা হল ১৯৬০ সালে বাঙালি জনসংখ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ ছিল। ষাট দশকের শুরুর দিকেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে সরকারি নীতিমালা তাদের নিজ ভূমিতে সংখালঘু করে দিচ্ছে।

১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ সরকার পরবর্তী বছরে ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধান বাঙালি সংস্থাপনকারী/ অভিবাসী (BANGALEE SETTLERS) দের সদস্য করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যার প্রধান ছিলেন ডেপুটি কমিশনার।[১] প্রধান বাঙালি সংস্থাপনকারীদের মধ্য থেকে এ কমিটির এজেন্ট বা দালালদের দায়িত্ব দেয়া হয় ভূমিহীন বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ করার যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসতি স্থাপন করতে আগ্রহী, আর তার বিনিময়ে প্রত্যেক নতুন বসতি স্থাপনকারী পরিবারের জন্য ৫ একর করে জমি এবং ৩৬০০ টাকা করে দেওয়া হত। এই স্কিমের অধীনে ১৯৮০ সালে সরকার আরও ১ লক্ষ বাঙালিকে সমতল থেকে পার্বত্য এলাকায় এনে পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে ১৯৬০ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বাঙালির পার্বত্য এলাকায় বসতি

স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল সরকারি কর্তৃপক্ষের তা সফল ভাবে অর্জিত হয় [সারণি ১ দেখুন]। ঐ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে 'বাঙালিকরণ' (BENGALIZATION)-এর প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং বাঙালিরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানের জমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে অবস্থান লাভ করে। ত্রিপুরার সীমানায় অবস্থিত ফেনী উপত্যকায় ১৯৮০ সালের মাঝে ১৮ হাজার বাঙালি পরিবার এবং মোটামুটিভাবে দেড় হাজার পাহাড়ি পরিবার ছিল। জেলার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মায়ানী উপত্যকায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু মানুষ এবং ১০ হাজার বাঙালি ছিল, যাদের অধিকাংশই ১৯৮০ সালে উপত্যকায় আসে। চেঙ্গী উপত্যকায় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে স্থাপিত বাঙালি বসতবাটিগুলোতে ১৫০০ বাঙালি পরিবার থাকত। একই সময়ে কাপ্তাইয়ে ১০০০ বাঙালি পরিবার এবং রাঙ্গামাটিতে ৫০০০ বাঙালি পরিবার ছিল। রাঙামাটির শহরের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ ছিল পার্বত্য মানুষ। ১৯৮০ সালে লামা থানায় ৩০০০ বাঙালি বসতি সস্থাপন করে।

১৯৮০ সাল প্রায় ২৫ হাজার বাঙালি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় দফায় বাঙালি পুনর্বাসনের/ সংস্থাপনের অনুমোহন দেওয়া হয়, যার অধীনে ২ লক্ষ ৫০ হাজার বাঙালি পরিবারের পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করবার কথা। অন্যদিকে এই একই সময়ে হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার, যারা ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কাপ্তাই বাঁধের কারণে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তারা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক বা ভূমি ক্ষতিপূরণ পাবার বৃথা চেষ্টা করছিল। আর এহেন সংস্থাপন পরিকল্পনার সর্বশেষ ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে ১৯৮৭ সালের শেষে তারা এলাকার মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশে এসে পৌঁছায়।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে কৃষিজমি থেকে উৎখাতের ফলে এবং বহিরাগত বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের আবাস স্থাপনের ফলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার্জনের কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষি এবং অকৃষি-এ দুই পেশাগত শ্রেণীতে বিভক্ত করলে দেখা যায় ১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮৬.৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল, অথচ ১৯৮১ সালে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৯.১ শতাংশে। (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩, পৃ. XLVII (৪৭)) একই সময়ে কৃষিকাজের অভ্যন্তরীণ শ্রম বিভাগে দেখা যায় ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ সালে মালিক এবং বর্গাদার/বর্গাচাষি কৃষকের সংখ্যা ৮ গুণ কমেছে। অপর পক্ষে একই সময় কালে বর্গাচাষির সংখ্যা ৩ গুণ বেড়েছে। (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৯, পৃ. ৬৪)। এই পরিসংখ্যান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা/ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে যে দারিদ্র্যায়নের সৃষ্টি হয়েছে, তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সংখ্যালঘু এবং বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের বিরোধের মূল কারণ হল একটি নিম্নতর উৎপাদনের প্রকরণের ওপর উচ্চতর উৎপাদন প্রকরণের আধিপত্য বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ। আর এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজন (The centre of International capitalistic division of labour)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বিরোধ একদিক যেমন হল ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন দু'টি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিরোধ এবং অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতায় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকা আর না-থাকা দু'টি সম্প্রদায়ের বিরোধ। তাই প্রকৃতিগত ভাবে এ বিরোধ অর্থনৈতিক। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি-অধ্যুষিত করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের যুক্তি এবং এ এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রচার অযৌক্তিক ও উপকথাময়। আদিবাসী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের লক্ষ্য সরকারের এ সব নীতির মাধ্যমে কোনো ক্রমেই সাধিত হয় না।

সারণিঃ ১

সরকারি স্কিম/পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল থেকে আগত সম্ভাব্য বাঙালি বসতি স্থাপনকারী/সেটলারদের সংখ্যা, ১৯৬০-৮৭

বছর/ সাল	সম্ভাব্য বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা
১৯৬০-১৯৬৯ (কর্ণফুলী বাঁধ, কর্ণফুলী কাগজ কল ইত্যাদি)	১,০০,০০০
১৯৭৯	৩০,০০০
১৯৮০	১,০০,০০০
১৯৮২	২,৫০,০০০
১৯৮৭	১,০০,০০০
মোট	৫,৪০,০০০
পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ (%) (যদি মোট জনসংখ্যা ১ মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ হয়)	৫৮ শতাংশ

টীকা

১. ডেপুটি কমিশনার হলেন জেলার প্রশাসনিক প্রধান।

[এই রচনার প্রথম অংশ আবুল বারকাত বাংলায় লিখেছেন। দ্বিতীয় অংশ ইংরেজিতে যৌথভাবে লিখেছেন আবুল বারকাত ও শামসুল হুদা যা হোমায়রা আহমেদ অনুবাদ করেছেন।]

[লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।]

অধিকতর 'উন্নয়নের' আগমনধ্বনি: পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক গতিশীলতার স্বরূপ

আনু মুহাম্মদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন প্রশ্ন বিবেচনা করতে গেলে একদিকে যেমন তার সাধারণ দিক অর্থাৎ বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখতে হবে অন্যদিকে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য শুধু অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি এই অঞ্চলের মানুষের জাতিগত ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সমাজের গঠন ও নিয়মনীতি, মালিকানার বিশেষ ধরন, অঞ্চল ও মানুষের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ইত্যাদি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করেই বিদ্যমান। কাজেই আমরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা আলোচনা করতে যাই তখন প্রচলিত অর্থনীতির প্রথাগত প্রত্যয়, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, বিশ্লেষণের কাঠামোর দুর্বলতা এবং স্ববিরোধিতা আরও প্রকট হয়ে উঠে। অঞ্চলের সঙ্গে মানুষকে তার সমগ্রসহ বিবেচনা করতে গেলে মুনাফা সর্বোচ্চ করবার অর্থশাস্ত্র একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এই অর্থশাস্ত্র, যা নয়া ধ্রুপদ অর্থশাস্ত্র নামে পরিচিত, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর প্রবল পৃষ্ঠপোষকতায়

দাপটের সঙ্গে, যদিও সাম্প্রতিক চেহারা একটু বিধ্বস্ত, রাজত্ব করছে। এর প্রভাব আমাদের দেশের সরকার তো বটেই এমনকি অর্থনীতিবিদদের ওপরও প্রায় নিরংকুশ। এই অর্থশাস্ত্র মানুষকে অবিভাজ্য অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিবেচনা করে। মানুষ এই অর্থশাস্ত্রে শুধুই এক একটি অর্থনৈতিক এজেন্ট, এক-একটি চলক। মানুষের শ্রেণীগত, লিঙ্গীয়, বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক জীবনের এই পার্থক্যগুলোর তাৎপর্য এই অর্থশাস্ত্র অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং এই বিবেচনা এতই আগ্রাসী যে, তা বস্তুত প্রবল জাতি, প্রবল শ্রেণী ও প্রবল লিঙ্গের বাইরে অন্য সকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সব বৈচিত্র্য বা 'অন্য' সকল অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে প্রবল বা অধিপতি বা আরও নির্দিষ্ট অর্থে নিপীড়ক গোষ্ঠীর একক অস্তিত্বই হয়ে দাঁড়ায় তখন মাপকাঠি। বৈশ্বিক কাঠামোতে একই অর্থশাস্ত্রীয় আধিপত্যে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোও তার মানুষদের নিয়ে আড়াল হয়ে যায়। এরকম অর্থশাস্ত্রের আধিপত্য পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের অস্বীকার করত এখন করে অবাঙালি 'সংখ্যালঘু'দের। নারী ও অন্যান্য শ্রেণীর আড়াল হয়ে যাওয়া তো অব্যাহত প্রক্রিয়া। এই অবস্থা শুধু অর্থনৈতিক আধিপত্য নয়, মালিকানা ব্যবস্থা, জাতি-বিদ্বেষী, বর্ণবাদী, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শকেও প্রতিফলিত করে। কিন্তু এসব বিষয় আড়াল করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন আলোচনা করা প্রতারণামূলক বা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপট

যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে সহিংস অবস্থা বিরাজ করছে তবুও এ বিষয়ে দেশব্যাপী মনোযোগ এসেছে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়কে কেন্দ্র করে, বিশেষত '৯৭-এর মাঝামাঝি থেকে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই এলাকার ব্যাপারে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। এই চুক্তি সকল পাহাড়ি জনগণ বা সকল গণতান্ত্রিক শক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি বিভিন্ন কারণে। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবে এখানে এতটুকু বলা যায় যে, এই চুক্তি বা সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকগুলো প্রশ্ন মীমাংসিত হয়নি। ৬০ দশকে 'উন্নয়ন' ধাক্কা এবং ৭০ দশকের শুরুতে মতাদর্শিক অস্বীকৃতি থেকে যে সমস্যার শুরু তা অব্যাহত থাকছে। অশান্তি সৃষ্টিকারী, নিপীড়নকারীদের বিচার, প্রায় ২৫ বছরের উন্নয়ন বরাদ্দের হিসাব, শতশত এমনকি হাজার একর জমি বন্দোবস্ত নিয়ে অনুপস্থিত ভূস্বামী হিসেবে আবির্ভূত শক্তিসমূহের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার নামে বন উজাড় করে কোটি কোটি টাকার কাঠের ব্যবসার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা, বাঙালি ছিন্নমূল বসতিস্থাপনকারীদের ভবিষ্যৎ, কল্পনা চাকমার অপহরণ ও এরকম আরও অনেক ঘটনার স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, এলাকার বিশেষ মালিকানার ধরন গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো বক্তব্য চুক্তিতে নেই।

ছক : ১

৯০ দশকের শুরুতে আদশশুমারি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতিসত্তার জনসংখ্যা

জাতি	জনসংখ্যা
বংশী	২১১২
বোম*	৬৯৭৮
বুনা	১৩৯১৪
চাক*	২০০০
চাকমা*	২৫২৯৮৬
কোচ	১২৬৩১
গারো	৬৮২১০
হাজং	১১৪৭৭
হরিজন	৬৩
খাসিয়া	১৩৪১২
খেয়াং*	২৩৪৫
খুমু	১২৪১
লুশাই	৬৬২
মাহাতো	৩৫৪৩
মারমা*	১৫৪২১৬
মণিপুরি	২৪৯০২
মুণ্ডা	২১১২
মুরং*	২২১৭৮
ম্রো*	৩২১১
পাহাড়ি	১৮৫৩
পাংখু*	৩২২৭
রাজবংশী	৫৪৪৪
রাখাইন	১৬৯৩২
সাঁওতাল	২০২৭৪৪
তংচইঙ্গা*	২১০৫৭
টিপরা*	১২৪২
ত্রিপুরা*	৭৯৭৭২
উরং	১১২৯৬
উরু	২৪৮১
অন্যান্য*	২৬১৭৪৬
মোট	১২০৫৯৭৮

*প্রধানত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস করেন। এটাই তাঁদের আদিবাস। '৯১-এর আদমশুমারির ভিত্তিতেই এই হিসাব সাজানো হয়েছে, কিন্তু এই হিসাব নিয়ে যুক্তিসঙ্গত আপত্তিও আছে।

** অন্যান্যদের পরিচয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকে পাওয়া যায়নি। এঁরা বিহারি হতে পারেন।

সূত্র : বিবিএস, ১৯৯৬

বিএনপি-জামাতের চুক্তি-বিরোধিতার জাতি-বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক ধরন এবং পত্র-পত্রিকায় তার বিপুল প্রচারের ফলে এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পাহাড়ি জনগণ তাঁদের প্রাপ্য থেকে বেশি অধিকার পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকার এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন। পাহাড়ি জনগণের অধিকারের প্রশ্নটিকে এই দেশে ভারতের ভূমিকার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার একটি চেষ্টা এতে বরং জোর পেয়েছে। পাহাড়ি জনগণের দেশপ্রেম, আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বরাবর এই অঞ্চলে নিপীড়ন যুক্তিযুক্ত করবার হাতিয়ার ছিল (যেমন ভারতে মুসলমানদের, বাংলাদেশে হিন্দুদের দেশপ্রেম কিংবা নারীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা মোক্ষম হাতিয়ার), এখনও আছে।

মূলধারার রাজনীতি ও সংবাদপত্রে, তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি'-তে বিতর্ক এমনভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়গুলোই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শুধু বাঙালির বাসভূমি নয়। এদেশে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্তার এখানে অবস্থান আছে। যেরকম, বাংলাদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু এদেশ শুধু মুসলমানদের দেশ নয়। এখানে অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদেরও বাস আছে। এই বৈচিত্র্যময় বাস্তবতা পুরোমাত্রায় স্বীকার করে না নিয়ে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পুষ্টিলাভ করে সেটাকেই ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে। সেটাই বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, হচ্ছে।

এই বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিলে রাজনৈতিক, আইনগত, সাংবিধানিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনও থাকে। ভূমি ও অন্যান্য ব্যবস্থায় ভিন্ন কাঠামো, আইন ও মালিকানা ব্যবস্থার ভিন্ন রূপের স্বীকৃতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-চর্চা ও শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিফলন। বর্তমান চুক্তিতে এরকম অনেক বিষয়ই ফয়সালা হয়নি।

"উন্নয়ন" এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবর্তনের ধরন

বিশ্বে পুঁজিবাদী উন্নয়নের অভিযান অনেক সময়ই সামরিক আগ্রাসনকে সঙ্গে নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। এগুলোকে সহনীয় করবার জন্য আবার ধর্মকে পাশে রাখা হয়েছে। কেনিয়ার ঔপন্যাসিক নগুগি তাঁর দেশের অভিজ্ঞতার কথা উপন্যাসে আনতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন : "আমরা আদিবাসী আর বিদেশির সাক্ষাতের সময়টা মনে করতে পারি। মিশনারিরা সমুদ্র আর বন দখল করে নিয়েছে, মুনাফার সাধ হচ্ছে তার বিশ্বাস এবং আলো, বন্দুক তার রক্ষাকবজ। তার হাতে বাইবেল, সহযোগী সৈন্যের হাতে অস্ত্র

আর প্রশাসক-বসতি স্থাপনকারীর হাতে পয়সা। ধর্ম, বাণিজ্য, সভ্যতা : বাইবেল, অর্থ, অস্ত্র : পবিত্র ত্রয়ী।" (*পেটালস অব ব্লাড*, ১৯৭৭)

এরকমভাবে যে উন্নয়ন তার অভিজ্ঞতা পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেরই, ব্যবধান সময়ের। বর্ণবাদী, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শকে পুঁজিবাদ তার সম্প্রসারণে বরাবর ব্যবহার করেছে। নিজের নির্মমতাকে মহিমান্বিত করেছে সভ্যতার বিকাশ বলে। আমেরিকায় কলম্বাসের আবিষ্কারের নামে দখল আর গণহত্যা এবং আফ্রিকায় সভ্যতার বিস্তারের নামে স্বাধীন মানুষদের দাসে পরিণত করা, ভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ আর গণহত্যা এগুলো সবই 'উন্নয়নের ইতিহাস' নামে ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। যেকোনো অঞ্চলের পুঁজিবাদী উন্নয়নের ইতিহাস বৈশ্বিক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত। এই নির্মমতার মধ্য দিয়ে এর গতি প্রবলভাবে পুরনো অনেক সম্পর্ক ও ব্যবস্থা পাল্টে দেয়, সৃষ্টি করে অসম বিকাশের এক নতুন অধ্যায়।

যাহোক, এসব 'উন্নয়নের' ঘোরে আটকে থাকতে না-চাইলে এগুলোর ধাক্কায় যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো হিসেবে নিয়েই জনগণকে নিজেদের পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত কয়েক দশকে 'উন্নয়ন', 'সার্বভৌমত্ব রক্ষা', 'বিদ্রোহ দমন' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে যা কিছু করা হয়েছে তা পুরো অঞ্চলের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ধরন, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনগুলোকে নিম্নরূপে সারসংক্ষেপ করা যায় :

১। সামাজিক বা গোষ্ঠীগত মালিকানা যেখানে এমনকি ৭০ দশক পর্যন্তও মালিকানার প্রধান
ধরন ছিল সেখানে এখন ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রাধান্যে চলে এসেছে।
২। আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এই অঞ্চলে রাষ্ট্রের ভূমিকা এখন অনেক প্রত্যক্ষ। আইনগত ও প্রকৃত দু'দিক থেকেই রাষ্ট্র এখানে এখন প্রবল অধিপতি-শক্তি। প্রথাগত 'রাজা' বা 'ট্রাইবাল চিফ'দের ভূমিকা এখন আলঙ্কারিক বা প্রান্তিক।
৩। অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রবল। শুধু শাসক, আমলা, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর লোক হিসেবে নয় অর্থনৈতিক তৎপরতাতেও তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য গত দু'দশকে ক্রমে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।
৪। পাহাড়ি জনগণের শ্রেণী ও পেশাগত বিন্যাসও বদলে গেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। গত দু'দশকে প্রথাগত কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর বাইরে নতুন কর্তৃত্ব তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, পেশাজীবী, প্রবাসী ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন সম্পত্তিশালী কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছে।
৫। ৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে এলাকার পরিবেশ-এর ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তা ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে ৭০ দশকে সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে। পাহাড় ধ্বংসের মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন', টিলা বন্দোবস্ত, রাবার চাষ, কাঠের ব্যবসা

এবং ব্যাপক বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা শুধু পরিবেশ নয় এলাকার সামাজিক শক্তিবিন্যাসেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

৬। বিদ্রোহ দমনের জন্য যে বিদ্যুতায়ন, যোগাযোগ ও পরিবহনের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সমতলভূমির সঙ্গে তার দূরত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। একইসঙ্গে তা পাহাড়ি জনগণের দীর্ঘদিনের অনেক পেশার সুযোগ সংকুচিত করেছে। আবার তা নতুন বিনিয়োগকারীর প্রবেশপথ উন্মুক্তও করেছে।

৭। এলাকার সমাজ-অর্থনীতি গঠন অব্যাহত এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমানহারে তা পুঁজিবাদী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে অঙ্গীভূত হচ্ছে। গ্যাস ও তেল, বন, ফল, পর্যটন, রাবার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা এই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

অর্থনৈতিক বিন্যাস : তুলনামূলক আলোচনা

গত কয়েক বছরে জিডিপির বিভিন্ন খাতে বিকাশ-প্রবণতা থেকে অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি আঁচ করা যায়। কৃষিখাতে যে পরিবর্তন হয়েছে তার শতকরা ৯২ ভাগ এসেছে বন থেকে। এটি এই অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এটা থেকে বন উপখাতে অধিক বিনিয়োগ প্রবাহ অনুমান করা যায়। অবশ্য এই পরিসংখ্যান থেকে বিনিয়োগকারীর পরিচয় কিংবা বিনিয়োগের ধরন জানা সম্ভব নয়, কিন্তু এটা এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বিনিয়োগের প্রধান অংশ কাঠ-বাণিজ্যে যাচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীরা বাঙালি ক্ষমতাবান গোষ্ঠী। এই তথ্য উন্নয়নের বা প্রবৃদ্ধির যে মাত্রা নির্দেশ করে তাতে পরিবেশ ধ্বংস ও জাতিগত প্রান্তিকীকরণকেই নির্দেশ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষিতে আয় বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চাইতে শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি। কৃষি উপখাতের দিকে মনোযোগ দিলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার হয়। শস্য উপখাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবৃদ্ধি জাতীয় গড় থেকে কম, কিন্তু বন-উপখাতে বৃদ্ধির হার শতকরা ২০০ ভাগেরও বেশি। এই অঞ্চলে পশুপালন ও মৎস্য উপখাতেও অধিকতর বৃদ্ধি দেখা যায়। ব্যবসা খাতে অধিক বিনিয়োগ-প্রবণতা সম্পর্কিত বিভিন্ন ছক থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ব্যবসায়ে পুরো এলাকায় বাঙালিদের প্রধান অংশগ্রহণ এখানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

ছক : ২

বিভিন্ন খাত ও উপখাতে পরিবর্তনের ধরন :

সমগ্র বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র

খাত	১৯৮৫-৯৪ সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবর্তনে হার (%)	একই সময়ে পুরো বাংলাদেশে পরিবর্তনের হার (%)
১। কৃষি	১৯৬.৬৯	৬৭.৫৫
ক. শস্য	৩৪.০৮	৪১.৭২
খ. বন	২৫৬.১৮	৭৮.৯৪
গ. পশুপালন	২৭৫.২০	১৩৩.৩৩
২। শিল্প	১৩২.৫০	১৩৪.০৯
ক. বৃহদায়তন	১৭৫.০৬	১৭৫.০০
খ. ক্ষুদ্রায়তন	৮৩.৮০	৮৫.০০
গ. মৎস্য	৪০২.০৮	২২৬.৬৬
৩। নির্মাণ	১৩২.০০	১৩০.৭৬
৪। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি	১০৭৪.৪৬	৫৬৬.৬৬
৫। পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩৯.৮০	১৩৪.৫৪
৬। ব্যবসা-বাণিজ্য	২০৪.২০	১০০.০০
৭। গৃহায়ন	১৬২.১০	১৬২.১৬
৮। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২৪৩.৬২	২২৩.৫২
৯। ব্যাংক, বীমা	১.৫৬	১৩৩.৩৩
১০। পেশাজীবী ও অন্যান্য	৩৩৪.২৫	২৩০.৪৩

সূত্র : বিবিএস, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৯৪, ১৯৯৬

অবকাঠামো এবং ব্যবসা খাতে জাতীয় গড়ের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি বৃদ্ধি দেখা যায়। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুপাত জাতীয় গড়ের চাইতে বেশি। অবশ্য বিভিন্ন গবেষণা, সরকার সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ এবং বাস্তব তথ্যপ্রমাণ থেকে এটা অনুমান করা খুবই সম্ভব যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন এই অঞ্চলেই গেছে, যার হিসাব পুরোপুরি সরকারি পরিসংখ্যানে আসে না।

মধ্য সত্তর থেকে দুই দশকে 'উন্নয়ন খাতে' সরকারি ব্যয় অন্যান্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে বেশি করা হয়েছে। এই উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হল বাঙালিদের জন্য রেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন। কিন্তু এই পুরো উন্নয়নই বরাবর সামরিক ব্যবস্থার অধীনস্থ ছিল, এর নিয়ন্ত্রণও বরাবর সামরিক বাহিনী থেকেই করা হয়েছে। এই অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ এই এলাকায় বিদ্যুতায়ন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদির

সুফল পেয়েছেন কমই কিন্তু এর বোঝা বা ক্ষতি তাদেরকেই টানতে হয়েছে। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাদের অনাস্থা, অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি করেছে।

ছক : ৩
আয়ের প্রধান উৎসের ধরন : একটি তুলনা

আয়ের প্রধান উৎস	"উপজাতীয়" জনগণের শতকরা কত ভাগ*	বাংলাদেশের মোট শতকরা কত ভাগ
নিজ জমি/বর্গাজমি	৪৪.১৪	৪১.০৩
পশুপালন	০.৩	০.৩৭
বন	২.১	০.১৩
জেলে	১.০	১.৩৯
মৎস্যচাষ	০.১	০.১৫
কৃষিমজুর	২৩.৮	১৬.৭৮
অকৃষি-মজুর	৫.০	৩.০৮
হস্তশিল্প	০.৩	০.৬৭
শিল্প ও ব্যবসা	৭.৬	১৪.১৭
হকার	০.১	০.২৯
অযন্ত্রচালিত পরিবহন	০.৪	১.৫০
যন্ত্রচালিত পরিবহন	০.২	০.৫৫
নির্মাণ	০.৬	১.০৪
চাকরি	৬.৮	১০.৭৫
খাজনা/প্রবাস	০.১	০.৪৭
সেবা	৭.৫	৭.৬৪

সূত্র : বিভিন্ন ছক, Bangladesh Population Census; বিবিএস, ১৯৯৪

* বিবিএস-এর ডাটায় দেশের সকল সংখ্যালঘু মানুষদের "উপজাতীয়" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। উপরন্তু তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানও আলাদা করে দেখানো হয়নি। সে কারণে পাহাড়ি জনগণের আলাদা চিত্র পাওয়া যায়নি। তবে উপরের ছক থেকে একটি প্রবণতা অনুমান করা যায়।

আয়ের প্রধান উৎস অনুসন্ধানে 'উপজাতীয়' জনগোষ্ঠী এবং জাতীয় গড় অবস্থান দেখলেও পেশা, দক্ষতা ও আয়ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবনের চেহারা বুঝতে সুবিধা হবে। কৃষি ও অকৃষি মজুরির ক্ষেত্রে যেখানে 'উপজাতীয়'দের অবস্থান বেশি সেখানে

শিল্প-ব্যবসায় তাদের অবস্থান কম। এসব ক্ষেত্রে বাঙালি-পাহাড়ি পরিষ্কারভাবে ভাগ করে না দেখানোতে অনেককিছু অস্পষ্ট থাকে, অনেককিছু আড়াল হয়ে যায়। তবে এই পরিসংখ্যান এবং সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করলে এটা পরিষ্কার হয় যে, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য 'উপজাতীয়' জনগোষ্ঠীও প্রান্তিকীকৃত হচ্ছে।

বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র

এই প্রেক্ষাপট ও পরিবর্তনের ধরনকে বিবেচনায় রাখলে বর্তমান ও আশু ভবিষ্যতে যে বিনিয়োগ-সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার মূল্যায়ন করা আরও সহজ হবে। বর্তমান পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে, পুরনোর ধারাবাহিকতায় এবং নতুনভাবে, যাদের দিক থেকে এবং যেসব খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেগুলো হল নিম্নরূপ :

* বহুজাতিক সংস্থা : তেল, গ্যাস।
* বহুজাতিক সংস্থা, বিদেশি কোম্পানি : পর্যটন, ফল, রাবার।
* এনজিও : ক্ষুদ্রঋণ।
* দেশীয় বাঙালি বৃহৎ ব্যবসায়ী : টিলা, কাঠব্যবসা, ফল, পর্যটন।
* নব্য-পাহাড়ি সম্পত্তিমালিক : ব্যবসা, ঠিকাদারি, পর্যটন।

বিনিয়োগের এসব প্রবণতা কী ধরনের ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে তা বুঝার জন্য বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পটভূমিতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রান্তিক। গ্যাট চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্ভব, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর আধিপত্যের বিস্তার ও কর্তৃত্বশালী অবস্থান বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর এই প্রান্তিক অবস্থানকে আরও নিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী করেছে। তার ফলে এই দেশে বিনিয়োগ ও তথাকথিত সাহায্য এমনকি ক্ষুদ্রঋণের সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

সমগ্র বাংলাদেশে এসব সংস্থার কর্তৃত্বে গৃহীত নানা কর্মসূচি দেশের শিল্পভিত্তি নির্মাণের চাইতে এদেশে তাদের আধিপত্য ও বাজার সম্প্রসারণেই বেশি ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক তৎপরতায় ব্যবসা ও সেবাখাতের প্রসারই সেজন্য এখন প্রাধান্যে। ৯০ দশকের শুরু থেকে তেল ও গ্যাস খাতে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, পুরো বাংলাদেশকে ২৩টি ভাগে বিভক্ত করে ১৫টি বহুজাতিক সংস্থার হাতে দেয়া হয়েছে সমৃদ্ধ ব্লকগুলো। এই বিনিয়োগের ধরন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এইসব ব্লকে তাদের কর্তৃত্বে উৎপাদন যত বাড়বে ততই বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট বাড়বে, গ্যাসের দাম বাড়বে, দেশীয় শিল্পভিত্তি বিপর্যস্ত হবে, সকল দ্রব্যের দাম বাড়ার কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আর বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য আইনি ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির লক্ষণও এখনই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে একইভাবে কিংবা আরও দমনমূলকভাবে দেখা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের নামে বহু টিলা এবং বাগান বরাদ্দ দেয়া আছে। এসব বরাদ্দকে কেন্দ্র করে এখন আরও বিনিয়োগ হতে পারে। কিন্তু এসব বরাদ্দ দিয়ে এই অঞ্চলে পাহাড়ি জনগণের মালিকানার ধরনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের চুক্তিতেও এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়নি। এই বরাদ্দগুলো সরাসরি একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার ফসল, এর বিকাশ তাকে আরও তীব্র করবার শক্তি ধারণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওর বিনিয়োগ আরও বড় আকারে হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতার শুরু ৭০ দশকে। এনজিও তৎপরতার মূল লক্ষ্য বরাবরই বলা হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন। একই লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন ধরনের এনজিও ও ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। লাভজনক বিনিয়োগ হবার কারণে এই খাতে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারি সংস্থাগুলোও ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে তা বিবেচনা করলে চিত্র অন্যরকম দাঁড়ায়। সমীক্ষায় দেখা যায়, গত ৫ বছরে দারিদ্র্য-বিমোচন খাতে সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে শতকরা ৫০০ ভাগেরও বেশি, কিন্তু এই সময়ে দারিদ্র্য কমেছে শতকরা ২ ভাগেরও কম, কোনো কোনো হিসাবে দারিদ্র্য বরঞ্চ বেড়েছে। যে হারে দারিদ্র্য-বিমোচন হচ্ছে তাতে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সহস্র বছর দরকার হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়ে মোট জনসংখ্যা যা ছিল, সাড়ে ৭ কোটি, বর্তমানে ২৫ বছরের দারিদ্র্য-বিমোচন ও ক্ষুদ্রঋণের বিস্তারের পর তার চাইতে বেশিসংখ্যক মানুষ, প্রায় ৮ কোটি, দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। অন্যদিকে একই সময়ে কয়েক হাজার কালোটাকার মালিক কোটিপতির উদ্ভব হয়েছে, এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ একটি লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্র হিসেবে অনেকেই গ্রহণ করেছেন, মধ্যবিত্তের একটি অংশের আয়-উপার্জনের মাধ্যমে হিসেবে এটি এখন গৃহীত। এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য-বিমোচন ও কর্মসংস্থানের এই অভিজ্ঞতা শুধু বাংলাদেশের নয়, অনেক দেশেরই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও তৎপরতা আগে কিছু ছিল, '৯৭-এর চুক্তির পর তারা পুরো অঞ্চলব্যাপী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। ফলাফল কী হবে তা বাংলাদেশের বাকি অঞ্চলের এই অভিজ্ঞতা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

উপসংহার

সবরকম তথ্য, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা, হিসাব-নিকাশ বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টই বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় আকারের এবং বিভিন্ন সূত্রে বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা মনে রাখলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবর্তনের ধারা বিবেচনা করলে এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই বিশাল বিনিয়োগ অঞ্চলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, স্থিতিশীল কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য-বিমোচন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সুবিধার বৈষম্যহীন সম্প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে না। তবে এসব বিনিয়োগ সমাজের পুরনো বিন্যাসের ভাঙন ত্বরান্বিতকরণ, নব্য ধনী সৃষ্টি,

বাণিজ্যিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে অধিকতর অঙ্গীভবন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের সহিংসতা, রক্তপাত, অনিশ্চয়তা, সামরিকীকরণ ইত্যাদির আদি সূত্রপাত ঘটেছিল উন্নয়নের এক বিশাল প্রকল্প, কাপ্তাই বাঁধ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রধানত সমতলের জন্য, কিন্তু পাহাড়ের লক্ষাধিক মানুষ চিরতরে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র সরাসরি এখানকার বিপর্যস্ত জাতিসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সহিংসতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছিল। উন্নয়নের আগ্রাসন এবং জাতিবিদ্বেষী মতাদর্শের আগ্রাসন এভাবেই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। উন্নয়নের আরেক দফা আগ্রাসন আসতে যাচ্ছে, অন্যদিকে বহুল প্রচারিত চুক্তি অস্বীকৃতির মতাদর্শ জারি রয়েছে। জাতিগত এই প্রান্তিকীকরণ এবং জাতিবিদ্বেষী মতাদর্শকে পুঁজিবাদী উন্নয়নের বীভৎস চেহারা যৌক্তিক করতেই হয়তো কাজে লাগানো হবে। কিন্তু এই বৈষম্য ও নিপীড়নের "উন্নয়ন" বরাবর প্রতিরোধেরও সম্মুখীন হয়। এই প্রতিরোধ সমগ্র মানুষকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে তখনই যখন তা অগ্রসর মতাদর্শ ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে।

[লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য সচিব, 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর জাতীয় রক্ষা কমিটি।]

পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রান্তিকীকরণ

র বী ন মে ন্দ র

[The bourgeoisie, by the rapid improvement of all in ments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian nations into civilisation. The cheap prices of its commodities are the heavy artillery with which it batters down all Chinese walls, with which it forces the barbarians' intensely

obstinate hatred of foreigners to capitulate. It compels all nations, on pain of extinction, to adopt the bourgeois mode of production; it compels them to introduce what it calls civilisation into their midst, i.e., to become beourgois themselves. In one word, it creates a world after its own image.

Karl Marx and Fredrick Engels, Communist Manifesto. Marx Engels Seclected Works Volume 1, Foreign Publishing House Moscow 1962.]

[সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতার মাঝে টেনে আনছে সমস্ত জাতিকে, এমনকি বর্বরতম জাতিকেও। তাদের সস্তা পণ্য হল ভারী কামান যার দ্বারা তারা চীনা প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয় ও বর্বর জাতিগুলোর একরোখা জাতিবিদ্বেষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তারা সমস্ত জাতিকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করে। বুর্জোয়ারা যাকে সভ্যতা বলে তাকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করতে অর্থাৎ বুর্জোয়া বনে যেতে তারা জাতিগুলোকে বাধ্য করে। এক কথায়, বুর্জোয়ারা নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে। –কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো।]

জাতিগত নিপীড়ন বা এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির জনগণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদীরা তাদের উৎপাদিত শিল্প পণ্য বিক্রি ও কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় এবং এটা করতে গিয়ে তারা কেবল চীনা প্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধকতা গুঁড়িয়ে দিয়ে "বন্য জাতিগুলোকে" তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে তা নয়, তারা সেই জাতিগুলোকে পদানতও করে। পুঁজিবাদ বহু দূর প্রান্তে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শত শত হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে থাকা অনড় অচল সমাজগুলোকে চুম্বকের মতো তার বাজার-ব্যবস্থায় টেনে নিয়ে আসে এবং ওই সমাজগুলোতে এক অভাবনীয় গতিশীলতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিগুলোর সমাজও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে কিভাবে এই পাহাড়ি সমাজব্যবস্থা প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে তার চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

পুরনো সাম্যবাদী সমাজে ভাঙন

১৭৬০ সালে বৃটিশ আগ্রাসন শুরুর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ধরনের সমাজব্যবস্থা বর্তমান ছিল তাকে এক ধরনের আদিম সাম্যবাদ বলা যায়। সরল উৎপাদন ব্যবস্থাই– যাকে জুম চাষ পদ্ধতি বলা হয়– এই সরল সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। পাহাড়ে প্রযুক্ত এই উৎপাদন পদ্ধতির বলা যায় একমাত্র ও প্রধান হাতিয়ার হল এক পাশে ধারাল হাতল-ওয়ালা লোহার তৈরি দা। সমাজে রাজা উপাধিতে একজন সমাজপতি ও

তার অভিজাতবর্গ[১] ছিলেন, তবে তার কোনো স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। সৈন্যবাহিনী থাকার প্রয়োজন ছিল না, কারণ এটা ছিল শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ, যে সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণে রাষ্ট্র নামক বলপ্রয়োগ ব্যবস্থারও দরকার হয় না। রাজা ও অভিজাতবর্গ কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন, তবে তাকে শোষণ বলা যায় না। তাদের প্রধান কাজ ছিল সমাজে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো দেখা এবং বিচার-আচার সম্পাদন করা। প্রাক-উপনিবেশিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সমাজের বিস্তারিত বর্ণনা T H Lewin -এর লেখায় পাওয়া যায়। তার ভাষায়:

Communal ownership of all material resources, sharing and exchange constituted the cores of their economic as well as cultural values. The concept of surplus and private profit was totally alien to them, for it was a subsistence economy.

[সমস্ত বস্তুগত সম্পদের ওপর সম্প্রদায়গত মালিকানা, ভাগাভাগি এবং বিনিময় হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মৌলিক উপাদান। উদ্বৃত্ত ও ব্যক্তিগত মুনাফার ধারণা তাদের কাছে অপরিচিত, কারণ তাদের অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।]

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনে এই সমাজব্যবস্থা আর ঠিক থাকতে পারেনি। বৃটিশদের যে একটি পদক্ষেপ এই সমাজের ভাঙনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তা হল হালচাষ পদ্ধতির প্রবর্তন। বৃটিশরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। উৎপাদনের এই নতুন প্রযুক্তি সমাজে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে– যার আত্মসাৎকারী হল বৃটিশ ও বাঙালি মধ্যসত্ত্বভোগী, এবং পাহাড়িদের বিশেষত চাকমাদের সমাজে এনে দেয় শ্রেণী-বিভাজন। যারা হালচাষি তারা জুমচাষিদের তুলনায় অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়, যদিও তাদের মধ্যেও পরে স্তরভেদ দেখা দেয়। এ প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্মনেয় মধ্য-শ্রেণী যে শ্রেণীর শিক্ষিত অংশটি পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৃটিশ শোষণ

মোগল আমলে পাহাড়িরা কর প্রদানের বিনিময়ে চট্টগ্রাম সীমান্ত এলাকায় বাজার-সুবিধা লাভ করত (তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম ছিল কার্পাস মহল)। ১৭৫৭ সালে বাংলা অধিকারের পর বৃটিশরা এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। এই করের রূপ ছিল তুলা এবং তার পরিমাণ প্রথমদিকে নির্দিষ্ট ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মধ্যস্বত্ত্বভোগী বাঙালি ফড়িয়ার মাধ্যমে এই কর আদায় করত। এই বাণিজ্য করের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে ফড়িয়ারা বৃটিশ প্রভুদের সহযোগিতায় পাহাড়িদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ইচ্ছেমতো তুলা আদায় করত। লুইন লিখেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতি

বছর ৫৫,৮৫৪ মণ তুলা বাইরে রপ্তানি হত।[২] এই তুলা প্রধানত ইংল্যান্ডে বিকাশমান টেক্সটাইল শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

কর আদায়ের নামে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাঙালি ফড়িয়াদের এই শোষণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে পাহাড়িরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ" শীর্ষক প্রবন্ধে সুপ্রকাশ রায় লেখেন:

"এই ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, প্রথম ইজারাদারটি তাহাদের নিকট হইতে রাজস্বের নামে প্রায় সমস্ত তুলাই লুটিয়া লইত। দ্বিতীয়ত, তাহার লুণ্ঠনের পর যে সামান্য পরিমাণ তুলা থাকিত তাহা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া গিয়া উহার বিনিময়ে বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আদিবাসীদের পক্ষে খাদ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা দ্বিতীয় ব্যক্তিটির জন্য অসম্ভব হইয়া উঠিত। কারণ, সেই ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে ঐ অবশিষ্ট তুলা নামমাত্র মূল্যে তাহার নিকট বিক্রয় করিতে আদিবাসীদের বাধ্য করিত। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময়ে সমান ওজনের দ্রব্য লইতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং তুলার ব্যাপারী দুই টাকা মূল্যের এক মণ লবণের বিনিময়ে আট টাকা মূল্যের এক মণ তুলা আত্মসাৎ করিত। এইভাবে কোনো একটি বা দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতেই আদিবাসীদের সমস্ত তুলা নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই উভয়বিধ শোষণের ফলে আদিবাসীরা অনিবার্য মৃত্যুর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে তাহারা আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল।"

এই "বিদ্রোহ" শুরু হয় ১৭৭৬ সালে এবং শেষ হয় ১৭৮৯ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দুই পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। সুপ্রকাশ রায় এই লড়াইকে চাকমা বিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত করার প্রয়াস পেলেও, এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে আগ্রাসী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে পাহাড়ি বা জুম্ম জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এই যুদ্ধের প্রধান কারণ অনিয়ন্ত্রিত শোষণ হলেও আরও অন্যান্য কারণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। রাজা শের দৌলত খাঁ ও তার সেনাপতি রনু খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই যুদ্ধে পাহাড়ি যোদ্ধারা পরাক্রমশালী বৃটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সুপ্রকাশ রায় তারও বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

"বিদ্রোহ-কালে চাকমাগণ [পাহাড়িরা– লেখক] যে পদ্ধতিতে উন্নত অস্ত্র-সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই যুদ্ধ ছিল একালের গেরিলা যুদ্ধেরই অনুরূপ; ইংরেজ বাহিনী চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া স্ত্রীপুত্র ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিত এবং এইভাবে ইংরেজ বাহিনীকে গভীর পার্বত্য অঞ্চলে টানিয়া লইয়া যাইত। ইংরেজ সৈন্যগণ চাকমাদের গ্রাম, বাড়ীঘর, ক্ষেতের শস্য সমস্ত কিছু জ্বালাইয়া দিতে দিতে অগ্রসর হইত। এইরূপে বহু দূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও যখন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের সন্ধান পাইত না, তখন

তাহারা ফিরিতে আরম্ভ করিবামাত্র বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হইত। চাকমাগণ বড় বড় গাছ কাটিয়া পার্বত্য পথগুলি বন্ধ করিয়া, পর্বত-গহ্বরের মুখে ফাঁদ পাতিয়া ও পানীয় জল নষ্ট করিয়া দলে দলে ইংরেজ সৈন্য সংহার করিত। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বছরে কত ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহী যে বিদ্রোহী চাকমাদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ দিয়াছে, কত সৈন্য ফাঁদ-পাতা পর্বত-গহ্বরে পড়িয়া এবং পানীয় জলের অভাবে পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে তাহার হিসাব নাই।"

১৭৮৯ সালে কর প্রদানের মাধ্যম তুলা থেকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রথমে এই করের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৫,৭০৩.১৩ টাকা। পরে ১৮৪৬ সালে তা ১১,৮০৩ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।[৩] পার্বত্য চট্টগ্রামে এভাবে "মুদ্রা-অর্থনীতি" প্রচলনের ফলে পাহাড়ি উৎপাদকদের শোষণের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। মহাজন, সুদখোর ও দাদন ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর হামলে পড়ে। আমেনা মহসিন Wolfgang Mey-এর উদ্বৃতি দিয়ে তার The Politics of Nationalism: The case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh গ্রন্থে লিখেছেন:

The monetisation went against the interests of the Hill people for in order to be able to pay the taxes they became dependent upon Bengali traders to whom they sold their products at nominal prices as the former controlled and manipulated the market. They were often forced to borrow money from Bengali money-lenders who provided them with credit at exorbitant interest rates, which sometimes went as high as 600 per cent.

[টাকার প্রচলন ছিল পাহাড়ি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে, কারণ কর দেয়ার জন্য তারা বাঙালি ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিধায় তাদের কাছেই পাহাড়িরা উৎপাদিত সামগ্রী মামুলি দামে বিক্রি করে। তারা প্রায়শ বাঙালি মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সুদের হার ৬০০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।]

ক্যাপ্টেন লুইন-এর লেখায়ও পাহাড়িদের ওপর শোষণের এই করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। A Fly on the Wheel গ্রন্থে তিনি এই শোষণের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। দীর্ঘ হলেও পাহাড়িদের ওপর শোষণের মাত্রা, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা বুঝার জন্য এখানে তার লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।

কোনো পাহাড়ির ফসলহানি হলে অথবা মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার দরকার হলে তিনি বাঙালি মহাজনের কাছ থেকে বিশ কি ত্রিশ টাকা ধার করতেন। এই টাকা তাকে মাসিক পাঁচ টাকা বা বছরে ষাট টাকা সুদে আগ্রহের সাথে দেয়া হত। পাহাড়ি মানুষরা সৎ, তাই যতক্ষণ-না পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ঋণের পুরো আসল টাকা শোধ করার অর্থ যোগাড় না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ভারী সুদ শোধ করে চলত।

তার পর কী হত? আমি সাধারণ একটি ঘটনার বর্ণনা দেব। পাহাড়ি লোকটি তার টাকা শোধ করে। "ভাই, খুব ভালো করেছ।" সুদখোর বলে। "এই দেখ, আমি তোমার ঋণের দলিল নষ্ট করছি।" এই বলে সে একটি পুরাতন ঋণের দলিল ছিঁড়ে ফেলত, তবে পাহাড়ি লোকটির দলিল নয়। গরিব পাহাড়ি লোকটি পড়তে কিংবা লিখতে পারে না। সে এই খুশিতে বাড়ি চলে যেত যে সে তার ঋণ শোধ করে ফেলেছে এবং সে আবার মুক্ত মানুষ হয়েছে।

মহাজন সময়ের অপেক্ষায় থাকে। তারপর সে ঐ ঋণের দলিলপত্র নিয়ে কোর্টে হাজির হয় এবং ওই পাহাড়ি লোকটির বিরুদ্ধে, যার নাম ধরা যাক নীল চন্দ্র, তার বিরুদ্ধে একটি ঋণ মামলা রুজু করে দেয় চক্রবৃদ্ধি সুদে নেয়া ঋণের টাকা ও মামলার খরচের টাকা উসুলের জন্য। তারপর কোর্টে হাজির হয়ে তার বক্তব্য দেয়ার জন্য ওই নীল চন্দ্রের বিরুদ্ধে যথারীতি সমন জারি করা হয়।

শুনানির জন্য ধার্যকৃত দিনে মহাজন ওঁৎ পেতে থাকে কখন নীল চন্দ্র তার নৌকায় করে আসবে। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে দ্রুত তার সাথে দেখা করে উদ্বিগ্ন মুখে ও কণ্ঠস্বরে সে বলে: "ভাই, আমি সাংঘাতিকভাবে দুঃখিত যে একটা মাত্র ভুলের জন্য তোমাকে অনর্থক কষ্ট করে আসতে হল। তোমার (কোর্টে) হাজির হওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমার সমনের কাগজপত্র আমাকে দাও, আমি সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করব, আর তুমি আমার বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর।"

তারপর বেচারি মাঝিটি খাওয়া-দাওয়া করতে যায়, আর এদিকে ধূর্ত মাকড়সাটি কোর্টে হাজির হয়। যথারীতি কোর্ট বসে এবং নীল চন্দ্র উপস্থিত না হওয়ায় সমস্ত টাকা পরিশোধের জন্য তার বিরুদ্ধে একপাক্ষিক ডিক্রি জারি করা হয়।

মহাজন তার শিকারকে সহৃদয়তার সাথে আপ্যায়ন করার পর তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, এবং আপিলের সময় অতিক্রান্ত হয়ে ডিক্রিটি পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত কী ঘটেছে সে ব্যাপারে তাকে কিছুই জানায় না। তারপর একদিন অভাগা পাহাড়ি লোকটির মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে। সে জানতে পারে সে বিশাল এক ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছে, যে ঋণ সে কখনো নেয়নি এবং কখনো শোধ করতে পারবে বলে আশা করে না। এভাবে সে তার বাকি সারা জীবনের জন্য কার্যত মহাজনের গোলাম হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠন জোরদার করার জন্য বৃটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি উপনিবেশিক শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। তারা এ অঞ্চলকে চাকমা, মঙ ও বোমাং এই তিন সার্কেলে বিভক্ত করে এবং জমি, পরিবহন, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বনজ দ্রব্যের ওপর কর আরোপ করে। তবে বৃটিশদের এই শোষণ কেবল কর আদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল না। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করে, হাজার হাজার একর বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করে সেখানে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এক হিসেবে ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬,৮৮২ বর্গমাইলের মধ্যে ৫,৬৭০ বর্গমাইল

এলাকা সরকারি রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সব সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পাহাড়িদের প্রবেশাধিকার হরণ করা হয়। এভাবে পাহাড়িরা নিজেদের সম্পদের ওপর তাদের চিরাচরিত অধিকার হারায়। আর জুমচাষিরা অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একদিকে বাঙালি ব্যবসায়ীদের নির্মম শোষণ ও অন্যদিকে জুমচাষের এলাকা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হওয়ার ফলে পাহাড়িদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড দ্রুত ভেঙে পড়ে।

পাকিস্তান আমল

পাহাড়ি জনগণের ওপর শোষণ ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা পাহাড়ি জনগণের জন্য চরম অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। এই কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হল কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ইউএসএইড-এর আর্থিক সহায়তায় ষাট দশকের প্রথম দিকে নির্মিত এই বাঁধের ফলে সৃষ্ট হ্রদে ডুবে যায় ৫৪ হাজার একর ১ম শ্রেণীর হালচাষের জমি, উচ্ছেদের শিকার হয় ১০,০০০ হালচাষি ও ৮,০০০ জুমচাষি পরিবারের মোট একলক্ষ পাহাড়ি। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৮,০০০ বাঙালি ও ১,০০০ মারমা জাতির লোকজন। তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় নামমাত্র; সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৫১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ২.৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয়। জমির মালিকানার দলিলপত্র না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জুমচাষিদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট জমি না থাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৪০,০০০ জন ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। কয়েক হাজার মারমা চলে যান বার্মায়।

কাপ্তাই বাঁধ ছিল পাহাড়িদের অর্থনীতির ওপর এক চরম আঘাত। এই বাঁধ নির্মাণের কয়েকটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে গাছ ও বাঁশ আহরণ অর্থাৎ পাহাড়িদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করা। আমেনা মহসিন লন্ডনভিত্তিক এন্টি স্লেভারি সোসাইটির এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তার 'পলিটিক্স অব ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে লেখেন:

The construction of the dam had improved the communications in the area. Withdrawal of restrictions coupled with improved communications only helped the Bengalis further; but the Hill people were further marginalised by the policy. Rice production was totally stopped in these PF; "shortly afterwards lack of foodstuffs was reported then the first cases of starvation."

[কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও উন্নত যোগাযোগ বাঙালিদেরকেই কেবল আরো বেশি সুবিধা এনে দেয়।

অপরদিকে, এই নীতির ফলে পাহাড়িরা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল প্রটেকটেড ফরেস্ট এলাকায় ধান উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। এর কিছু সময় পর খাদ্যবস্তুর ঘাটতির খবর আসে এবং তারপর দেখা দেয় প্রথম খাদ্যাভাব।]

এখানে যে প্রটেকটেড ফরেস্ট-এর কথা বলা হয়েছে তা ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছিল। এই প্রটেকটেড ফরেস্ট বৃটিশদের ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে আলাদা। এখানেও জুমচাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায় এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে মিলের চারপাশে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক মারমা পরিবার উৎখাত হয়। তাদেরকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। অপরদিকে, মিলে পাহাড়িদের মধ্য থেকে চাকুরির সংস্থান করা হয়নি।

কাজেই দেখা যায়, কাপ্তাই বাঁধ, প্রটেকটেড ফরেস্ট ঘোষণা ও পেপার মিল স্থাপনের ফলে পাহাড়িরা নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক জীবন চরম হুমকির সম্মুখীন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাহাড়িদের এই বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক শোষণ আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও দাবিনামায় উপেক্ষিত থেকে যায়।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর গত ৩৯ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস হল জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ তীব্রতর হওয়ার ইতিহাস। এ সময় এক ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত হয়, যাতে হাজার হাজার পাহাড়ি প্রাণ হারান। জ্বালাও-পোড়াও, নির্বিচার আটক, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং পাহাড়িদের স্বাভাবিক জীবন যাপন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ৬০ হাজার পাহাড়ি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানে ১২ বছরের দুর্বিষহ শরণার্থী জীবন শেষে তারা পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৯৮ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশ আমলে পাহাড়িদের অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিকীকরণের প্রধান কারণগুলো হল সেটলার পুনর্বাসন ও ভূমি বেদখল, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি, বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, তথাকথিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও পুঁজিবাদী শোষণ। নিম্নে এ সকল বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. সেটলার পুনর্বাসন ও ভূমি বেদখল

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৩৪নং ধারায় পার্বত্য এলাকায় বহিরাগতদের জমি বন্দোবস্তির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সরকার তা ১৯৭৯ সালে তুলে নেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩০,০০০ বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার পর থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এক হিসেবে মতে চার লক্ষ সমতলবাসীকে

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়, যার রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক পরিণাম হয় সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক। তাদেরকে "খাস" জমি দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসা হলেও পাহাড়িদের দখলীয় জমিতে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়। ফলে ব্যাপক এলাকা ও বহু সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম থেকে হাজার হাজার পাহাড়ি উৎখাত হয়ে যায়। বহু পরিবার জমিজমাসহ সর্বস্ব হারিয়ে নিমেষে সর্বহারায় পরিণত হয়। জুমচাষ ও মজুরি শ্রম ছাড়া তাদের জীবিকা অর্জনের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। স্বপন আদনান পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের দারিদ্র্যের জন্য যে কয়টি কারণকে দায়ী করেন তার মধ্যে ভূমি বেদখল অন্যতম। তিনি লেখেন:

Appropriation of the private and common lands of the Hill peoples by others provides the prime instance of the expropriation of their assets. It has also been the single most critical factor leading to their impoverishment.[৪]

[অন্যদের দ্বারা পাহাড়ি জনগণের ব্যক্তিগত ও সাধারণ জমি আত্মসাৎ হল তাদের সম্পত্তি আত্মস্থ করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এটাই হল তাদের দারিদ্র্যতার একমাত্র প্রধান কারণ।]

কত হাজার একর জমি এভাবে কেড়ে নেয়া হয়েছে ও কত পাহাড়ি পরিবার নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। উচ্ছেদের পর বহু পরিবার রাঙামাটি জেলার সাজেকসহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেন ও বহু পরিশ্রম করে সেখানে বাগান-বাগিচা গড়ে তোলেন ও চাষের জমির পত্তন করেন। কিন্তু সাজেক থেকেও তাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে তাদেরই পত্তন করা জমিতে সেটলার পুনর্বাসনের চেষ্টা চলে আসছে ২০০৮ সাল থেকে। গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি সেখানে এক ডজনের অধিক পাহাড়ি গ্রামে সেনাবাহিনী ও সেটলারদের যে মিলিত আক্রমণ হয় তার কারণ হল এটাই।[৫] এর আগে ২০০৮ সালেও একবার তাদেরকে উৎখাতের জন্য বেশ কয়েকটি গ্রামে হামলা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সাজেকে আশ্রয় নেয়া পরিবারগুলোর মতো উৎখাত হওয়া সব পাহাড়ি নতুন করে জুমচাষ চালিয়ে যেতে সক্ষম হন না। অবশেষে তাদের কী পরিণতি হয় তারও বর্ণনা দিয়েছেন স্বপন আদনান:

This marginalized section of the Hill peoples has been compelled to search for alternative avenues of livelihood, diversifying into non-traditional production and trading activities. These occupational shifts have tended to increase their market involvement, particularly in the labour, product and credit markets, often under unfavourable terms and conditions. The overall outcome has been a process of destitution and proletarianization among the Hill peoples of the CHT.[৬]

[পাহাড়ি জনগণের এই প্রান্তস্থ অংশটি জীবিকার বিকল্প অবলম্বন খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। এতে ঐতিহ্যগত নয় এমন উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বহুমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে। এই পেশাগত পরিবর্তন প্রায়শ অসুবিধাজনক শর্তে বাজারের সাথে এবং বিশেষত শ্রম, উৎপন্ন দ্রব্য ও ঋণ বাজারের সাথে তাদের সম্পৃক্তি বৃদ্ধি করে। এর চূড়ান্ত ফলাফল হল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের মধ্যে সহায়-সম্বলহীনতা ও সর্বহারায় পরিণত হওয়ার একটি প্রক্রিয়া।]

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের সময় বহু পাহাড়ির সর্বশেষ আশ্রয় হত বন। কিন্তু উৎখাত হওয়া অনেক পাহাড়ি পরিবার এ আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত হন। বনের ওপর নির্ভর করে তারা জীবন ধারণ করতে সক্ষম হন না। ফলে তারা হয়ে যান দিনমজুর। স্বপন আদনানের ভাষায়:

Loss of access to lands and forests has also compelled a growing section of the Hill peoples to become wage labourers. (প্রাগুক্ত)

(ভূমি ও বনের ওপর অধিকার হারানোর ফলে পাহাড়ি জনগণের ক্রমবর্ধমান একটি অংশ মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য হয়।)

২. ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর পাহাড়িদের আদৌ নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং তারা ব্যবসায়িক শোষণের নির্মম শিকার। বাজার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিধায় তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরিবহন, ব্যাংকিং, ঠিকাদারি, সেবাখাত সবকিছু বহিরাগতদের একচেটিয়া দখলে। ইদানিং পাহাড়িরা ছোটখাট ব্যবসার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম এবং বিভিন্ন কারণে বহিরাগতদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৩. তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির নামে পাহাড়ি জনগণের ওপর চরম দমন-পীড়ন চালায়। মান বমিত্র সেনাবাহিনীর কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির কলা-কৌশলকে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই প্রধান চার ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেন। অর্থনৈতিক কৌশলের মধ্য রয়েছে (ক) পাহাড়িদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং যৌথ খামার, আদর্শ গ্রাম ও গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তর এবং (খ) কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি। তিনি মনে করেন "এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা; বরং অনেকেই এই বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসে সর্বস্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে।"[৭]

কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির নামে সেনাবাহিনী নিরীহ পাহাড়িদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত পাহাড়ির পরিবারে এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য অত্যধিক। গ্রেফতার হওয়া মানে আর্থিকভাবে পঙ্গু হওয়া। প্রথমত, পরিবারে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, তার জন্য মামলার খরচ যোগাতে ও তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে জমি-জমাসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়। তৃতীয়ত, গ্রেফতারের পর যে নির্যাতন চলে তার ফলে অনেকে পঙ্গু হয় ও পরবর্তীতে আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে সক্ষম হয় না। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অগণিত সংখ্যক পাহাড়ি পরিবারে নেমে আসে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি বন্ধ হয়নি। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মিদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও এখনো গ্রেফতারের শিকার হচ্ছেন।

৪। বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ আমলে বাণিজ্যিকভাবে বনজসম্পদ আহরণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পেপার মিলে, ইট ভাটায়, তামাক চুল্লিতে ও আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহারের জন্য অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঠ আহরণের ফলে একদিকে যেমন বনাঞ্চল উজাড় হয়েছে ও এর ফলে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে; অপরদিকে, বনকে নির্ভর করে পাহাড়ি জনগণের অর্থনৈতিক জীবন পুরোপুরি ধ্বংস হতে চলেছে। বছরে কত পরিমাণ কাঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাইরে পাচার হয় তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ১৯৯৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাঠ ব্যবসার মূল্য দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। (সূত্র: জীবন আমাদের নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন রিপোর্ট, আপডেট ৩) এর মধ্যে নিশ্চয়ই চোরাইপথে পাচার হওয়া গাছের হিসাব ধরা হয়নি।

কেবল বনজসম্পদ আহরণ নয়, বন নিয়ন্ত্রণের ফলাফলও হয় পাহাড়িদের জন্য মারাত্মক। ১৯৯৬ সালে রাজস্থলীতে জমি অধিগ্রহণের ফলে ধনুছড়ি মৌজা থেকে ২০০ খিয়াং পরিবার তাদের পূর্ব-পুরুষের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়। পুনর্বাসনের অভাবে তারা বাংলাদেশ-মিজোরাম সীমান্ত এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়। রাজস্থলী, বিলাইছড়ি ও কাপ্তাই এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষিত হওয়ায় জুমচাষের এলাকা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যায়, যাতে পাহাড়ি অর্থনীতি ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সেখানে রিজার্ভ ফরেস্ট-এর জমি নিয়ে প্রায় সময় সরকারি বন বিভাগের সাথে স্থানীয় জনগণের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বন বিভাগের কর্মচারীরা রিজার্ভ ফরেস্ট-এ "অবৈধ প্রবেশের" দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অহরহ মামলা দিয়ে থাকে, যা স্থানীয়ভাবে বন মামলা নামে পরিচিত। এই মামলার খরচ যোগাতে গরিব অধিবাসীরা আরো বেশি আর্থিকভাবে লোকসানের শিকার হয়।

৫। তথাকথিত উন্নয়ন কর্মসূচি

উন্নয়ন শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়। আর সামরিকায়িত অঞ্চলে এটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে থাকে। যে এলাকায় জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সংগ্রাম বিরাজ করে সেখানে উন্নয়ন কৌশল বিদ্রোহ দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা তারই সাক্ষ্য দেয়। ১৯৮০ দশকে উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে যৌথ খামার ও আদর্শ গ্রাম কর্মসূচির নামে সেনাবাহিনীর রণকৌশলগত লক্ষ্যকেই বাস্তবায়ন করা হয়। আর এর বলি হয় সাধারণ পাহাড়ি জনগণ ও তাদের পারিবারিক ও যৌথ অর্থনীতি। এই সব কর্মসূচির আওতায় পাহাড়িদের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়ে যৌথ খামারে ও বাবার বাগানে তাদেরকে মজুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করা হয়।

বিগত কয়েক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের বিপুল উন্নতি করা হয়। এই উন্নয়নের পেছনে তাৎক্ষণিক ও প্রধান তাগিদ ছিল একইসাথে সামরিক ও বাণিজ্যিক: সেনাবাহিনীর চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি ও বনজসম্পদ আহরণ। সে জন্য দেখা যাবে, ১৯৮০ দশকের শেষভাগ থেকেই পাহাড়ের বনাঞ্চলগুলো একে একে নিঃশেষ হতে থাকে। যে দিকেই পাকা রাস্তা হয়েছে সে দিকের বন একেবারে নিমেষে উজাড় হয়ে গেছে। স্বপন আদনানের পর্যবেক্ষণেও এই নির্মম সত্যটি ধরা পড়েছে। তিনি লিখছেন:

Our fieldwork observations indicate that, wherever Pahari settlements have been opened up by expansion of road and water transport networks, they have also been exposed to the entry and interventions of outsiders, inclusive of traders, settlers, officials, security forces and development agencies. Travelling across the CHT, we have been struck by the fact that the existence of good roads was almost always associated with significant extents of deforestation, soil erosion, environmental degradation, in-migration by settlers and traders, forcible takeover of Pahari lands, the establishment of rubber plantations, etc.[৮]

(আমাদের মাঠের কাজের পর্যবেক্ষণ এই ইঙ্গিত দেয় যে, যেখানে পাহাড়ি বসতিগুলো সড়ক ও পানি পথের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের দ্বারা খুলে দেয়া হয়েছে সেখানে বহিরাগতরা অর্থাৎ ব্যবসায়ী, সেটলার, সরকারি কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনী ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো ঢুকে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে আমরা এটা দেখে অবাক হয়েছি যে, প্রায় সকল সময় ভালো রাস্তার উপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত হল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বন ধ্বংস-সাধন, ভূমির অবক্ষয়, পরিবেশগত অবনমন, সেটলার ও ব্যবসায়ীদের আগমণ, জোরপূর্বক পাহাড়িদের জমি হরণ, রাবার বাগান সৃষ্টি ইত্যাদি।)

অপরদিকে, উন্নয়নের নামে পাহাড়ি জনগণের সম্প্রদায়গত মালিকানার জমি বেদখল করা হয়। ফলে এ-সব জমিতে তাদের জুমচাষ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৭-৮ সালে বান্দরবানের চিম্বুকে সেনাবাহিনী মুরুংদের জমিতে "নীলগিরি" নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করলে শতাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬। শিল্প-পুঁজির শোষণ

স্বপন আদনান লক্ষ করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক শুরু হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

A critical feature of the contemporary CHT economy is the limited emergence of capitalist relationship, defined as production based on wage labour for the explicit purpose of making profit (as contrasted to meeting subsistance needs). (প্রাগুক্ত)

[সমসাময়িক পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুনাফার জন্য মজুরি শ্রমভিত্তিক উৎপাদনের অর্থে সীমিত আকারে পুঁজিবাদী সম্পর্কের গঠন। (নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনের বিপরীতে)]

গত কয়েক দশকে পাহাড়ি সমাজে, বিশেষত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে, যথেষ্ট মাত্রায় শ্রেণীবিভাজন ঘটেছে। বিত্তশালী শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দিয়েছে রিক্সাশ্রমিক, ঠেলাগাড়ি শ্রমিক, খেতমজুর ইত্যাদি। নিম্ন শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে কৃষি, বন ও অন্যান্য খাতে মজুরি শ্রমে নিয়োজিত রয়েছেন। তাছাড়া পাহাড়ি সমাজের পরিবর্তনের অন্য একটি লক্ষণীয় দিক হল শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত পাহাড়িদের চট্টগ্রাম, ঢাকা, সাভার ও কুমিল্লায় ইপিজেড-এ বিভিন্ন কারখানায় চাকুরি গ্রহণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিল্পকারখানার অবর্তমানে বাইরের পুঁজি তাদেরকে এ সব রপ্তানি-নির্ভর কারখানাগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মূলত ১৯৮০ দশকের শেষভাগ থেকে পাহাড়ি তরুণ-তরুণীদের এ সব কারখানায় চাকরিতে নেয়া শুরু হয়। পরে পার্বত্য চুক্তির পর এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়। একটি হিসাব মতে, বর্তমানে কেবলমাত্র চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ কাজ করা পাহাড়ি শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক ২০ হাজার। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

শোষণের পরিণাম

বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে যা হয়েছে তা হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজি কর্তৃক পাহাড়ি জনগণের নির্মম শোষণ ও তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন। এর ফলে একদিকে যেমন পাহাড়িদের স্বনির্ভর অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ও তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সর্বহারা বা প্রায়-সর্বহারায় পরিণত হয়েছেন বা হতে চলেছেন, অন্যদিকে মূল্যবান বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। সবচেয়ে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে মুরুং, খুমী ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠিগুলো। তাদের সমাজ-সংগঠন তুলনামূলকভাবে দুর্বল হওয়ায় তারা পুঁজিবাদী পরিবর্তনের ধাক্কায় আরো নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই করুণ চিত্র জার্মান নৃতত্ত্ববিদ এল জি লফলারের লেখায় সবচেয়ে মূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। ১৯৯১ সালে বান্দরবান ও রাঙামাটি সফরের পর তিনি লেখেন:

"Once upon a time, the Chittagong Hill Tracts were not only rich in timber and bamboo, but they also produced a surplus of paddy and cotton. Hard-working farmers were ... comparatively well off, and really needy people were few in number. Nowadays, after millions of dollars of development aid have been spent needy people abound, rice and cotton have to be imported, and timber and bamboo have become so scarce that the formerly magnificent houses of the indigenous people gave way to poor huts.[৯]

[এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল গাছ ও বাঁশ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না, উৎপাদিত ধান ও তুলারও উদ্বৃত্ত থাকত। কঠোর মেহনতকারী কৃষকরা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন, আর অভাবী মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। উন্নয়ন সাহায্যের লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করার পর আজ অভাবী মানুষের সংখ্যা হয়েছে প্রচুর, চাল ও তুলা আমদানি করতে হচ্ছে এবং গাছ ও বাঁশের এত সংকট যে আগেকার আদিবাসী জনগণের সুন্দর ঘরগুলোর জায়গা নিয়েছে জীর্ণ-শীর্ণ কুটির।]

পার্বত্য চুক্তির পর ১৯৯৮-২০০৪ সালে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে স্বপন আদনান লফলারের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করেন। তিনি লেখেন:

Our fieldwork in the CHT over 1998–2002 indicated that many of the observations made by Loffler (in 1991) regarding the deterioration in the living conditions of the Hill peoples had been continuing unabated.[১০]

[১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের মাঠের কার্যক্রম এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, পাহাড়ি জনগণের জীবনযাত্রার অবনতি সম্পর্কে লফলার যে মন্তব্য করেছিলেন (১৯৯১ সালে) তার বহুলাংশ এখনো সঠিক রয়েছে।]

উপসংহার

পাহাড়ি জনগণের অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা রাজনৈতিক অধিকারহীনতার সহগামী। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন কায়েমের মাধ্যমেই পাহাড়িদের রাজনৈতিক অধস্তনতা সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। পরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে এই অধস্তনতা একেবারে নিরঙ্কুশ হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য পাহাড়ি জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন সেটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে স্বপন আদনানকে এখানে আরো একবার উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পাহাড়িদের মধ্যে দারিদ্র্যতা সৃষ্টির জন্য চারটি প্রধান মেকানিজমকে তিনি দায়ী করেন এবং বলেন:

Nevertheless, the most critical factor underlying the economic subordination of the Hill peoples has been their lack of political power. .... These fundmamental inequalities in economic position and political power have also provided the bases of ethnic conflict in the CHT and stoked the resistance of the Hill peoples against economic exploitation and political domination.[১১]

(তা সত্ত্বেও, পাহাড়ি জনগণের অর্থনৈতিক অধস্তনতার পেছনে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক অধিকারহীনতা। ... অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই মৌলিক অসমতা পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত সংঘাতের ভিত্তি তৈরি করে এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অধীনতার বিরুদ্ধে পাহাড়ি জনগণের প্রতিরোধকে উসকে দেয়।)

পুঁজিবাদ একদিকে যেমন এক জাতির ওপর অন্য জাতির শোষণ-নির্যাতনের জন্ম দিয়েছে, তেমনি এই শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের শর্তও সৃষ্টি করেছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যোগাযোগ মাধ্যমের বিপুল উন্নতি সাধন করলেও এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ঘুচে দিয়েছে। তাই আজকের পৃথিবীতে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে সকল জাতির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠার শর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যদি ঐতিহাসিক কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পরাশক্তির কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের পরাজয় অনিবার্য হয়ে থাকে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে আজ তাদের মুক্তিও অবশ্যম্ভাবী।

টীকা

১. অভিজাতবর্গ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপে কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ত সমাজের যে শ্রেণীকে নির্দেশ করতে অভিজাতবর্গ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, এখানে সে অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যাদেরকে অভিজাতবর্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে তারাও সাধারণের মতো উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিলেন, বিশেষ কোনো শ্রেণী গঠন করতেন না এবং অন্যের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করতেন না।

২. আমেনা মহসিনের The Politics of Nationalism: The case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ৭৯।

৩. Alexander Mackenzie. 1884. History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North East Frontier of

Bengal . Calcutta : Home Office Department Press. আমেনা মহসিনের উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত ।

৪. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh . 2004.

৫. ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বাঘাইহাট জোনের সেনাবাহিনীর সদস্যরা ও বহিরাগত সেটলাররা মিলে সাজেকের বাঘাইহাটে পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালায় । এতে কমপক্ষে ৪ জন পাহাড়ি গ্রামবাসী নিহত হয়, চার শতাধিক ঘর পুড়ে যায় ও কয়েক হাজার নরনারী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ।

৬. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh . 2004.

৭. তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি: পার্বত্য জনগণের দুর্ভোগ, রাডার, হিল লিটারেচার ফোরামের একটি অনিয়মিত প্রকাশনা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ ।

৮. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh . 2004. page 133

৯. Ecology and Human Rights: Report on a Short Visit to Bandarban and Rangamati. আমেনা মহসিন ও স্বপন আদনানের উপরোল্লে-খিত গ্রন্থে উদ্ধৃত ।

১০. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh . 2004.

১১. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh . 2004. page 139

[লেখক: পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ।]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি

প্র সি ত বি কা শ খী সা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি আজকের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়টির ব্যাপারে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে ঘটনাবলি পরিষ্কার আর যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির চিত্রটা অস্পষ্ট এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিকর। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত 'শান্তিচুক্তি' নিয়ে হৈ চৈ হট্টগোল হচ্ছে, তাতে অনেকের (যারা ওয়াকিবহাল নন) বিভ্রান্ত হবার অবকাশও আছে।

আমরা যারা এই সমস্যার সবচেয়ে ভুক্তভোগী এবং যারা এই অঞ্চলের জনগণের অব্যক্ত কথা ও দাবি তুলে ধরতে চাই, তাদের হয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। অভিযোগ আছে এই তথাকথিত 'শান্তিচুক্তির' ব্যাপারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি–ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত এদের আসলে মৌলিক চরিত্রগত কোনো পার্থক্য নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে বর্তমান অবস্থায় এই দলগুলো পরস্পরের সহযোগিতা করছে মাত্র। অতীতের শাসকগোষ্ঠীগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নীতি জারি রেখেছিল, সেটা যাতে একটা স্থায়ী রূপ পায় তার জন্য এই দলগুলো সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকের এই যে জামাত, এই যে বিএনপি, জাতীয় পার্টি এদের সম্পর্কে উপস্থিত প্রাজ্ঞ আলোচকরাই আলোচনা করবেন। এ দলগুলোর চরিত্র উন্মোচন এবং কলা-কৌশল ব্যাখ্যা করবেন। আমি আমার আলোচনায় সংক্ষেপে যাদের কথা বলব অর্থাৎ যে দলটির কথা বলব সেটি হচ্ছে JSS (জন সংহতি সমিতি), যাদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের তথাকথিত 'শান্তিচুক্তি' হতে যাচ্ছে। JSS-এর ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামাতের কথাও এসে যায়। এদের ব্যাপার অতি সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি উল্লেখ করে আমি আলোচনার মূল বিষয়ে ফিরে আসছি।

জামাতে ইসলামীকে স্বাধীনতার বিরোধী, রাজাকার, আল বদর বলে এত গালমন্দ করা হয়, এই জামাতকে তো আওয়ামী লীগের শাসনামলে শেখ মুজিব ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সাথে সময়ে সময়ে জামাতের সংযোগ, বিভিন্ন সহযোগিতা এবং কোনো কোনো সময় লোক দেখানো ছোঁড়াছুড়ি এসব ব্যাপার-স্যাপার সবার জানা।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি বলে আওয়ামী লীগ এত গলাবাজি করে, অথচ লজ্জাজনক ব্যাপার, শেখ হাসিনাই জামাতে ইসলামীর নেতা আব্বাস আলী খানের কাছ থেকে এক সময় শুভেচ্ছার নির্দশন স্বরূপ 'কোরান শরীফ' উপহার নিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের আর এক নেতা আব্দুল মান্নান (এক সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) ১৯৮৬ সালে জামাতে ইসলামীকে এদেশের "একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই "গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের" সাথে আওয়ামী লীগ ১৯৮৬ সালে বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে বৈধতা দিয়েছিল। আবার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় যাবার জন্য সেই জামাত আর গণধিকৃত জাতীয় পার্টির সাথে আঁতাত করেছিল এই যে লাম্পট্য, এগুলো কিন্তু এখন আর জনগণের কাছে গোপন ব্যাপার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে অনেকের কাছেও এসব আর অজানা নয়।

ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে দরদি সেজেছে। একথা তো সবাই জানেন, তাদের আমলেই সমস্যার সূত্রপাত হয়। আওয়ামী লীগের বর্তমান উদ্দেশ্য ও ভূমিকাকে বোঝার জন্য অবশ্যই তাদের অতীতের কার্যকলাপকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এ দলগুলো সম্পর্কে আমার বেশি বলার দরকার নেই। এদের চরিত্র, এদের অতীত আপনাদের জানা। ভবিষ্যতে এরা কী করতে পারে তা-ও হিসেবের মধ্যে আছে।

এবার আলোচনায় দৃষ্টি ফেরাতে চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে। বিশেষত আন্দোলনকারী দলটির দিকে। যারা দীর্ঘ দু'যুগ ধরে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে, তাদের ব্যাপারে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে JSS-এর এত মিল মহব্বত, এতে কি তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আদৌ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

তার আগে বলে রাখা দরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের ভূখণ্ডটিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর শাসকগোষ্ঠির যে বিদ্বেষনীতি বজায় ছিল এবং নিষ্ঠুর দমন পীড়ন চলেছিল, সেই সময়কার পরিস্থিতিতে JSS বিশেষত শান্তিবাহিনী নামটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মনে জায়গা করে নিয়েছিল্ সে সময়ে JSS শান্তিবাহিনী জনগণের প্রতিবাদ, জনগণের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে তার ভাষা দিতে চেষ্টা করেছিল। এটা JSS-এর নিঃসন্দেহে প্রথমদিককার প্রগতিশীল ভূমিকা। সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে তাদের এই ভূমিকাকে আমরা সম্মান জানাই। কিন্তু এই দলটা তার সেই আগের লক্ষ্য-আদর্শ

ধারাবাহিকভাবে আর বজায় রাখতে পারল না। এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের JSS-এর বেলায় হয়েছে এমন নয়, অন্যান্য দেশের বড় বড় দলগুলোর ক্ষেত্রেও বিচ্যুতি লক্ষণীয়। নেতৃত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে দলের নীতি, আদর্শ, লক্ষ্যও পাল্টে যেতে দেখা গেছে। এক সময়কার প্রগতিশীল ভূমিকা পালনকারী দল পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক রয়েছে। JSS-এর প্রতিষ্ঠাতা এম.এন. লারমা যিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন JSS আর তার পরের ঔঝঝ-এর মধ্যে অনেক অনেক গরমিল ও পার্থক্য স্পষ্ট। আজকে এই পার্থক্যটা যদি আমরা হিসেবে না রাখি, তাহলে সমীকরণ ভুল হতে বাধ্য। JSS ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে আন্দোলনরত তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা-কর্মীদের এই চুক্তির ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয় থাকার মূল কারণ হচ্ছে এটিই।

JSS-এর বর্তমান নেতৃত্ব আন্দোলনের যে কলাকৌশল অবলম্বন করছে তাকে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় তারা আওয়ামী লীগকে অনুকরণ ও অনুসরণ করছে, এখন তাদের নীতি-আদর্শের কোনো বালাই নেই। স্বার্থ হাসিল করা ও ক্ষমতায় ভাগ বসানোর জন্য আওয়ামী লীগের মতো দলগুলো দেশে যা যা পন্থা অবলম্বন করতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে JSSও তাই করছে। সমাধানের নামে সরকারের সাথে তারা যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, তাতে বাস্তবে সমাধান হবে কিনা এ ব্যাপারে জনগণকে ঔঝঝ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। সরকারও JSS জনগণকে কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। সরকারের এক এমপি বেফাঁসে বলে ফেলেছেন যে, আওয়ামী লীগের ৩ জন ও JSS-এর ৩ জন মোট ৬ জন ছাড়া চুক্তির ব্যাপারে আর কেউ জানেন না। আন্দোনকারী দল হিসেবে JSS কেন কী উদ্দেশ্যে চুক্তির ব্যাপারে জনগণকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়নি, বা দিতে পারেনি?

আদর্শিক বিচ্যুতিটা JSS-এর কার্যকলাপের মধ্যেই ফুটে উঠে। জনগণকে উদ্বুদ্ধ না করে, জনগণের মতামতের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশিকেই তারা প্রাধান্য দিত। সবাইকে তাদের মর্জিমাফিক চলতে বাধ্য করত। তাদের মত ভ্রান্ত হলেও তা তারা চাপিয়ে দিত। কতকগুলো ঘটনার কথা বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। JSS শান্তিবাহিনী ১৯৮২ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়, সেটা সবাই জানে। ১৯৮৫ সালে বিদ্রোহী গ্রুপ সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে বিলীন হয়ে যায়। তারা তখনকার সময়ে জনমনে জায়গা করে নিতে পারেনি, এখন তো নয়ই। ১৯৮৫ সালের মধ্যভাগেই JSS-এর দলীয় কোন্দল শেষ হয়। এরপরে আন্দোলনকারী দল হিসেবে তারা কী কৌশল অবলম্বন করল তা বেশ মনোযোগের দাবি রাখে। দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তারা সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামের পথে গিয়েছিল। দলীয় কোন্দল নিষ্পত্তি হয়ে যাবার ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের দিকে তারা action শুরু করে দেয়। সশস্ত্রভাবে সশস্ত্রবাহিনীদের ওপর নয়, আর্মি, বিডিআর, আর্মড পুলিশের ওপর

তারা Action-এ গেল না। Action-এ গেল সরকারের সমতল থেকে নিয়ে যাওয়া settlers -দের ওপর। এর পেছনে তাদের সুপ্ত উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল, যাতে পাল্টা হামলা হয় এবং তাতে পাহাড়িরা ভিটেবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হবার জন্য ত্রিপুরায় চলে যায়। হিসেব অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর হামলার পাল্টা হিসেবে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটলাররা হামলা করে পাহাড়িদের বহুগুণ হতাহত করে। তখন নিরীহ লোকজনকে রক্ষার জন্য শান্তিবাহিনী এতে কোনো প্রতিরোধ করেনি, বরং ভিটেবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলারদের বসতিস্থাপন এবং জোর-জবরদস্তি করে জায়গাজমি বেদখল কিছুতেই পাহাড়িরা মেনে নিতে পারেনি, পারার কথাও নয়। কিন্তু এভাবে দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে হামলা, দাঙ্গা-দাঙ্গামা হয়ে যাক সেটা কিন্তু পাহাড়িরা চায়নি।

কিন্তু JSS সেটাই চেয়েছিল। আর্মি-বিডিআর-আনসার-সেটলারদের যৌথ হামলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে ঘনবসতি ও উর্বর অঞ্চল পানছড়ি-দিঘীনালার পাহাড়িরা ত্রিপুরায় চলে যেতে বাধ্য হল। এই যাবার পেছনে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দের প্ররোচনা ছিল। ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার তাদেরকে শরণার্থী হতে হয়েছে। কিন্তু ওভাবে শরণার্থী নিয়ে যাবার পেছনে JSS-এর লক্ষ্য হাসিলের অভিপ্রায় ছিল। ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তা তারা করে।

সশস্ত্র সংগ্রামরত দল হিসেবে তাদের লক্ষ্যবস্তুর ব্যাপারে এখন অনেক কথা উঠতে পারে। সশস্ত্র বাহিনী বা সরকারি স্থাপনাসহ যে যে বিষয়গুলোর ওপর সাধারণত তাদের হামলা করার কথা, সেগুলোর ওপর তাদের মনোযোগ খুব কমই। দেখা গেছে, সেটলারদের ওপরই তাদের হামলার মনোযোগ। সেটলারদের পাহাড়িরা মেনে নেয়নি, এখনো নিচ্ছে না, রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ অস্তিত্বের হুমকি মনে করে। কিন্তু এভাবে পাইকারি হত্যা, অনেক ক্ষেত্রে শিশু পর্যন্ত মারা যাওয়ার ব্যাপারে চট্টগ্রামের জনগণ সায় দেয়নি। কিন্তু শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে যারা ছিল, তারা সেসব করিয়েছে। দুঃখজনক, নির্মম হলেও সত্য যে, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা ন্যায়-অন্যায়, যেকোনো ধরনের পন্থা বেছে নিতে দ্বিধা করত না।

এরপর এরশাদ সরকারের আমলে যখন আলোচনার নামে কালক্ষেপণ ও বিতর্কিত জেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছিল, সে সময় তাদের ভূমিকা ও পদক্ষেপ দেখা যাক। সশস্ত্রভাবে সরকারের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা প্রতিরোধ করার মতো অবস্থা বা মনোবল তাদের ছিল না। দেখা গেল, তারা ব্যবহার করতে লাগল বিস্ফোরক, এক্সপ্লোসিভ। এমন এমন জায়গায় বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা হল যাতে অনেক লোক মারা গেছে। সেনাবাহিনী তাতে কমই মারা পড়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকজন ঐ বিস্ফোরকের দ্বারা সংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ বিস্ফোরকদ্রব্য স্থাপনের জন্য সামরিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের দরকার পড়ত। দেখা গেল, শান্তিবাহিনীরা সে সব মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়েছে পাড়া গ্রামের নিরীহ গোবেচারা ধরনের যুবকদের দিয়ে। সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের কাছাকাছি এলাকায় সে সব ফিট

করতে ঐ যুবকদের লাগিয়েছে। দেখা গেছে, ঐ কাজ যারা করতে গেছে তারাই মারা পড়েছে। এ ধরনের অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে।

১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ নির্বাচন JSS বানচাল করে দেবে বলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায়। তাদের প্রচারণার ভাবসাব এমন যে, তারা সামরিকভাবে তা প্রতিহত করবে। কিন্তু দেখা গেল কার্যত তা হয়নি। এরশাদ সরকার যে জেলা পরিষদ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, তা জনগণ মেনে নেয়নি। যে নির্বাচন হয়, তাতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না। মিলিটারিরা জোর করে অনেককে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যায়। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ভোটারদের জনপ্রতি ৫০ টাকা, এমনকি কাউকে কাউকে ১০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে। প্রার্থীদেরকেও টাকা দেয়া হয়েছিল। '৮৯ সালের ঐ নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যান করল ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে ভোট না দিয়ে। নির্বাচন ব্যর্থ করে দিতে জনগণই সক্রিয় ভূমিকা রাখল। এ নিয়ে JSS প্রতিনিধিদের যখন জিজ্ঞেস করা হল, নির্বাচন ব্যর্থ করে দেবার কৃতিত্ব তো জনগণের, JSS-এর নয়। কেন JSS-এর পক্ষে থেকে নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেয়া হবে বলে প্রচার চালান হল? তার উত্তরে JSS-এর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব থেকে বলা হল : রাজনীতি করতে গেলে বলতে হয়, অভিনয় করতে হয়। JSS-এর নেতৃত্বের মধ্যেই এসব গলদ রয়েছে। তারা কাদের সাথে অভিনয় করে, কাদের সাথে প্রতারণা করে তা এখন পরিষ্কার হয়েছে।

মূলনীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে JSS আজকে আওয়ামী লীগকেই অনুসরণ করছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ব্যাপকভাবে প্রচার করছে "জাতীয় ঐকমত্য"। দেখা গেল, পার্বত্য চট্টগ্রামেও JSS-এর কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে "জাতীয় ঐকমত্যের" সুর। সেই ঐকমত্য হচ্ছে : যারা এক সময় তাদের হিট লিস্টে ছিল তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক, যারা আর্মিদের সাথে মাখামাখি করেছে সেই লম্পটদের সাথে ঐকমত্য করে JSS একাকার হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ এবং JSS পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে ঐকমত্য করতে গিয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলল, ঐ ঐকমত্যে জনগণের কথাবার্তা, দাবি-দাওয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, এর পেছনে অনেক কারণ আছে। সে সব স্বল্প পরিসরে আলোচনায় টেনে আনা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি সেই '৯২ সালের ১০ আগস্ট হতে এক নাগাড়ে চলে আসছে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত। যুদ্ধ ছাড়াও সংগ্রামের আরো অন্য ফ্রন্ট রয়েছে, যেমন প্রচার প্রপাগান্ডা, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করা, জনগণকে শিক্ষিত করা .... ইত্যাদি। একটা আন্দোলনকারী দল হিসেবে তারা সেসব না করে সমস্ত কিছু রুদ্ধ করে রাখল। যে কাজটা তারা বেশ নিষ্ঠার সাথে করল তা হচ্ছে চাঁদা আদায়। ঠিকাদারি, ব্যবসায়ী ও রিজার্ভ ফরেস্টে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়। এখান থেকে JSS উল্লেখযোগ্য হারে পার্সেন্টেজ নেয়। দেখা গেল, পাঁচ বছরের অধিক যুদ্ধবিরতির ফাঁকে অন্য কোনো ধরনের সংগ্রাম হল না। তবে যে জিনিষটা বেশ ভালোভাবে হল তা হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ। শোনা যায়, JSS-এর নেতৃবৃন্দের গুটিকয়েকের হাতে বিস্তর টাকাপয়সা গচ্ছিত

রয়েছে। এখন এই কালো টাকা জায়েজ করার জন্য ঐ সমস্ত নেতাদের নিরাপত্তা, আশ্রয় বা একটা অবলম্বন দরকার। তাদের দিক থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ এবং জরুরিও। কারণ, যুদ্ধ অর্থাৎ আন্দোলন করে তারা আর এগুতে পারে না। সশস্ত্র চাপ সৃষ্টি করে সরকারের টনক নড়ানো, দাবি পূরণে সরকারকে বাধ্য করা, জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনমুখী করা–এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় না। তাহলে JSS আন্দোলন করবে কিভাবে? হয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য গেরিলা বাহিনীকে আরো সাহসী ভূমিকা নিতে হবে। নতুবা সরকারের সাথে তাদের আপোস করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছে। যুদ্ধে অস্ত্র নির্ধারক ফ্যাক্টর নয়, মনোবলও একটা বিরাট হাতিয়ার। অথচ শান্তিবাহিনী তথা JSS-এর ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের মধ্যে সে সব অনুপস্থিত। তাদের মধ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম ঝুঁকি নিয়ে সাহসী ভূমিকা রাখার প্রবণতা দেখা যায় না, বরং সবার মাঝে একটু নিরাপদ ঠাঁই পাবার ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। জনগণের কাছে এতদিন ধরে তারা যে কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকার করে এসেছে, তা তারা কতখানি পালন করেছে সে জবাব একদিন দিতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, সংগ্রাম করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আর আগ্রহ নেই। ঝোঁকটা তাদের সরকারের সাথে বোঝাপড়া করার দিকে। তারা ঠাঁই খুঁজছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে। কেন জানি শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি এই আওয়ামী লীগের সাথে JSS-এর মিলে গেছে। ক্ষমতায় ভাগ পাবার মোহে JSS জুনিয়ার পার্টনার হতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে '৯১ ও '৯৬-এ উভয়ের গোপন আঁতাত ছিল। দু'বারই আওয়ামী লীগ JSS কে মার দেয়। JSS রাজনৈতিক মার খাওয়াটাই ধরতে পারিনি। হয়তো ধরতে পারলেও আওয়ামী লীগের লেজ ধরেই JSS পার পেতে চায়। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কি হচ্ছে না, দাবি-দাওয়া অর্জিত হচ্ছে কিনা এসব আর তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। পাঁচ বছরের অধিক একটানা যুদ্ধবিরতির নিরাপদ সময়ে তারা মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। এখন তারা আর আন্দোলন-সংগ্রাম করতে চায় না, চায় তাদের জন্য নিরাপদ ঠাঁই। ক্ষমতাসীন দলের সাথে সে কারণেই তাদের দরকার বোঝাপড়া করা।

সেনাবাহিনী ও সেটলারদের প্রশ্নে JSS নীরবতা পালন করছে। ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের বেলায়ও JSS-এর ভূমিকা অস্পষ্ট। অথচ জায়গাজমি ফিরে পাওয়া আর একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা জাগিয়েই সীমান্তের ওপারে শরণার্থীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর্মি ও সেটলারদের হামলার শিকার হয়ে বহুসংখ্যক মারা পড়েছে, বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ-সমস্ত এলাকার লোকজন শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে এমন এমন জায়গা থেকেও JSS কর্মীরা শরণার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যারা সরাসরি হামলার শিকার হয়নি। বর্তমানে ফিরে এসে তারা কী পাচ্ছে? অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শরণার্থীরা ফিরে এসে ঠিকমতো আগের জায়গায় জমি ফিরে পাচ্ছে না। অথচ

শরণার্থী জীবন বেছে নেবার জন্য তাদেরকে শান্তিবাহিনীর অধঃপতিত নেতাদের কাছ থেকে চাপ দেয়া হয়েছিল।

সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে JSS-এর আগের অবস্থান নেই। শান্তিবাহিনীর যে অস্ত্র এক সময় তাদের নেতাদের রক্ষা করেছে, এখন সরকারের সাথে আপোস করায় এবং নীতি আদর্শচ্যুত হওয়ায় জনগণ আর তাদের রক্ষা করবে না। শান্তিবাহিনীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতকাল যাবৎ অস্ত্র ও শান্তিবাহিনী ঐ সমস্ত নেতাদের রক্ষা করেছে। আপোসচুক্তির পর তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই দরকার আর্মি, যেভাবে সরকারের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত দালালদের নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে আর্মি রয়েছে। JSS-এর নেতাদেরকেও একইভাবে আগামীতে সরকারের অনুগ্রহভাজন হয়ে আর্মি ছত্রছায়ায় থাকতে হবে। এটাকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে একটা ট্রাজেডিই বলতে হবে।

আমাদের জেনারেশানটা গোটা পরিস্থিতির শিকার। কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলোতে উৎসব আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। মিলিটারিদের অপারেশান কী জিনিস তা আমরা দেখেছি। ঘর পুড়ে যাওয়ার আগুন দেখেছি। দেখেছি মানুষের চোখেমুখে ভীতি, আতঙ্ক। একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপের বৈরী পরিবেশের মধ্যে আমরা বেড়ে উঠেছি। সে কারণে আমরা, আমাদের প্রজন্মটা, তথা গোটা জনগণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার। স্থায়ী সমাধানের জন্য সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ। একই সাথে এটাও আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শান্তি-সমাধানের নামে এমন কিছু যাতে না হয় যার মধ্যে চিরঅশান্তির বীজ লুকিয়ে থাকে।

আওয়ামী লীগের মতো একটা শাসকদল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান কতখানি করতে পারে সেই বিচার-বিশ্লেষণে যাবার অবকাশ এখানে নেই। আজকে এখানে যে আলোচনা হচ্ছে, এটা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে–এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক হতে বাধ্য। আওয়ামী লীগ দলটির কথাই বলতে হয়। ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল এই দলটি। বাস্তবে কতখানি স্বাধীনতা পূর্ববাংলার জন্য এ দলটি চেয়েছিল, সে জিজ্ঞাসার শেষ হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার স্বাধীনতার প্রতিভূ সেজে ক্ষমতায় এসেছিল। সে সময় তারা কী কী করেছে, তা সবার জানা।

আজ ১৯৯৭ সালটা শেষ হয় হয়। '৭১ সালে আওয়ামী লীগ ছিল অনেকটা একক দল কিন্তু ১৯৯৭-এ আর তা নয়। আওয়ামী লীগের মতো একই চরিত্রসম্পন্ন দল গজিয়ে উঠেছে, শক্তিও সঞ্চয় করেছে। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ির ফলে তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে পড়ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা গোটা দেশের জনগণের কাছে।

দেশের রুটি-রুজির সমস্যাকে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ নিয়মিত পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এর জন্য তাঁরা নিজেদের কপালকে দোষ দেন। কাদের

কারণে এসব হচ্ছে, তা তাঁরা জানতে চান না, বা ততটুকু মাথা ঘামাতেও তাঁরা রাজি থাকেন না।

আজকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু' সারা দেশের 'hot issue'-তে পরিণত হয়েছে। এই ইস্যু নিয়ে "স্বাধীনতা" "সার্বভৌমত্ব" শব্দগুলো বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে। এগুলো এখন অনেকটা catchword হয়ে গেছে। কারা অর্থাৎ কোন দলটি এই "স্বাধীনতা" "সার্বভৌমত্বের" যথার্থ রক্ষাকারী তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি এ দলগুলোর মধ্যেই তা প্রবল। এতে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হট্টগোল। এর বিপরীতে আজকে এখানে যে আলোচনা হচ্ছে, তার গুরুত্ব অনেক। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-বহির্ভূত শাসকগোষ্ঠীগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দেবার সময় এসেছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ঘনঘটার সময় দেশের প্রগতিশীল অংশটি সে সময়টা ঠিকভাবে হয়তো কাজে লাগাতে পারেনি। লক্ষ্যটা মহৎ হলেও তারা তখন অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। বর্তমান সময়ে দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য জনগণের মধ্যে একাত্ম-বোধ সৃষ্টি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকার জন্য ষড়যন্ত্র করে জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। এর বিপরীতে আসল ঘটনা ও তথ্য নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া দরকার প্রগতিশীলদের। তাহলে, জনগণ প্রকৃত অবস্থা বোঝার সুযোগ পাবেন। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে জনগণের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে হানাহানি বাধিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে চায়, তা আর সম্ভব হবে না।

আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করছি, তারা এই জিনিষটা কখনই মনে করি না যে–পাহাড়ি হলেই ভালো, দেশপ্রেমিক, সংগ্রামী কিংবা মঙ্গলকামী। পাহাড়িদের মধ্যেও অনেক দালাল আছে, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। একইভাবে, দেশের গোটা জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু পাহাড়িদের যে শত্রু নয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্য বিবেকবানদের এগিয়ে আসা উচিত।

এখানে একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্প্রদায়িক উস্কানির চিত্রটা পরিষ্কার হবে। গত বছর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়কার ঘটনা– খাগড়াছড়ি জেলার মাইসছড়ি বাজারে বৈসাবি উৎসবের আগেরদিন এক বাঙালি পকেটমার ধরা পড়ে গণপিটুনির শিকার হয়। পরে ঐ পকেটমারের পরিচিতি আর পকেটমার হিসেবে থাকল না। বাঙালি সেন্টিমেন্ট উস্কে দিয়ে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প সেখানে বিরাট এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। প্রথমদিকে পকেটমার গণপিটুনি খাবার পরও বাজারে কিন্তু দাঙ্গা হবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি, সবকিছু মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ পকেটমারের মার খাওয়াকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধানোর জন্য স্থানীয় সেনাসদস্যরা ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। বাজারের মসজিদ থেকে মাইকিং করে কোনো গণ্ডগোল হবে না বলে প্রচার করে। বাজার চৌধুরীকে নির্দেশ

দিয়ে ঢোল পিটানোরও ব্যবস্থা করে। পাহাড়িরা যখন বাজারে বৈসাবী উৎসবের কেনাকাটায় ব্যস্ত তখনই সেনাদের প্রত্যক্ষ মদদে সেটলাররা হামলা চালিয়ে দাঙ্গা বাধায়। এতে বহু হতাহত হয়। পকেটমার একজন অপরাধী, সে বাঙালি কিংবা পাহাড়ি যেই হোক সেভাবে দেখতে হবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ঘটনাকে কিভাবে চিত্রিত করে, দাঙ্গা বাধিয়েছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। পকেটমারকে আর পকেটমার হিসেবে না দেখে তাতে সাম্প্রদায়িক প্রলেপ দিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে।

আজকে আমরা যে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানাই, তার মানে তো এই নয় যে- পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব পাহাড়ি চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি বা সন্ত্রাস করে জেল খাটছে তাদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। অপরাধী যেই হোক, তার বিচার হওয়া উচিত, শাস্তি পাওয়া উচিত। আজকের আলোচনায় আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা টানলাম মাত্র। আমার আলোচনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও JSS-এর ডিগবাজির কিছু দিক তুলে ধরেছি। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে আমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের মাধ্যমে এদেশের জাগ্রত বিবেকের কাছে আহ্বান জানাব পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য।

* 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট' কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ওপর আলোচনা সভায় প্রদত্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের
পাহাড়ি গণ পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদকের রেকর্ডকৃত বক্তৃতা। ৬ নভেম্বর ১৯৯৭।

[বক্তা: সভাপতি, ইউপিডিএফ।]

ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয়: 'আদিবাসী'-ই সঠিক ও যথাযথ

রা জা দে বা শী ষ রা য়

১. সূচনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী ও সমতলের বিভিন্ন স্বল্প জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠীসমূহকে কী নামে অভিহিত করা যাবে তা একটি বিশেষ আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিও আলোচিত ও বিতর্কিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিককালের 'আদিবাসী' ও 'indigenous' শব্দ পরিহার করে 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহার করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে।[১] অনুরূপ পরামর্শ অতীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও দিতে দেখা গেছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী নেতা ও দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি উপরোক্ত মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তকে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার আহ্বান জানিয়েছে।[২] বাংলাদেশের আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা হল। তবে, উপসংহারে গিয়ে যেই সিদ্ধান্তে উপনীত তা আগে বলে ফেলা দরকার: বাংলাদেশের আদিবাসীদের 'আদিবাসী' পরিচয় অবশ্যই যথাযথ, সঠিক ও যৌক্তিক।

২. আইনের দৃষ্টিতে 'আদিবাসী', 'indigenous', 'উপজাতি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ

২.১ সাংবিধানিক আইন

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহকে সম্বোধন করার ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশনা বা পরামর্শ নেই। সংবিধানে লেখা আছে যে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"[৩] তবে, শর্ত থাকে যে, "নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"[৪] সংবিধানের এই বিধানাবলির বিষয়বস্তুগুলো হল সুযোগ ও

অধিকারবঞ্চিত নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। তবে তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা অপছন্দনীয়ভাবে অভিহিত করার কোনো ভিত্তি নেই।

২.২ দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন ও নীতিতে 'aboriginal', 'আদিবাসী' ও 'indigenous' দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে আদিবাসীদেরকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫০ সনের পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের পূর্ববঙ্গ আইন নং- ২৮)-এর ৯৭ ধারার মাধ্যমে সমতল জেলাসমূহের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের জমি বাংলাদেশের আদিবাসী ব্যতীত অন্য জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তির নিকট মালিকানা হস্তান্তরের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই ধারাতে আদিবাসীদেরকে "aboriginal castes and tribes" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] এই আইনটি সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ ও প্রথম তফসিলে অন্যান্য কিছু আইনসহ বিশেষভাবে সংরক্ষিত। সুতরাং সমতলের আদিবাসীদেরকে aboriginal (যা আদিবাসী শব্দের সমার্থক) হিসেবে অভিহিত করাকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তাই আমি কিছুটা ঠাট্টা করে আমার সমতলের আদিবাসী বন্ধুদের বলি "ভাই আপনারা তো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আগে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন।" ইদানিং কালের আরো দুটি আইনে আদিবাসী বা তার সমার্থক শব্দের প্রচলন দেখা যায়। এর মধ্যে সবচাইতে ইদানিংকালের আইন হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০। এই আইন প্রণয়ণের জন্য আমি সদাশয় সরকারকে অভিনন্দন জানাই। এই আইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির বিষয়ে বিধানাবলি প্রবর্তন করা হয়। অধিকন্তু, এই আইনের মাধ্যমে 'উপজাতীয়' শব্দের অবসান দিয়ে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ও 'আদিবাসী' শব্দের সূচনা করা হয়। এই আইনটি ১২ এপ্রিল, ২০১০ খ্রি: তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর একই তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এই আইনে 'নৃ-জনগোষ্ঠী' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানে 'আদিবাসী' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আইনটির তফসিলে ২৭টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী উল্লেখ আছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ এসেছে যে, অনেক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম এই তফসিলে বাদ পড়েছে। আমিও এ বিষয়ে একমত। অতএব, আদিবাসী নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে উক্ত তফসিলে বাদ পড়া জাতিগোষ্ঠীর নাম জরুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অনেকের সাথে একমত হয়ে এ বলব যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিরোনাম 'নৃ-জনগোষ্ঠী' না হয়ে 'আদিবাসী' হলে আরও ভালো হত। কারণ এই প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল আদিবাসী নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের ও উন্নয়নের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা ভাষাভাষী অথবা বাংলাদেশে বসবাসরত উর্দুভাষাভাষী বা অন্যকোনো নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য নয়, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ (বাঙালিও তো নৃগোষ্ঠী !)। এই আইন প্রণয়ণের আগে কতিপয় বিশেষজ্ঞের সাথে সরকার পরামর্শ করেছিল, আইনে কী শব্দ দিয়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা হবে এই বিষয় নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান

বিভাগের অধ্যাপক ড. এইচ কে আরেফিন, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম (বর্তমানে তথ্য কমিশনার) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জোবায়দা নাসরীন (কনা)। তিনজনই আমাকে বলেছেন তারা সরকারকে সংশ্লিষ্ট আইনটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী না বলে, 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আদিবাসী শব্দের সমার্থক শব্দ সম্বলিত অন্য ইদানিংকালের আইন হল: ১৯৯৫ সনের অর্থ আইন (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন), যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ব্যক্তি কর্তৃক আয়কর প্রদানের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে তাদেরকে indigenous hillman হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৬] অনুরূপভাবে indigenous hillman পদের প্রচলন CHT Regulation 1900 ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একাধিক নথি ও স্মারকেও দেখা যায়।[৭] এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৮ (PRSP, 2008)[৮] ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৯ (PRSP, 2009)[৯]-এ বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে "indigenous people" হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৫ (PRSP, 2005)- এ তাদেরকে adivasi হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১০]

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 –এ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহকে indigenous hillman অথবা indigenous tribe হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[১১] অন্যদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এ পার্বত্য আদিবাসীদেরকে "উপজাতি" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[১২]

২.৪ আদালতের রায়ে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ

বিভিন্ন স্তরের আদালতে ভিন্ন ভিন্ন আইনকে ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে আদিবাসীদেরকে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের Sampriti Chakma v. Commissioner of Customs (5 BLC, AD, 2000: 29)- মামলায় আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারীকে 'indigenous hillman' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

২.৫ সরকার-প্রধান কর্তৃক 'আদিবাসী' সম্বোধন ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত রেওয়াজকে সম্ভবত আমলে এনে বাংলাদেশের একাধিক সরকার প্রধান আদিবাসীদেরকে "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধন করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা ৯ আগস্ট ২০০৯ খ্রি: তারিখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় আদিবাসীদেরকে "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধন করেছেন।[১৩] এর পূর্বে ঐ একই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে মাননীয় ড.ফখরুদ্দীন আহমেদ (প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা) (২০০৮ সনে)[১৪] এবং মাননীয় খালেদা জিয়া, (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী) (২০০৩ সনে) আদিবাসীদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে সম্বোধন করেন।[১৫] অধিকন্তু, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর উপরোক্ত শুভেচ্ছাবাণীতে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) বাস্তবায়নের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণ ও ১৯৯৭ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা সরকারের উচ্চপর্যায়ের মহলে আই এল ও-এর আদিবাসী ও ট্রাইবেল জাতিগোষ্ঠী কনভেন্সন, ১৯৮৯ (ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples, 1989) এর অনুসমর্থনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জেনেছি।

২.৬ আদিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের আদিবাসীদের আইনি স্বীকৃতি রয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে। সুতরাং স্বীকৃতি নেই, এটা বলা যাবে না। তবে প্রত্যক্ষ ও সম্মানজনকভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা দিলে ভালো হত তবে সেরকম প্রত্যক্ষ নির্দেশনা না থাকলেও তারা মনগড়া কিছু লিখতে বা বলতে পারেন না, যেমন: আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। তা আইনানুগ হবে না। বরং সংবিধানের বৈষম্যবিরোধী বিধানসমূহের লংঘন হবে। একইভাবে সংগঠনের নামের কোনো অংশে বা প্রকল্পের কোনো ক্ষেত্রে 'indigenous' বা 'আদিবাসী' শব্দ থাকার কারণে একাধিক পার্বত্য অঞ্চলের এনজিও-কে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করা হয়নি অথবা দীর্ঘ বিলম্বের পর অনুমোদন দেয়া হয়। এটা হয়রানির সামিল ও আইন-বহির্ভূত। তবে, সংশ্লিষ্ট এনজিও-রা চাপের মুখে ও হয়রানির ভয়ে সুপ্রিম কোর্টের আশ্রয় নেয়নি। আমি আশা করব যে, বিষয়টি মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াই যথাযথ মীমাংসা হবে।

২.৭ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে indigenous বনাম tribe

২০০৮ সালে জাতিসংঘ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples গ্রহণ করে। উক্ত দলিলে বিশ্বের আদিবাসীদিগকে indigenous peoples হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১৬] এ-ছাড়া আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পক্ষে জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক বর্ষ ও দুটি আন্তর্জাতিক দশক (দ্বিতীয় দশক চলমান) উদযাপন করে এবং সেই একই পদ, 'indigenous peoples' ব্যবহার করেছে।[১৭] জাতিসংঘের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO)-র আদিবাসী ও ট্রাইবেল জাতিগোষ্ঠী কনভেন্সন, ১৯৮৯ [Indigenous and Tribal Peoples Convention,1989 (Convention No. 169)]-এ

indigenous এবং tribal উভয় শব্দের প্রচলন থাকলেও নব্বই দশক থেকে ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে tribal শব্দ পরিহার করা হয় এবং indigenous শব্দের প্রচলনই বেশি হতে থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মহলে tribal শব্দটির প্রচলন নেই বললেই চলে। বিশ্বব্যাংকের আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালায় {Operational Procedure (OP) 4.10 ও Bank Procedure (BP) 4.10} 'Indigenous Peoples' শব্দের সংজ্ঞাতে উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন দেশীয় আইন ও দলিলে tribes, tribals, ethnic minorities ইত্যাদি শব্দে অভিহিত জনগোষ্ঠীকে বিশ্বব্যাংক indigenous peoples হিসেবে পরিগণিত করবে।[১৮] অনুরূপভাবে Asian Development Bank (ADB)[১৯] ও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থা (যথা: DANIDA, NORAD, DFID)[২০] এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাসমূহের (যথা: UNDP, IFAD) Indigenous Peoples Policy -তেও অনুরূপভাবে indigenous শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[২১] Tribe বা tribal শব্দের সাথে বর্বর, আদিম, অনুন্নত ইত্যাদি ভ্রান্ত ও অসম্মানজনক ধারণা সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ শব্দসমূহের প্রয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে,[২২] যদিও-বা বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষাপটে এই শব্দসমূহের প্রচলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতেও দেখা যায়।[২৩] অন্যদিকে চীন, ভিয়েতনাম ও লাওস-এ ethnic minority শব্দের প্রচলন বেশি দেখা যায়। ফিলিপাইনে Indigenous People শব্দের প্রচলন রয়েছে। আর ইন্দোনেশিয়াতে Masyarakat Adat ("Customary Law People") শব্দটির প্রচলন রয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO)-র আদিবাসী ও ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী কনভেশন, ১৯৫৭ {Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (Convention No. 107)} বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৭২ সালে অনুসমর্থন করা হয়। এর পূর্বেও convention টি পাকিস্তান আমলে এ দেশে প্রযোজ্য ছিল যেহেতু ১৯৬০ সনে পাকিস্তান সরকার এই convention টি অনুমোদন করে। এই Convention-এর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশের বর্তমানে যারা আদিবাসী হিসেবে দাবি করছে তারা সন্দেহাতীতভাবে indigenous peoples-এর আওতাভুক্ত। কারণ এই convention-এর সংজ্ঞার সাথে সংহতি রেখে বাংলাদেশের এ সকল জাতিগোষ্ঠীসমূহ "উপনিবেশীকরণ", "রাজ্য বিজয়" বা "রাষ্ট্রের বর্তমান সীমানা প্রতিষ্ঠিত হবার" সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করত; উল্লেখ্য যে, এই convention-এ indigenous ও tribal দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকলেও এই convention-এর আওতাভুক্ত অধিকারসমূহ indigenous ও tribal জনগোষ্ঠী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হয়।

অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসমর্থন/অনুমোদনের সময় আপত্তিকর বিধানাবলির ব্যাপারে রাষ্ট্র reservation রাখতে পারে। তবে এই convention অনুসমর্থন বা অনুমোদনের সময় কোনো reservation করা যায় না। এই convention অনুসমর্থনের সময় বা পূর্বেও বাংলাদেশ সরকার indigenous শব্দের প্রয়োগের বেলায় কোনো প্রশ্ন তোলেনি। এখন তা তোলা অবশ্যই অযৌক্তিক ও মানবাধিকার-বিরোধী। আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার আইন ক্রমশ গতিশীল ও উদারপন্থী হয়। এটাই Customary International Law-এর স্বাভাবিক রেওয়াজ। জাতীয়ভাবেও তাই হওয়া উচিত। ১৯৯৭ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ও কতিপয় চুক্তি-উত্তর আইনে 'উপজাতি' শব্দ লেখা আছে বলে সে রেওয়াজ এখনও রেখে যেতে হবে এর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তাই, ২০১০ সনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা আইনে 'আদিবাসী' শব্দটি টেনে এনে সেই প্রগতিশীল ধারাকেই মেনে নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

৩. শব্দচয়ন: 'উপজাতি', 'tribal' ও 'আদিবাসী'

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, tribe বা tribal শব্দের বিরূপার্থক সংশ্লেষের কারণে indigenous শব্দকে {এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে aboriginal শব্দকে (যথা: কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়)} অধিক ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে tribe বা tribal ও উপজাতি শব্দের অর্থ একই মনে করা হলেও প্রায়োগিকক্ষেত্রে tribe বা tribal শব্দের চাইতে উপজাতি শব্দের মধ্যে অধিকভাবে বর্ণবাদী, জাত্যাভিমানী, জাতিবিদ্বেষী ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন দেখা যায়। এর কারণে বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের অনেকেই উপজাতি শব্দটিকে এবং এমনকি tribe / tribal শব্দকেও, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বর্তমানেও করে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগুলোর মধ্যে কেবল বাংলা ভাষায় tribe ev tribal শব্দসমূহ উপজাতি (আক্ষরিক অর্থে sub-nation) হিসেবে অনূদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতের হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাতে ইংরেজিতে indigenous এবং tribal এই দুই শব্দ adivasi (আদিবাসী) হিসেবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। আবার ভারতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দী শব্দ 'জনজাতি'রও প্রচলন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সংবিধানে ইংরেজি 'scheduled tribe'-কে হিন্দী সংস্করণে "অনুসূচিত (তফসিলি) জনজাতি" ও 'scheduled caste'-কে "অনুসূচিত (তফসিলি) জাতি" হিসেবে অনূদিত করা হয়েছে।[২৪] অনুরূপভাবে, নেপালি ভাষায় 'আদিবাসী' ও 'জনজাতি' এই দুই শব্দের প্রচলন দেখা যায় এবং নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সাংবিধানিক ও অন্যান্য আইনে এই দুই শব্দের প্রচলন একই সাথে দেখা যায়।[২৫] হিন্দী ও নেপালিতে 'উপজাতি' বা তার সমার্থক কোনো শব্দের প্রচলন দেখা যায় না। সুভাষ চন্দ্র সাংমা নামে এক শ্রদ্ধাভাজন মান্দি (গারো) নেতা ও ধর্মগুরু একবার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন "আমাদের গারোদেরকে যদি উপজাতি বলা হয়, আমার প্রশ্ন হল গারোরা তাহলে কোন জাতি থেকে উদ্ভূত?"

৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'আদিবাসী' / 'উপজাতি'/ 'indigenous'_ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

দেশের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যেমন: সান্তাল, ওরাওঁ, কোচ, রাজবংশী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষাভাষীরা সাধারণত 'আদিবাসী' হিসেবে সম্বোধন করে

থাকে। এটা যৌক্তিকভাবেই হয়ে এসেছে যেহেতু বরেন্দ্রভূমির বহু এলাকায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে এ সকল আদিবাসী মানুষেরা বসবাস করত। যদি এমনও হয়ে থাকে যে, সেই জনগোষ্ঠীসমূহের মানুষেরা ওখানে আগমনের কিছুকাল পূর্বে বর্তমানের ভারতের সীমানা থেকে এসেছে, সেই ক্ষেত্রেও তারা "আদি"-তে এসেছে (বাংলা ও উর্দুভাষী বাংলাদেশী অনেকের পূর্বপুরুষ ভারত, আফগানিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিলেন)। সুতরাং তাদেরকে 'আদিবাসী' বলা তথাপিও অযৌক্তিক নহে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ন্যায় হাজার হাজার বছর বসতি হয় নাই বলে তাদেরকে আদিবাসী বলা যাবে না, কথাটা অগ্রহণযোগ্য।

অনুরূপভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও দেখা যায় যে, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ মোট ১১টি পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীসমূহ বিগত ৫০০ বছরেরও অধিককাল ধরে (দক্ষিণ এশিয়ায় পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বে) পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করত। উদাহরণস্বরূপ পর্তুগিজ Cartographer, Joao de Barros-এর ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে "chacomas" (চাকমাদের অঞ্চল)-এর উল্লেখ দেখা যায়। তখন "chacomas" অঞ্চল বাংলার অংশ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বাংলা প্রদেশ বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অধিগৃহীত হবার আগে "chacomas" ও চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ অনেক আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল বাংলার অধীনে ছিল না।

১৮০০ শতকের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর কোনো স্থায়ী বসতি ছিল না। ১৮০০ শতকে চাকমাদের আমন্ত্রণে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে চাকমা জমিদারির অঞ্চলের কিছু বাঙালি কৃষক পরিবার রাঙামাটিতে হাল চাষ করার জন্য প্রথম প্রত্যাবর্তন করে। তারাই পার্বত্যাঞ্চলের প্রথম স্থায়ী বাঙালি বসবাসকারী। সুতরাং আক্ষরিক অর্থেও পার্বত্য আদিবাসীরা পার্বত্যাঞ্চলে নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে দাবি করতে পারে। তাছাড়া তারা তো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আদিবাসী হিসেবে দাবি করছে, ঢাকার বা দেশের অন্যত্র অঞ্চলের আদিবাসী হিসেবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালিরা 'পাহাড়ি' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তবে, ১৯৯৩-এর পর থেকে পার্বত্যাঞ্চলসহ দেশের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার রেওয়াজ চলে আসে। এটার মূল কারণ হল যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদের ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়ায় প্রক্রিয়াকে মেনে নেয়া হয় এবং তাদের মানবাধিকারের উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৫. আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বা indigenous peoples

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপন করে আসছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে আদিবাসীদের বসতি ছিল। পক্ষান্তরে, মিয়ানমার ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ন্যায় বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান অপেক্ষাকৃত ইদানিংকালের। প্রসঙ্গক্রমে অনেক ক্ষেত্রে, বাংলাভাষাভাষীসহ অন্যান্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীসমূহের বাংলাদেশে আগমনও অপেক্ষাকৃত ইদানিংকালের হতে পারে। তবে, বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যখন তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে সেখানে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিজিত করে বা খেদিয়ে দিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এরকম কোনো প্রমাণ মিলে না। সুতরাং সেক্ষেত্রেও তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক নয়। তবে, অবশ্যই পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে কোনো না কোনো এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিবাসনের মাধ্যমে নতুন অঞ্চল বা এলাকায় বসতি করেছিল। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত ত্রিপুরা তাই ঠাট্টা করে লিখেছিলেন, "সবাই তো এক পৃথিবীর মানুষ, মঙ্গলগ্রহ থেকে তো আর কেউ আসেনি।"[২৬] তবে যেই জাতিগোষ্ঠী কোনো স্থানে পূর্বে বসতি স্থাপন করে এবং কোনো এলাকার জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ লালনপালন করে সে ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু অগ্রাধিকার থাকাটা অন্যায় নয়, যদি-না তা অন্য কারো মানবাধিকারকে লংঘন করে। তথাপিও মনে রাখা দরকার যে– কোনো এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করা ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক উপাদান আছে যেগুলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ বা indigenous peoples -দেরকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। জাতিসংঘের প্রখ্যাত আদিবাসী বিষয়ক Special Rapporteur Erica I. Daes ও Special Rapporteur Jose Martinez Cobo প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৭] যথা: (ক) রাষ্ট্রীয় আইনের চাইতে প্রথাগত আইনের মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করা; (খ) প্রথাগত আইন কার্যকর করার জন্য সনাতনী অথবা ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি; (গ) একটি বিশেষ আবাসভূমির সাথে আত্মিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক; (ঘ) ধর্মীয় বহুমাত্রিকতা; (ঙ) আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার সাথে অসম্পৃক্ততা অথবা অত্যন্ত প্রান্তিক সম্পৃক্ততা; ও (চ) বর্তমানের রাষ্ট্রশাসন প্রক্রিয়ায় খুব জোর প্রান্তিক ভূমিকা থাকা। শেষোক্ত দুই বৈশিষ্ট্যই (ঙ ও চ) মানবাধিকার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সাংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত নগণ্য ছিল অথবা একবারেই ছিল না। বর্তমানেও সরকারের অংশ হিসেবে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একাধিক আদিবাসী ব্যক্তি থাকলেও আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে তাদের ভূমিকার সুফল দীর্ঘমেয়াদে

কতখানি থাকবে তা এখনও বোঝার সময় হয়নি । সে যাই হোক, উপরোক্ত প্রত্যেকটি উপকরণই বাংলাদেশের আদিবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী যে indigenous peoples তাতে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ আমি দেখি না। উটপাখীর মতো বালিতে মাথা পুতে আদিবাসী না-দেখার ভান করা যাবে, তবে তা বিশ্বদরবারে কেবল হাস্যকর দেখাবে ।

৬. উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশের আদিবাসীরাও উপনিবেশীকরণ, বৈষম্য ও প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচয়কে সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া। বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রত্যক্ষভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি হয় নাই এ কথা তো না। তবে, এই আদিবাসী পরিচয় সবাই মেনে নিলে বৈষম্য কমে যাবে এবং বাংলা ভাষাভাষী ও আদিবাসী মানুষের সম্পর্ক আরও উন্নতি লাভ করবে। বাংলাদেশের সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে দেশের সংবিধানে প্রত্যক্ষ, সম্মানজনক ও যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিলে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অধিকার কোনো মর্মে খর্ব হবে না। বরং বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর উদারতার প্রকাশ পাবে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি সমৃদ্ধ হবে এবং দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ILO Convention No. 169 অনুস্বাক্ষর করাটাও খুব জরুরি। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে তাই করেছে। এছাড়া, যেসব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে বাদ পড়েছে তাদের নাম যথাযথভাবে জরুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট পঞ্চম সংশোধনীর মামলার রায়ের মাধ্যমে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যে অগ্রযাত্রা শুরু হল তার যথাযথ বাস্তবায়নে আদিবাসীদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে বাংলাদেশের গৌরব আরো বাড়বে এবং দেশের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতায় যথাযথ প্রতিফলন ও বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রত্যাশা আমার, আরও অনেক আদিবাসীর ও অনেক গণতন্ত্রবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাংলাদেশী নাগরিকের।

তথ্যপঞ্জি

১. অশোক কুমার চাকমা, "Who decides Whose Indentity", The Daily Star, Dhaka, 24 February, 2010. অনুরূপভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করেছিল. দেখুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৯.০৪.২০০৬ খ্রি:

তারিখের স্মারক ও Raja Devasish Roy, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples and ILO Office Dhaka, Bangladesh July 2009, p. 7, footnote 31.

২. অশোক কুমার চাকমা,...দ্রষ্টব্য ।

৩. অনুচ্ছেদ ২৮(১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।

৪. অনুচ্ছেদ ২৮(৪), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।

৫. এই আইনে সান্তাল, গারো, হাজং, কোচ, মুণ্ডা ও ওঁরাও সহ ২১টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে ।

৬. অনুচ্ছেদ ২৭, ১৯৯৫ সনের অর্থ আইন (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) ।

৭. Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900- এর ৪, ৬ ও ৫২ নং বিধি ও তফসিল । জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯৬৭, ১৯৮০, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫-এর স্মারকেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয় ।

স্মারকের নাম্বারের জন্য দেখুন রাজা দেবাশীষ রায়, *The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review*, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples and ILO Office, Dhaka, Bangladesh, July, 2009, footnote no. 40.

৮. General Economic Division, Planing Commission, Government of Peoples Republic of Bangladesh, Moving Ahead: National Strategy for *Accelerated Poverty Reduction II (FY 2009-11)*("PRSP-II"), 2008.

৯. আরও দেখুন, Macro and Perspective Planning Wing, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, "Perspective Planning for Bangladesh: 2010-2021".

১০. General Economic Division, Planning Commission, Government of People's Republic of Bangladesh, *Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, October, 2005, . (FY 2009-11)*("PRSP-II"), 2008.

১১. ফুটনোট ৭ দ্রষ্টব্য ।

১২. দেখুন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ২,৪ ও ৬ নং ধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

আইন, ১৯৯৮-এর ২, ৫, ৭, ও ৮ নং ধারা।

১৩. সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2009.

১৪. সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2008.

১৫. সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2003.

১৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৬১/২৯৫ নং রেজুলেশন দ্বারা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রি. তারিখে গৃহীত।

১৭. জাতিসংঘ ১৯৯৩-কে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা দেয় এবং ১৯৯৫-২০০৪ এবং ২০০৫-২০১৪-কে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা দেয়।

১৮. Operational Policy 4.10-এর ৩ নং ধারাতে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে: "*Identification.* Because of the varied and changing contexts in which Indigenous Peoples live and because there is no universally accepted definition of "Indigenous Peoples," this policy does not define the term. Indigenous Peoples may be referred to in different countries by such terms as "indigenous ethnic minorities," "aboriginals," "hill tribes," "minority

nationalities," "scheduled tribes," or "tribal groups."

১৯. ২০ জানুয়ারি, ২০১০ থেকে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এর "Environment, Involuntary Resettlement and Indigenous Peoples" সংক্রান্ত নতুন পলিসি কার্যকর হয়। এখানে বিশ্বব্যাংক-এর 'indigenous peoples'-এর সংজ্ঞায় **ন্যায়/নিয়ে** অনুরূপ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

২০. দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাদের মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, স্পেন ও নেদারল্যান্ড-

এর আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। এর মধ্যে ডেনমার্ক সরকারের নীতিমালা (Danish Ministry of Foreign Affairs, 2004. *Strategy for Danish Support to Indigenous Peoples*, Ministry of Foreign Affairs, 2, Asiatisk Plads,DK-1448 Copenhagen K. Denmark (http://www.netpublikationer.dk/um/5751/index. htm) সবচাইতে উদারপন্থী।

২১. জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে UNDP ও IFAD-এর বিশেষ আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে।

২০০৯-এ গৃহীত IFAD এর নীতিমালা তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল।

২২. সীমিত পরিসরে এই শব্দ বা তার প্রতিশব্দ আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও ভারতে ব্যবহার হলেও

আগের চাইতে অনেক কম।

২৩. কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে 'aboriginal ' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায়, যদিও-বা কানাডাতে

'indigenous' ও "First Nations" শব্দেরও প্রচলন রয়েছে।

২৪. দেখুন, যথা, Article 46, Constitution of India.

২৫. Draft Constitution of Nepal. দেখুন UNCESCR, UN Document E/C.12/NPL/Co/2,
paragraph 28 ও the National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act of Nepal (2002).

২৬. প্রশান্ড় ত্রিপুরা, "আন্ড়র্জাতিক আদিবাসী দশক", "Year of the Indigenous People", Dhaka,
1993

২৭. দেখুন: Jose Martinez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations,* 1986, UN Document: E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4. Erica-
Irene Daes, (i) *Reports on the Study: Indigenous Peoples and their Relationship to*
Land (1997), E/CN.4/Sub.2/1997/17, (ii) *Indigenous Peoples: Permanent Sovereignty Over Natural Resources (2002),* E/CN.4/Sub.2/2002/23, (iii) *Indigenous Peoples: Keepers Of Our Past – Custodians Of Our Future*,
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen, 2008.

[লেখক: চাকমা রাজা। এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট।]

আদিবাসী জনগণ ও জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান

ম ঙ্গ ল কু মা র চা ক মা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫ হাজার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ৩০ কোটি আদিবাসী রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ লক্ষের অধিক আদিবাসী বাংলাদেশে রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে মোট আদিবাসী (সরকারি ভাষায় 'উপজাতি') জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫,০১,১৪৪ জন। কিন্তু আদিবাসীরা

মনে করেন, তাদের প্রকৃত জনসংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে অনেক অনেক বেশি। তাদের অভিযোগ, আদমশুমারিতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে তাদের গণনা করা হয় না, কিংবা প্রান্তিকীকরণের লক্ষ্যে তাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম দেখানো হয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের জাতিগত সংখ্যা নিয়েও রয়েছে বিস্তর বিভ্রাট। কেউ দাবি করেন, তাদের জাতিগত সংখ্যা ৪৫। কেউ আবার তার চেয়ে বেশি, কেউ-বা কম দাবি করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কথা ধরা যাক। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরা ১০ ভাষাভাষীর ১১টি জাতি। কিন্তু সরকারিভাবে বলা হয় ১৩টি জাতি। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। ভুল তথ্য হলেও এটা এতই ব্যবহার হয়ে আসছে যে অধিকাংশ মানুষ বুঝে বা না-বুঝে ১৩টি উল্লেখ করে থাকেন। প্রায়ই লক্ষ করা যায় যে, ম্রো ও মুরং'কে আলাদা জাতি হিসেবে দেখানো হয়। তেমনিভাবে ত্রিপুরা, উচই ও রিয়াং প্রভৃতি এক একটি জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এর সবই ত্রিপুরা জাতি। বস্তুত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য ও গবেষণার অভাবের কারণে এই তথ্যবিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট বুদ্ধিজীবী ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের দাবি হচ্ছে– আজ যারা বাংলাদেশে নিজেদের এ দেশের আদিবাসী হিসেবে দাবি করছে তারা আদিবাসী নয়। তারা ভিন দেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠী। তাদের মতে, এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা যায় না, বলা যায় উপজাতি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করা যাক উপজাতি শব্দটি নিয়ে। 'উপজাতি' বা 'Tribe' শব্দটি উদ্ভব হয়েছে ইউরোপীয় উপনিবেশিকতার উত্থান এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতি-বর্ণভিত্তিক ভাবাদর্শ থেকে। উপনিবেশিকতাবাদের যখন খুব রমরমা অবস্থা, তখন কিছু জনগোষ্ঠীকে উপজাতি বা 'Tribe' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিরাষ্ট্র গঠনের পরও এই শব্দটির ব্যবহার অব্যাহত থাকে এবং প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠী ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট এ শব্দটির ব্যবহার আরো ব্যাপক মাত্রা লাভ করে। অধীনস্থ জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকগতভাবে প্রান্তিকীকরণের লক্ষ্যেই শাসকগোষ্ঠীর নিকট এ শব্দটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত জাতিরাষ্ট্রে এ শব্দটি এখনো ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে।

'উপজাতি' বলতে এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বিদ্বেষপ্রসূত। যেমন– লেখ্যরূপবিহীন ভাষা, সর্বপ্রাণবাদ, আদিমতা, পশ্চাৎপদতা, অসভ্য, ভবঘুরে জীবন-জীবিকা, আদিম সমাজের মানুষের মতো পশু-পাখি শিকার ও খাদ্য আহরণ, খাদ্যাভ্যাসে মাংসাশী, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন, মদ্যপান ও নৃত্যে আসক্তি, জংলিপনা, সাপ-ব্যাঙ খাওয়া, পচা-মজা খাওয়া ইত্যাদি বিদ্বেষপ্রসূত অর্থে কোনো জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। কিন্তু 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত কোনো জনগোষ্ঠীই এসব ধারণাকে তাদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাপক বলে মনে করেন না। তাই নয়, এসব ইন্দ্রিয়বোধবিহীন মানদণ্ড আসলে প্রভুত্ব বিস্তারকারী জনগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থক প্রতিষ্ঠানগুলোরই উগ্র জাতি-বর্ণবিদ্বেষী ভাবাদর্শেরই

প্রতিফলন ঘটায় বলে মনে করা হয়। তাই 'উপজাতি' শব্দটি কখনোই অন্যান্য আদিবাসীসহ আমরা কেউই গ্রহণ করতে পারি না।

এবারে আলোচনায় আসা যাক, যারা আজ নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করছেন তারা আদিবাসী কিনা। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিতর্কে না গিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা নিয়ে তলিয়ে দেখা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা যায় কিনা। জাতিসংঘের Special Rapporteur Mr. Martimez Cobo-এর ১৯৮৪ সালে প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে–

"Indigenous Communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion are pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from the other sections of the societies now prevailing in those territories, or parts of them, they form at present nondomi-nant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity as the basis of their continued existence as peoples in accordance with their own cultural patterns social insti-tutions and legal systems. In short, indigenous peoples are the descendants of the original inhabitants of a territory overcome by conquest by settlement alliance."

১৯৮৯ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ওখঙ) ১৬৯ নং কনভেশনে আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

"Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabitat-ed the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establish-ment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their social economic, cultural and political institutions."

বিশ্বব্যাংকের Operational Directive 4.20, 1991-এ আদিবাসী বলতে কাদের নির্দেশ করা হয় তার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এতে বলা হয়েছে যে–

"The terms 'indigenous people', 'indigenous ethnic minorities', and 'scheduled tribes' describe social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process. For the purposes of this directive 'indigenous people' is the term that will be used to refer to these groups within their national constitutions, status and relevant legislation, many of the Bank's borrower countries include specific definitional clauses and legal frameworks that provide & preliminary basis for identi- fying indigenous peoples.

Because of the varied and changing contexts in which indigenous peoples are found, no single definition can capture their diversity. Indigenous peoples are commonly among the poorest segments of a population. They engage in economic activities that range from, shifting agriculture in or near forests to wage labour or evensmall-scale market-oriented activities. Indigenous peoples can be identified in particular geographical areas by the presence in vary- ing degree of the following characteristics : a close attachment to ancestral territories and natural resources in these areas; self-iden-tification and identification by others as members of a distinct cultural groups; an indigenous language, often different from the national language; presence of customary social and political institutions; and primarily subsistence-oriented production."

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞায় আদিবাসী জনগণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো স্বীকৃত হয়েছে সেসব বিন্যাস করলে দেখা যায় যে–

১. কোনো ভূখণ্ডের প্রথম বসবাসকারী মূল অধিবাসীদের বংশধর হিসেবে আদিবাসীদের চিহ্নিত করা চলে;

২.বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনে তারা অপ্রধান/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত এবং ঔপনিবেশিক পরাধীন অবস্থায় বসবাস করতে হয়;

৩.তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও ভাবধারাকে মেনে চলে এবং তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখণ্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

৪.অন্য কোনো সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আদিবাসীরা বর্তমান ভূখণ্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করত এবং ঐ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও ভোগদখল করত;

৫.তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক সত্তার অধিকারী এবং এর ফলে তাদের সংখ্যাগুরু প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়;

৬.তারা রাষ্ট্র ও সংখ্যাগুরু প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে অধীনস্থ ভূমিকায় থাকতে বাধ্য হয় এবং তারা সাধারণত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভেদের শিকার হয় ।

মানবজাতির ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে, মানুষ এক ভূখণ্ড থেকে আরেক ভূখণ্ডে , এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে চলে গেছে এবং পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে । মানুষের এই প্রবহমান গতিশীলতা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রভাব একটি বিশ্বজনীন

প্রক্রিয়া। সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে দেখা গেছে, অধিকতর আগ্রাসী জনগোষ্ঠীগুলো আর্থিকভাবে ও সামরিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর ভূখণ্ডেই আধিপত্য বিস্তার করছে এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে ভৌগোলিক ও পরিবেশগতভাবে অধিকতর ভঙ্গুর ভূখণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের হাতে সামান্য পরিমাণে স্ব-শাসনের অধিকার দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বময় অগ্রগতির ফলে এই ঔপনিবেশিক আগ্রাসী নীতি আরো চরম আকার ধারণ করে। এভাবে সরল জনগোষ্ঠীগুলোর পৌনঃপুনিক আগ্রাসনের ফলে কোনো কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী একাধারে বৈদেশিক ঔপনিবেশিকতা ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতার শিকার হয়। যা হোক, আমরা উপরোক্ত উপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এবং উপরে বর্ণিত সংজ্ঞায় স্বীকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্ম জনগণ আদিবাসী কিনা তা বিশ্লেষণ করতে পারি।

এ-কথা নতুন করে বলার অবকাশ নেই যে, একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরা এই অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য পত্তন করেছিল। মোগল আমল এবং ব্রিটিশ শাসনামলের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত তারা স্ব-শাসন ভোগ করত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত চিফ অব চিটাগং মি. হেনরি ভেরোলিস্ট ১৭৬৩ সালে এক দলিলে এই রাজ্যটির সীমানা উল্লেখ করেন যে, 'পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড), দক্ষিণে সাঙ্গু নদী, পূর্বে কুকী রাজ্য (ভারতের বর্তমান মিজোরাম রাজ্য) এবং উত্তরে ফেনী নদী'। উল্লেখিত বর্ণনায় দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারোটি জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি তখন বর্তমানের বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার কিয়দংশ এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। সন্দেহ নেই, অধিকতর আগ্রাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী আদিবাসী জুম্মদের আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতার সুযোগে বর্তমান রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে নিতে নিতে বর্তমান পর্বতসংকুল ও ভঙ্গুর পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইতিহাসের এত পেছনে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই, বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসকে অনুসন্ধান করলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে ভিন্ন দশ ভাষাভাষী জুম্ম প্রথম বসবাসকারী মূল আদিবাসীদের বংশধর সন্ধান পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বিগত এক শতাব্দীর জনসংখ্যাবিন্যাস তুলে ধরা হল–

সারণি ১ : আদিবাসী ও বাঙালি জনসংখ্যাবিন্যাস

সন	আদিবাসী জুম্ম		বাঙালি	মোট বাঙালি	
	জনসংখ্যা	শতকরা হার	জনসংখ্যা	শতকরা হার	বাঙালি বৃদ্ধির (%)
১৯৪১	২,৩৯,৭৮৩	৯৭.০৬	৭,২৭০	২.৯৪	২,৪৭,০৫৩
–					
১৯৫১	২,৬৯,১৭৭	৯৩.৭১	১৮,০৭০	৬.২৯	২,৮৭,২৪৭
২৪.৮৫					
১৯৬১	৩,৩৯,৭৫৭	৮৮.২৩	৪৫,৩২২	১১.৭৭	৩,৮৫,০৭৯
২৫.০৪					
১৯৭৪	৩,৯২,১৯৯	৭৭.১৭	১৬,০০০	২২.৮৪	৫,০৮,১৯৯ ১৯.৬৮
১৯৮১	৪,৪১,৭৭৪	৫৮.৭৭	৩,১৩,১৮৮	৪১.৪৮	৭,৫৪,৯৬২ ৩৮.৫৭
১৯৯১	৫,০১,১৪৪	৫১.৪৩	৪,৭৩,৩০১	৪৮.৫৭	৯,৭৪,৪৪৫ ৩৩.৮৩

উল্লেখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৪১ সালে বাঙালি জনসংখ্যা মাত্র ৭,২৭০। এ জনসংখ্যাকে তৎকালীন সামন্তপ্রভুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের লাঙ্গল চাষ পত্তন করার জন্য বসতি দিয়েছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষী জুম্মদের পূর্বপুরুষরাই এই অঞ্চলের প্রথম বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। ক্রমে ক্রমে বর্তমান প্রভুত্বকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী অভিবাসনের ফলে জুম্মরা অপ্রধান/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের স্ব-শাসন ব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের শাসনামলে ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ হতে থাকে এবং একসময়ে পূর্ণমাত্রায় ছিনিয়ে নেয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক জেলা হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে জুম্মদের স্ব-শাসন ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামলে এসে পূর্ণমাত্রা লাভ করে। আজ বর্তমান বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্র ও প্রভুত্বকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আদিবাসী জুম্মরা অধীনস্থ ভূমিকায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে এবং নানা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, দশ ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্মদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান প্রভুত্বকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তারা স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। তাদের শারীরিক ও মানসিক গড়ন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রভুত্বকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। তারা প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করে। তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ভাবধারা ও মূল্যবোধকে মেনে চলে এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভূখণ্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। তারা ব্রিটিশ শাসনামলের শেষপ্রান্ত

থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুসারে উপনিবেশিকতার শিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়, যাদের স্বকীয় নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ধরে রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে তাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে আদিবাসী বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে সেই অর্থে বাংলাদেশে 'উপজাতি' নামে যেসব জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সবাইকে আদিবাসী হিসেবে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যায়। বস্তুত কোনো ভূখণ্ডে কাদের পূর্বপুরুষ প্রথম বসতিকারী সেটা মুখ্য বিষয় নয়, যেসব জনগোষ্ঠী তথাকথিত সভ্যতার শিকার হয়ে রাষ্ট্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং যাদের উপজাতি, আদিম ইত্যাদি বিদ্বেষমূলক আখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে তারা সবাই আদিবাসী'র বৈধ দাবিদার।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে দশ ভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডে আদিবাসী ও মূল ভূমিপুত্রের বংশধর। জাতিসংঘের, Rapporteur Mr. Miguel Alfonso Martinez Cobo তাঁর গবেষণাপত্র Study of the problems of Discrimination Against Indigenous Populations-এ এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ বা স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে–

> "In Bangladesh, the Government states that the members of Tribal or Semi-tribal populations are regarded as indigenous 'on account of their descent from the populations which are settled in specfied geographical areas' of the country."

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্র গোড়া থেকেই এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু ব্রিটিশ পাকিস্ড়ান ও অধুনা বাংলাদেশে অনেক সরকারি দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বা হয়ে আসছে।

ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এই অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক শাসনতান্ত্রিক ও আইনি দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই শাসনবিধি এখনো চালু রয়েছে। উক্ত শাসনবিধির ৪, ৬, ৩৪, ৪৫, ৫০ প্রভৃতি ধারায় 'Indigenous Hillman' (আদিবাসী পাহাড়ি) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত শাসনবিধির তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনসমূহের মধ্যে The Indian Income Tax Act of 1922, The Indian Finance Act of 1941, The Forest Act of 1927 প্রভৃতির মধ্যে 'indigenous hillmen' শব্দটি উল্লেখ ছিল। বিশেষত The Indian Income Tax Act of 1992-এ বলা হয় যে–

> The Indian Income Tax Act of 1922 shall apply to all persons in the Chittagong Hill Tracts except the indigenous hillmen.

উক্ত আইনটি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের শাসনামলের বিভিন্ন সময়েও 'Indigenous Hillmen'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে বিভিন্ন সরকারি পরিপত্রে উল্লেখ করা

হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ মূলে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে,

"চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতীয় চাকরির বয়সসীমা স্বাভাবিক বয়সসীমার তুলনায় ১০ বৎসর এবং শ্রমসাধ্য কর্মের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হইয়াছে।"

১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২ নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ লেখা সরকারি পরিপত্রেও 'আদি গিরিবাসী' (Indigenous hillman) উল্লেখ করা হয়।

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জাতীয় আদিবাসী সমন্বয় কমিটির প্রকাশনা 'সংহতি ২০০০'-এর প্রদত্ত বাণীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং বাংলাদেশে ২০ লাখ আদিবাসী রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তার বাণীতে উল্লেখ করেন যে–

"বাংলাদেশের ২০ লাখ আদিবাসীসহ বিশ্বের ৩০ কোটি আদিবাসী জনগণকে এ উপলক্ষে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।... বাংলাদেশে চাকমা, খাসি, গারো, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, উঁরাও, মুণ্ডা, হাজং, কোচ, চাক, রাখাইন, মনিপুরীসহ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো অনেক জাতিসত্তার মানুষ আবহমানকাল ধরে বসবাস করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ আদিবাসীদের অবদান ছিল গৌরবের। আদিবাসীদের

গান, গল্প, উপকথা, মুখে মুখে চলে আসা সাহিত্য, বৈচিত্র্যময় নৃত্য ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিসম্ভার আমাদের মূল্যবান সম্পদ।"

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারি বিভিন্ন আইন, পরিচয়পত্র ও দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করলেও সরকার এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে আদিবাসী জাতীয় অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে চলেছে। বিশেষত জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে 'বাংলাদেশে আদিবাসী নেই' বলে সরকার স্ববিরোধী বিবৃতি দিয়ে আসছে। সরকারের এই বক্তব্য কোনো জোরালো যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মূলত আদিবাসী জনগণকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার হীন উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্র এই অবস্থান গ্রহণ করেছে। আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের সমমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ যখন চলছে, তখন বাংলাদেশে বসবাসরত তথাকথিত 'উপজাতীয়'দের আদিবাসী বলে স্বীকার না করার অন্যতম কারণ হল এই স্বীকৃতির অর্থ হবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গীকার করার শামিল। তাই এই অধিকার থেকে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের যাতে বঞ্চিত রাখা যায় সেজন্য আদিবাসীদের ওপর দমন-পীড়ন, বৈষম্য তথা অধিকার হরণের ইতিহাসকে সরকার গোপন করার নানাভাবে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের দৃষ্টিতে আদিবাসী জনগণ

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। উক্ত সনদে সর্বপ্রথম মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই এককভাবে অথবা যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারেন এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে কাউকেই যথেচ্ছভাবে বঞ্চিত করা চলবে না বলে উক্ত সনদের ১৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়। উক্ত অধিকার ব্যক্তির পেশা এবং সম্পত্তি অধিকারের সূত্রেই সমষ্টি অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে মাত্র। আদিবাসী জনগণের সম্পত্তির ওপর সামাজিক বা সমষ্টিগত অধিকারের কথা এই ব্যাখ্যায় আনা হয়নি। এই স্বীকৃতি মানবজাতির একটি বিরাট জয় হলেও এতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারের কথা কোথাও উল্লেখ ছিল না। বস্তুত এই ঘোষণাপত্র পশ্চিমা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের চিন্তাধারা-প্রসূত ছিল এবং এজন্যই আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তাদের সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার বিষয়সমূহ এই সনদে স্বীকৃত হয়নি।

১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ Convention on Economic, Social and Cultural Rights এবং Convention on Civil and Political Rights ঘোষণা করে। উক্ত দুটি কনভেনশনেই ঘোষণা করা হয় যে, সব মানুষেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বলেই স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করা এবং স্বাধীনভাবেই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক উপনিবেশিকতাবাদের হাত থেকে মুক্তির বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও উক্ত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য বলে নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে। Convention on Civil and Political Rights-এর ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে–

> "যেসব রাষ্ট্রে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু বাস করেন, সেখানে ঐ সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মানুষেরা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগতভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করার ও প্রচারের অধিকার এবং নিজেদের ভাষা ব্যবহারের অধিকার নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করবে।"

উপনিবেশিকতা-উত্তরকালে জাতিরাষ্ট্র গঠন এবং জাতিরাষ্ট্রের 'এক জাতি এক দেশ' ভাবাদর্শের কারণে আদিবাসী জনগণ উক্ত কনভেনশনের মাধ্যমে তেমন একটা উপকৃত হয়নি। বরং আদিবাসীদের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা বরাবরই রয়ে গেছে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯৫৭ সালে Indigenous and Tribal Populations Convention (১০৭ নং) গ্রহণ করে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিকাশসাধন এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো দায়িত্ব পালন করবে। এই কনভেনশনে আদিবাসী জনগণের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা এবং আর্থিক নিরাপত্তা ও বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণসহ তাদের বৈষয়িক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির

কথা স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এসব অধিকার স্বীকৃত হলেও এই কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সমাজের (মূল স্রোতধারার) সাথে সংহতিকরণের (assimilation) ব্যাপারে সহায়তা করা। কিন্তু দেখা যায় যে, আদিবাসীদের সংহতিকরণ বিষয়টি শাসকগোষ্ঠী তাদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে থাকে। আদিবাসীদের রাজনৈতিক সংহতিকরণকে সাংস্কৃতিক অঙ্গীভূতকরণ হিসেবে প্রয়োগ হতে থাকে। ফলে সম্পদের ওপর আদিবাসীদের চিরাচরিত/প্রথাগত অধিকারকে অস্বীকার করা হয় এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

দ্বিতীয়ত আদিবাসী বলতে কাদের বুঝায় তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকার কারণে এর অপব্যবহার হতে থাকে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে আইএলও ১৯৫৭ সালের কনভেনশনটি পুনরালোচনা ও পরীক্ষার জন্য ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির সুপারিশমূলে আইএলও ১৯৮৯ সালে ১৬৯ নং কনভেনশনে জাতীয় মূল স্রোতধারার সাথে সংহতিকরণের পরিবর্তে আদিবাসীদের স্বকীয় জীবনচর্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সংস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মসত্তা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং আদিবাসী বলতে কাদের বুঝায় তার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। এতে আদিবাসীদের স্বার্থযুক্ত কোনোও ব্যাপারে সংসদীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার আগে যথাযথ উপায়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা, জাতীয় আইনব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও আদিবাসীদের স্বকীয় সত্তা ও আচারনীতি বজায় রাখা, ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখল করছে এমন সব জমির ওপর আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত অধিকার ও স্বত্ব প্রভৃতি অধিকারসমূহ স্বীকার করা হয়। আইএলও'র ১০৭ নং কনভেনশনে অনেক রাষ্ট্র স্বাক্ষর করলেও সদস্যভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্রই ১৬৯ নং কনভেনশনে স্বাক্ষর প্রদান করেনি।

আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য-সমস্যার ওপর জাতিসংঘের গবেষণা

১৯৭০ সালের জাতিসংঘের Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যনীতির সমস্যা নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭১ সালে Mr. Miguel Alfonso Martinez Cobo-কে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এই ধরনের বৈষম্য নিরসনে জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক স্ড়রে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গবেষণার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে গবেষণার পর Study on the problems of Discrimination Against Indigenous Populations শিরোনামে ২২টি অধ্যায়বিশিষ্ট ১৪০০ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. আদিবাসী বলতে কাদের বোঝায় তা সংশ্লিষ্ট মানুষদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা।

২. আদিবাসীদের অধিকার সংবলিত একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র প্রণয়ন এবং আদিবাসীদের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি Working Group on Indigenous Populations স্থাপন করা এবং উক্ত Working Group-এর অধিবেশনে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা।

৩. আদিবাসীদের জমি ও তাদের অঞ্চলের সব সম্পদের ওপর তাদের স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করা।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ

উক্ত সুপারিশ মূলে ১৯৮২ সালে Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (বর্তমানে এর নাম পরিবর্তন করে Sub-commission of the Promotion and Protection of Human Rights করা হয়েছে) কর্তৃক ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি Working Group on Indigenous Populations (WGIP) স্থাপন করা হয় (Resolution 1982/38 of May 1982)।। এই WGIP স্থাপনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। WGIP-এর অধিবেশন সাধারণত প্রত্যেক বছর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনে সরকারি ও আদিবাসী প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, গবেষক (Academic) প্রভৃতি প্রতিনিধিবৃন্দ পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে থাকেন। সরকারি ও আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান ছাড়াও ওয়ার্কিং গ্রুপের দুটি আনুষ্ঠানিক কাজ হচ্ছে–

১. জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নসম্পর্কিত অগ্রগতির পর্যালোচনা করা; এবং

২. বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করা।

ওয়ার্কিং গ্রুপ তার অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের পেশকৃত লিখিত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতির মান পর্যালোচনা করে থাকে। এছাড়া ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপার্সন-র‍্যাপোটিয়ার সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ এবং আদিবাসীদের অধিকারসংক্রান্ত জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং মান নির্ধারণের (Standard setting) ক্ষেত্রে বিষয়সমূহ (issue) শনাক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করে থাকেন।

খসড়া ঘোষণাপত্র বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ

ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী ও সরকারি প্রতিনিধিদের পেশকৃত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে আদিবাসীদের অধিকারসংক্রান্ত মান নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে ওয়ার্কিং গ্রুপ আদিবাসী অধিকারসংক্রান্ত খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়নের কাজ শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১১তম অধিবেশনে ৪৫টি অনুচ্ছেদ সংবলিত আদিবাসী অধিকারবিষয়ক খসড়া ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হয় এবং তা Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorites-এ পেশ করা হয়। উক্ত খসড়া ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে সাব-কমিশন তা Commission on Human Rights-এ ১৯৯৪ সালে পেশ করে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের মধ্যে উক্ত খসড়া ঘোষণাপত্র জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের পূর্বে আরো বিস্তৃতি ও দফাওয়ারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে Commission on Human Rights কর্তৃক ১৯৯৫ সালে Open-ended Inter Sesional Working Group on the Draft UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (WGDD) স্থান করা হয়। Resolution 1995/32 of 3 March 1995)। উক্ত Working Group শুধুমাত্র জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। তবে উক্ত WGDD-এর অধিবেশনে Economic and Social Council (ECOSOC)-র অনুমোদিত Consultative Status সম্পন্ন বেসরকারি সংস্থা ও আদিবাসী সংগঠনসমূহেরও অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া Commission on Human Rights যেসব আদিবাসী সংগঠনের ECOSOC Status নেই তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য পদ্ধতি তৈরি করে। WGDD অধিবেশন সাধারণত প্রত্যেক বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

এই খসড়া ঘোষণাপত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির মধ্যে একটি। জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; গণহত্যা ও জাতীয় অস্তিত্ব নিশ্চিহ্নকরণ থেকে সুরক্ষা; ধর্মীয় অধিকার; ভাষা ও শিক্ষার অধিকার; আদিবাসী ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মালিকানা স্বত্ব ও দখল বা ব্যবহার; সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবস্থা সংরক্ষণ; শিকার, মাছ ধরা, পশুপালন, সমাবেশ, কাঠ সরাই এবং চাষাবাদসহ প্রথাগত অর্থনৈতিক প্রণালি ও জীবনধারা বজায় রাখা; পরিবেশ সংরক্ষণ; আদিবাসীদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে এমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ; আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার; আদিবাসী সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বা স্থানীয় বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন; রাষ্ট্র সীমানার বাইরে প্রথাগত সম্পর্ক এবং সহযোগিতা; এবং আদিবাসী সংশ্লিষ্ট সন্ধি ও চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ

আদিবাসীদের অধিকার ও স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারসংবলিত ১৯টি মুখবন্ধ ও ৪৫টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়।

২০০০ সাল পর্যন্ত WGDD-এর ৬টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের আপত্তির মুখে আজ অবধি উক্ত আদিবাসী অধিকারসংবলিত খসড়া ঘোষণাপত্রের একটি অনুচ্ছেদও গৃহীত হয়নি। আদিবাসী প্রতিনিধিদের অভিমত হচ্ছে খসড়া ঘোষণাপত্রে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার কোনোরূপ সংশোধন ছাড়াই গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সংশোধন ছাড়া গ্রহণ করতে রাজি নয়। বিশেষত কতগুলো মৌলিক বিষয় (core issues) যেমন– আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার, আদিবাসীদের 'Peoples' হিসেবে গণ্য করা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে। তাদের মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ও স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর আদিবাসীদের 'Peoples' হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে জাতিসংঘের আইনানুসারে আদিবাসীরা স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। তাই এ রাষ্ট্রগুলোর প্রস্তাব হচ্ছে 'Indigenous Peoples'-এর পরিবর্তে Indigenous individual' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করা। বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণে কোনো কোনো আদিবাসী জাতি সম্মত থাকলেও কোনো কোনো আদিবাসী তা গ্রহণে সম্মত নয়। কোনো কোনো রাষ্ট্র এমনও প্রস্তাব করেছে যে, ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত আদিবাসীদের অধিকারসমূহ স্ব স্ব দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলাই বাহুল্য, এই প্রস্তাব গ্রহণে যদি বাধ্য করা হয় তাহলে ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের অধিকার বলে কিছু থাকবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। পক্ষান্তরে Indigenous শব্দের পরিবর্তে Indigenous individual শব্দ প্রতিস্থাপনে সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীই তীব্র বিরোধিতা করছে। ফলে আদিবাসী অধিকারসংবলিত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এক অচলাবস্থাই বিরাজ করছে বলে বলা যেতে পারে। তবে আশার কথা যে, খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় রাষ্ট্র বিশেষত ডেনমার্ক, গ্রিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের অবস্থান আদিবাসীদের অনুকূলে রয়েছে।

আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরাম

আদিবাসী বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরাম স্থাপনের জন্য সর্বপ্রথম দাবি ওঠে জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনে। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনে এ বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ভিয়েনা সম্মেলনে এ ফোরাম গঠনের জোরালো

সুপারিশ করা হয় এবং তদনুসারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫০/১৫৭ কার্যবিবরণীতে স্থায়ী ফোরাম গঠনের বিষয়টি আদিবাসী দশকের একটি অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

জাতিসংঘের Commission on Human Rights সুপারিশমূলে স্থায়ী ফোরাম গঠনের ওপর ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে এবং চিলির সান্টিয়েগোয় দুটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সব ওয়ার্কশপে আদিবাসী বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময়ের জন্য জাতিসংঘের একটি স্থায়ী ফোরাম স্থাপন করার ওপর জোরালো সুপারিশ করা হয়। এর পর ১৯৯৮ সালের ৯ এপ্রিল Commission on Human Rights-Gi Resolution 1998/20 of 9 April 1998 মূলে স্থায়ী ফোরামের ওপর Open-ended Inter-Sessional Adhoc Working Group গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ওয়ার্কিং গ্রুপ পর পর কয়েকবার মিলিত হয়। পরবর্তীকালে ১৪-১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে Mr. Richard Van Rijssens-এর সভাপতিত্বে এবং ১৪-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে Mr. Peter Wille সভাপতিত্বে এই ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে ২৭ এপ্রিল ২০০০ সালে Commission on Human Rights জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সম্পূরক সংস্থা (subsidiary) বডি হিসেবে সরকারি প্রতিনিধি ৮ জন এবং আদিবাসী প্রতিনিধি ৮ জন মোট ১৬ জন সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ২০০০ সালের জুলাই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এবং একই বছরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মিলেনিয়াম অধিবেশনে গৃহীত হয়। ৮ জন আদিবাসী প্রতিনিধির মধ্যে সুমেরু/ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকান/ক্যারিবিয়ান, প্রশান্ত মহাসাগরীয়, ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন/পূর্ব ইউরোপ প্রভৃতি ৭টি অঞ্চল থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি মনোনীত হবেন। এছাড়া প্রতিটি মেয়াদে এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য/দক্ষিণ আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে পালাক্রমে অতিরিক্ত একজন প্রতিনিধি মনোনীত হবেন। আসন্ন মেয়াদে উক্ত অতিরিক্ত একজন প্রতিনিধি মধ্য দক্ষিণ আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে মনোনীত হবেন বলে ২৬ নভেম্বর ২০০০ অনুষ্ঠিত আদিবাসী সভাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক

মানবাধিকার-বিষয়ক বিশ্বসম্মেলনের সুপারিশমালা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (Resolution 48/63 of 21 December 1993) ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। আদিবাসী দশকের মূল্য লক্ষ্য হল আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা। আদিবাসী দশকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' কর্মকাণ্ডে অংশীদারত্ব'।

জাতিসংঘের আদিবাসী ফেলোশিপ প্রোগ্রাম

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কে এবং বিশেষত আদিবাসীবিষয়ক অধিকার সম্পর্কে আদিবাসী সংগঠন ও জনগোষ্ঠীসমূহের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন (Commission on Human Rights) ৬ মাসমেয়াদি (বর্তমানে ৫ মাস) আদিবাসী ফেলোশিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রত্যেক বছর সারা বিশ্ব থেকে সাধারণত যাদের বয়স অনূর্ধ্ব-৩৫ বছর এমন ৪ জন (বর্তমান ৫ জন) আদিবাসীকে এই ফেলোশিপের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ফেলোদের সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের High Commission for Human Rights-এর কার্যালয়ে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। এ সময় তারা বিভিন্ন আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং Office of the UN High Commissioner for Human Rights সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক দশকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত তহবিল

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশককালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প ও কার্যক্রমকে আর্থিক সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের ভলান্টারি তহবিল (The Voluntary Fund for the International Decade of the World's Indigenous People) নামে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। আদিবাসীবিষয়ক ভলান্টারি তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, আদিবাসীবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপার্সন র‍্যাপোটিয়ার এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার (UNDP) একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে এই তহবিলের জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়। এই উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে দাতা দেশসমূহের তিনজন প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন। আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের উল্লেখিত কার্যক্রম একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বহু শতাব্দীর বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের উপেক্ষিত অবস্থানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস হিসেবে জাতিসংঘের এসব বর্ষ, দশক বা দিবস ঘোষণার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বাংলাদেশে এসব দিবস, বর্ষ বা দশক সম্পূর্ণই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই উপেক্ষা বা উদাসীনতার মূল কারণ হল বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের ভাবাদর্শগত অবস্থান ও রাজনৈতিক চরিত্র। গোড়া থেকেই বাংলাদেশের সরকারসমূহ যুক্তি প্রদর্শন করে আসছে যে, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে যারা বাংলাদেশে বসবাস করছে তারা 'উপজাতি'। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের এরূপ অবস্থানের পেছনে মূল কারণ হল তাদের উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ,

উগ্র ইসলামিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ এবং সর্বোপরি আদিবাসী জনগণের ওপর প্রভুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবিচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এ সংগ্রামে আদিবাসী জনগণও পূর্ণমাত্রায় শামিল হন এবং মা-বোনের ইজ্জতসহ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে গৌরবময় আত্মত্যাগের ইতিহাস রচনা করে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, অবিচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি যে চেতনা নিয়ে গৌরবময় সংগ্রাম করেছিল, সেই চেতনাকে পদদলিত করে পাকিস্তানি কায়দায় আদিবাসী জনগণের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী গোড়াতেই আদিবাসীদের অধিকারকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করে বসল। সেই সময় সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে পরিষদের একমাত্র আদিবাসী সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে আদিবাসীদের জাতিগত স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় আদিবাসী জনগণের সেই ন্যায্য দাবি ধুলোয় উড়িয়ে দিলেন এবং সংবিধানে আদিবাসী বিষয়ে একটি শব্দ ঠাঁই পেল না। পক্ষান্তরে সদ্যপ্রণীত সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে,

৬. 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে,
বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কেবলমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতীয় অস্তিত্বকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা হয়নি, ভিন্ন জাতীয় নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ধারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বাঙালি হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য সাংবিধানিকভাবে বাধ্য করা হয়। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের স্লোগান নিয়ে আদিবাসী জনগণসহ বাঙালি জনগণ স্বাধীনতাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই দেখা যায় যে, প্রগতিশীল নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে জাতিরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা উগ্র জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। ফলে সাধারণ বাঙালি জনগণের ভাগ্যের যেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তেমনি পরিবর্তন ঘটেনি আদিবাসী জনগণের চরম বঞ্চনা ও অবিচারেরও। পক্ষান্তরে এর মাত্রা পেয়েছে আরো শতগুণ বৃদ্ধি। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতিরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসনামলের অসমাপ্ত নীতি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্মদের ক্ষেত্রে এই নীতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উলঙ্গভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর এই নীতি ছিল অমুসলিম-অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সূচিত হতে না হতেই ১৯৭১ সালে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে জুম্মদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। রামগড়, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়িসহ ফেনী উপত্যকায়

ব্যাপকহারে বহিরাগত বাঙালি বসতি দেয়া হয়। এর পরের ইতিহাস আরো ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর। হাজার হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি দিয়ে তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে জাতিরাষ্ট্রের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে। গণহত্যা চালানো হয় একের পর এক। আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল করা হয় একচেটিয়াভাবে। হাজার হাজার আদিবাসী জুম্ম উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয় নিজ বাস্তুভিটে থেকে। পাশাপাশি আদর্শগ্রাম, যুক্তগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম নামে বন্দিশালায় জুম্মদের জোরপূর্বক বসতি দেয়া হয়। বিগত আড়াই দশক ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ইতিহাসে সেই এক মধ্যযুগীয় কালো অধ্যায়।

পাশাপাশি চলতে থাকে আদিবাসী জুম্মদের প্রতিরোধ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠন ব্যাপকভাবে সমর্থন জানায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জুম্মদের পক্ষে সোচ্চার হয় গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রগুলো। ফলে একপর্যায়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আদিবাসী জুম্মদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

জুম্ম জনগণ আশা করেছিল যে, চুক্তির মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সরকার চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের পরিবর্তে আরো এক নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এ সরকারও বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারসমূহের অনুসৃত নীতি থেকে সরে আসেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত কয়েক বছরে আরো ব্যাপক মাত্রা লাভ করেছে। যে স্পিরিট নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই স্পিরিট ও চেতনাকে পদদলিত করে বহিরাগত সেটেলারদের টাস্কফোর্স ও আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে মৌলিক স্পিরিট ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্বশাসন কায়েম করা।

যা হোক, এবারে আলোচনা করা যেতে পারে বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অনুচ্ছেদসমূহ আদিবাসীদের বিষয়ে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সংবিধানের ৯, ২৮ ও ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্বশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হয়। সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ হল–

৯নং অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

২৮ (৪) নং অনুচ্ছেদ

নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৬৫ (১) নং অনুচ্ছেদ

'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফা কোনো কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

সংবিধানের উপরোক্ত ২৮(৪) নং অনুচ্ছেদের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি-অধ্যুষিত অনগ্রসর অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৯ ও ২৮ অনুচ্ছেদের আলোকে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশেষ শাসনকাঠামো স্থাপনকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের আইন প্রণয়ন করা হয়। অনুরূপভাবে ৬৫ নং অনুচ্ছেদ বলে এসব পরিষদসমূহের মূল আইনের অধীনে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন প্রভৃতি প্রণয়নের বিধান করা হয়।

এসব অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে স্বীকার করা হলেও সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদসমূহে আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠীর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। তাই সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিগত স্বীকৃতি ও বিশেষ শাসনব্যবস্থা সংবলিত অনুচ্ছেদ প্রণয়ন বা সংযোজন অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪-এর মূলে উক্ত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। উক্ত আদেশবলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা-সংবলিত ১২ নং অনুচ্ছেদও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয়। শাসকগোষ্ঠী এখানেই থেমে থাকেনি। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে অমুসলিম আদিবাসী

অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার তথা জাতিগত অস্তিত্বকে তৃতীয়বারের মতো সাংবিধানিকভাবে অবজ্ঞা ও প্রান্তিকীকরণ করা হয়। তাই বর্তমান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক দাবিসমূহ হচ্ছে–

১. বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।
২. আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানপূর্বক বিশেষ স্বশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা
করা।
৩. আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার, সামাজিক রীতিনীতি, আইন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।
৪. আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা।
৫. আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে আত্মবিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করা।
৬. আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
৭. জাতীয় সংসদে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশের আদিবাসীরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণসহ সব প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসীরা বাঙালি জাতির পাশাপাশি বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। আন্দোলনে আদিবাসীরা যে অবদান রেখে আসছে বাংলাদেশের ইতিহাসে তার কখনোই মূল্য দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে নানাভাবে আদিবাসীদের অধিকার ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়ে আসছে। দেশের একটা বিরাট অংশের অধিকারকে অস্বীকার করে বা তাদের দমন-পীড়নের মাধ্যমে একটা দেশের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃতি প্রদানের কোনো বিকল্প নেই।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. মলয় দেওয়ানজী ও সরল চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), দিগদর্শন, উইলিয়াম কেরি স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা।
২. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৩. মঙ্গল কুমার চাকমা, 'আদিবাসী জুম্মদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন', লামপ্রা, জুম ঈসথিটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি।
৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা।
৫. শ্রীউদয়ন, 'জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার', জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, বুলেটিন নং-৫।

৬. প্রশান্ত ত্রিপুরা, 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ', সংহতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০০ ।
৭.'National Adivasi Coordination Committee, Bangladesh Indigenous Peoples : Partnership in Action', সংহতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০০।
৮. Philip Gain (Ed.) The Chittagong Hill Tracts : Life and Nature at Risk, Society for Environment and Human Development, Dhaka.
৯. Rajkumari Chandra Kalindi Roy, `Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts' .
১০. Regulation 1, The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900.
১১. Raja Devasish Roy, Occupations and Economy in Trasition : A Case Study of the Chittagong Hill Tracts', Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, International Labour Organisation, 2000.
১২. International Service for Human Rights, Indigenous Peoples : Towards a Permanent UN Forum.
১৩. The Rights of Indigenous Peoples', Human Rights Fact Sheet, No. 9, United Nations.
১৪. Philip Gain (Ed.) Bangladesh Land, Forest and Forest People, Society for Environment and Human Development, Dhaka.
১৫. Indigenous Peoples', Advisory Report No. 16, Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy.

[লেখকঃ সম্পাদক, তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি ।]

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা

আ ক ম ল হো সে ন

বর্তমান সময়ে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাটি সেকেলে হয়ে গেছে বলা কোনো অতিকথন নয়। এমন রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যেখানে শুধু একটি জাতি বাস করে। কোনো একটি জাতির আধিপত্য থাকলেও তা একইসাথে অন্য জাতিসমূহেরও বাসভূমি। যদিও সাবেকি ধারণায় তা একটি জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এক জাতি–এক রাষ্ট্র, খুব একটা পাওয়া যাবে না। মানুষের অভিবাসন প্রক্রিয়ার কারণে আবার একাধিক জাতি-রাষ্ট্রের রূপান্তর হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমস্ত দুনিয়া জুড়ে মানুষের অভিবাসন হচ্ছে। ইউরোপ উত্তর আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপানসহ পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্ব বলে পরিচিত দেশগুলোর মানুষের গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকা মহাদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোও অন্য দেশের মানুষকে আকর্ষণ করছে। যেখানে ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ আছে সেখানেই মানুষ যাচ্ছে। অভিবাসী মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ সুযোগ পেলে ভিন দেশকে তাদের স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে ফেলছে। মাতৃভূমির সঙ্গে তাদের বন্ধন থাকলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে নতুন মাতৃভূমি তৈরি হচ্ছে। প্রধানত ইউরোপীয় মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে একসময় বসতি করে আমেরিকান বলে এক জাতির জন্ম দিয়েছিল। বলা হত আমেরিকা হচ্ছে melting pot– যেখানে যারাই বসতি গড়বে তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে এক অভিন্ন জাতিতে পরিণত হবে, যারা হবে আমেরিকান। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে সবাই যে যার জাতীয় স্বকীয়তা বজায় রেখে mosaic-এর রূপ লাভ করবে। এ থেকে মনে হয় নাগরিকত্বের নিরিখে তারা আমেরিকান হলেও জাতীয়তার বিচারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ধারণ করবে। এভাবে নাগরিকত্ব জাতীয়তার ওপরে স্থান নিচ্ছে। উপনিবেশ যুগে সাদা চামড়ার মানুষ উপনিবেশ দখল করে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করত, তবে উপনিবেশকে তাদের স্থায়ী ঠিকানা বানাত না। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দুয়েকটি settler colony ছাড়া সব উপনিবেশ 'যত দিন শোষণ করা যায় তত দিন শাসন কর' নীতি দ্বারা পরিচালিত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তৃতীয় বিশ্ব থেকে যাওয়া অভিবাসী মানুষজনের

এক উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নতুন দেশকে স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে থাকতে চাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যায় যে এক জাতির রাষ্ট্র বহু জাতির রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

যে কোনো জাতিগোষ্ঠী সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষা ও নানা বৈষয়িক কারণে সচেতন হয় তার পরিচয়ের বেলায়। ইউরোপীয় উপনিবেশিকরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে দখল কায়েম করেছিল তাদের উন্নত যুদ্ধকৌশল ও খলনীতির কারণে। কিন্তু উপনিবেশের মানুষ তাদের পরিচয়ের ব্যাপারে সচেতন হয়ে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হতে রাজনৈতিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। তাদের সচেতনতা তৈরি হয়েছিল উপনিবেশিক জাতির প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপনিবেশিক মানুষ নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। এভাবেই একটি জাতির আধিপত্যে বাসকারী অন্য জাতির মানুষ যুগের পরিবর্তনে নিজ পরিচয়কে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে তার স্থান ঠিক করতে চায়। একাধিক জাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রে সব জাতির অধিকারের নিশ্চয়তা গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার এক অন্যতম পূর্বশর্ত।

এটা ঠিক যে সব জাতির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র নেই, ঐতিহাসিক কারণে বড় জাতি-অধ্যুষিত ভুখণ্ডের অধিবাসী এক বা একাধিক ক্ষুদ্র জাতি হতে পারে। কেউ অধিপতির অবস্থা না মেনে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেও অনেকেই তা পারেনি। কুর্দরা এক বৃহৎ ও প্রাচীন জাতি হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, তুরস্ক, ইরান রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে তাদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের লড়াই ব্যর্থ হওয়ার কারণে। একই জাতি পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এক রাষ্ট্রে তার জাতীয় পরিচয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেও প্রতিবেশী বহুজাতিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করছে রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস ভিন্ন হওয়ার কারণে। যেমন বাঙালি ও আইরিশরা। কিন্তু একটি বৃহৎ জাতি পাশাপাশি রাষ্ট্রে বাস করে এক রাষ্ট্রে বড় জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় অথচ পাশের রাষ্ট্রে তার পরিচয় হয় এক ক্ষুদ্র জাতির। যেমন সাঁওতাল ও মনিপুরি জাতি ভারতে নিজস্ব রাজ্য গঠন করতে পারলেও বাংলাদেশে তারা ক্ষুদ্র জাতির অভিধা পেয়েছে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো পথপ্রদর্শক ছিল। বর্তমান চীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথে চলা শুরু করার পর থেকে তার জাতিগত সংখ্যালঘু সমস্যা তৈরি হয়েছে।

দুই

ইংরেজিতে ব্যবহৃত এথনিক শব্দটিকে বাংলায় আদিবাসী করা হয়েছে। সে অর্থে বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া অন্য সব জাতিকে আদিবাসী হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আদিবাসী শব্দটি বিভ্রান্তি তৈরি করে বসতি স্থাপনের কালের নিরিখে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সব আদিবাসীরা বাঙালি জাতির আগে এ ভূখণ্ডে বসতি শুরু করেছে মনে হতে পারে। তাতে কে কখন এ ভূখণ্ডে বসতি শুরু করেছে তা স্থির করায়

জটিলতা তৈরি হয়। এসব জাতিকে নৃগোষ্ঠী বলেও পরিচিত করার এক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। চীনে হান জাতির মানুষের বাইরের মানুষকে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের পরিচয়কেও আমরা অন্য জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণের বেলায় বিবেচনা করতে পারি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব জাতির মানুষ বাস করে তাদের জুম্ম জাতি বলে পরিচিত করার একটি প্রয়াস লক্ষণীয়। জুম চাষের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকলেও এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভাষার কথা বিবেচনায় এরকম পরিচয় একপেশে হতে পারে। তবে বলা দরকার যে সংজ্ঞা নির্ধারণের ব্যাপারে মতভিন্নতা তাদের অধিকার রক্ষার পথে কোনো বাধা হতে পারে না। এসব জাতির পরিচয়, ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবিকা রক্ষা করে বাঙালিদের মতো সমান সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জাতীয়তা নির্ধারণের বেলায় বাংলাদেশ শুরুতে বিষয়টিকে এক সঙ্কীর্ণ মাপকাঠিতে বিচার করেছিল। দেশের নাগরিকদের সবাই বাঙালি বলে পরিচিত হবে বলে সংবিধানে বিধান রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর দেশকে এক homogeneous ইউনিট ভেবে এমন মাপকাঠি ঠিক করা হয়েছিল। পাকিস্তান যুগে যেহেতু বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে তার নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক পরিচয় ধারণ গুরুত্ব পেয়েছিল এবং যা ছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তা আরোপের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা, বাংলাদেশ যুগে জাতীয়তার পরিচয়কে তাই ভাষার ওপর দাঁড় করানোর উদ্যোগ ছিল। কিন্তু এর ফলে অন্য জাতিসত্তা যারা বাংলাদেশের নাগরিক তাদের ভাষা-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করায় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। প্রতিবাদে পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিগণ তাদের যেসব দাবি তুলে ধরেন সেগুলো তাদের ভিন্নতাকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি দানের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ তাদের ভিন্নতাকে রূঢ়ভাবে অস্বীকার করায় তারা অস্ত্র হাতে প্রতিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে বাঙালিরা পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ২৪ বছর সংগ্রাম করে নিজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর আবার অন্য জাতির অধিকারকে অস্বীকার করেছে। বাঙালিরা বৃহৎ জাতিসুলভ অহমিকা দিয়ে পরিচালিত হয়ে যে ভুল করেছিল তার জন্য পাহাড়ে তৈরি হওয়া অসন্তোষ এখনও দৃশ্যমান এবং এ অসন্তোষ দমনের নামে যে সামরিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের সীমিত সম্পদের ওপর চাপ পড়ছে এখনও।

তবে পরবর্তী শাসকরা বাংলাদেশী শব্দটি প্রচলন করে নাগরিকতা ঠিক করার সময়। এক্ষেত্রে তারাও এক ধরনের ক্ষুদ্র বিবেচনা দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। মনে হতে পারে তাদের নাগরিকতা নির্ধারণের মাপকাঠিতে বাংলাদেশে বসবাসকারী সব জাতির পরিচয়কে সম্মান করা হয়েছিল। আদতে তারা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন ছিল বলে বাঙালির ভাষাভিত্তিক পরিচয়কে অস্বীকার করে এবং পশ্চিম বাঙলার বাঙালি থেকে আলাদা করে এক স্থানিক (territorial) পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পাশাপাশি তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্বে অন্য জাতিসত্তার মানুষের অধিকারের প্রশ্নে কোনো সুরাহা হয়নি। পাহাড়ের অসন্তোষকে অধিকতর সশস্ত্র পন্থায় মোকাবিলা করার পাশাপাশি তারা সমতল থেকে দরিদ্র মানুষকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে সে অঞ্চলের মানুষদের আরও সংখ্যালঘু করার উদ্দেশ্যে বসতি দিয়েছে। পাহাড়ের জাতিসত্তার প্রতি শুধু নয় সমতলের অন্য জাতিসত্তার অধিকারের বিষয়েও শুরু থেকে এদের কর্মকাণ্ডে অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গেছে। ভৌগোলিক কারণে পাহাড়ের জাতিসত্তাগুলো এক স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকার পাশাপাশি তারা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় তাদের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নজর অধিক মাত্রায় পড়েছে। কিন্তু সমতলে এ দুই কারণের অনুপস্থিতি ঘটায় জাতিসত্তার অধিকারের বিষয়টি আড়ালে ফেলে পড়ে গেছে।

তিন

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও সমতলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বাস করছে যুগ যুগ ধরে। তাদের সবাইকে ক্ষুদ্র বলাও যাবে না। তাদের ব্যাপারে মূলধারার মানুষের সচেতনতা কম। ভারত বিভক্তির আগে আন্তঃদেশীয় সীমান্ত না থাকায় কোনো কোনো জাতির মানুষ বর্তমান সীমান্তের উভয় দিকেই বাস করত। কিন্তু দেশভাগের পর যারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাস করছিল তাদের কেউ কেউ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। যেমন, বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো বা মান্দি ও খাসি জাতির মানুষ। এরা বাংলাদেশে প্রান্তিক মানুষের মর্যাদায় থাকলেও ভারতের মেঘালয়ে অধিপতি জাতি। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মনিপুরি জাতির মানুষ ভারতে মনিপুর রাজ্যের অধিপতি। তবে এমন জাতির মানুষেরও দেখা পাওয়া যাবে যাদের ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসকগণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান বাংলাদেশে নিয়ে আসে এবং এরাই বর্তমানে ক্ষুদ্র আকারে বাংলাদেশে বাস করছে। যেমন চা-বাগানের শ্রমিক বা ঢাকা শহরে সুইপার হিসাবে পরিচিত মানুষ ভারত রাষ্ট্রে বসবাসকারী বৃহৎ জাতির অংশ। তারাই বাংলাদেশে তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, ভোজপুরির ক্ষুদ্র সংস্করণ। চা-বাগানের মানুষ তিন প্রজন্ম ধরে চা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। চা-বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোনো পেশায় তারা আসতে পারে না ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণেও। সমতলে সাঁওতাল জাতির মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যদিও তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে বলে বোঝা যায় না। এমনকি আদিবাসী শব্দটি তাদের বেলায় তাদের উৎপত্তির সূত্রে যত প্রযোজ্য হবে অন্যদের বেলায় বোধ হয় তত হবে না।

বাঙালি ছাড়া অন্য জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণে বিষয়টি সমতলে জটিল হতে পারে। এমন জাতিসত্তা পাওয়া যেতে পারে যারা হয়তো ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে তাদের ভাষা হারিয়ে প্রতিবেশী বাঙালি সমাজে মিশে গেছে। বিশেষ করে এসব মানুষের অধিকাংশই ধর্মীয় বিচারে হিন্দু ধর্ম বা প্রকৃতিপূজারি হওয়ায় কারণে তাদের পক্ষে নিজ ভাষা হারিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে মিশে যাওয়া সম্ভব। জনসংখ্যা যেমন ক্ষুদ্রত্ব

বিচারের মাপকাঠি তেমনি ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার সুযোগের অভাব একটি গোষ্ঠীর মানুষের প্রান্তিকতা নির্ধারণ করতে পারে। ঘরে তার নিজ ভাষা চর্চার সুযোগ থাকলেও বৃহত্তর সমাজে তা না থাকার কারণে পরবর্তী প্রজন্মে তার পক্ষে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সমতলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে তাদের এ-জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় বেশি।

চার

শ্রেণীগত বিচারে সমাজে প্রান্তিক মানুষ রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার হয়, পাশাপাশি জাতিগত বিচারে তার প্রান্তিক অবস্থা আরো বেড়ে যায়। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। তারা তাদের জীবিকা হিসাবে আবহমান কালের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এবং তা হয় প্রধানত কৃষিভিত্তিক। তবে তাদের মধ্যে বনের ওপর নির্ভরশীল থেকে জীবিকা নির্বাহ করার দিকটিও লক্ষণীয়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন জুমচাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমতলের জাতিসত্তার জীবিকা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। পাহাড় ও সমতলে, এসব মানুষের ভাষা-সংস্কৃতির পর প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভূমির মালিকানা। পাহাড়ের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আবহমান কাল থেকে সামাজিক মালিকানা প্রচলিত ছিল। জুমচাষের জন্য যে পাহাড়ের ঢাল পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ ব্যবহার করে তা সামাজিক মালিকানাভুক্ত। এর সঙ্গে বনের গাছপালাও তাদের আয়ের পথ। অন্যদিকে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ প্রধানত যে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল তাদের জমিও মালিকানায় নেই। তারা হয় বর্গাচাষি হিসেবে অথবা খুব অল্প পরিমাণ জমির মালিক হিসেবে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু উভয় অঞ্চলে তারা জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা তাদের ভেতর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তৈরি করছে। পার্বত্য অঞ্চলে সরকারিভাবে বাঙালি পুনর্বাসন ও নানা নামে দায়দায়িত্বহীনভাবে জমি বরাদ্দ দেওয়ার ফলে ভূমি সমস্যা তৈরি হয়েছে । পাহাড়ে দীর্ঘকালের অস্থিতিশীল অবস্থার সঙ্গেও ভূমি-সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে। বাঙালি সেটেলাররা তাদের ভূমি থেকে জোর করে উচ্ছেদ করেছে বলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের অভিযোগ রয়েছে। পাহাড়ি মানুষের ওপর বাঙালিদের হামলার পিছনে প্রশাসনের প্রশ্রয়ের কথা জানা যায়।

পাঁচ

পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর রাষ্ট্রের বিভিন্নমাত্রিক নির্যাতন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই ঘটছে। ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে কর্ণফুলী নদীকে নতুন খাতে প্রবাহিত করাতে সে স্থানে বসবাসরত হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করায় তাদের বড় একটা অংশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এরকম একটি প্রকল্প সংখালঘু জাতিসত্তার আবহমান কালের বসত ও জীবন-জীবিকার প্রতি অবজ্ঞা ও অসচেতনতার লক্ষণ ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন

করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি অসন্তোষের পটভূমিতে এখানকার পৃথক ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের যুক্তিতে বাংলাদেশ হওয়ার পর এখানে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার ব্যবস্থাসহ স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের থেকে তাদের নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতার কারণে এ দাবির ন্যায্যতা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন কোনো সরকারই তা পূরণ করেনি। বরং জাতীয়তার পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী সব মানুষকে বাঙালি বলে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল। এর সাথে পাহাড়ে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। '৭৫ সালে শাসনক্ষমতায় পালাবদল হওয়ার পর একই নীতির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা গেছে। সামরিক শাসকরা একদিকে পাহাড়ে তৈরি প্রতিরোধ মোকাবিলা করার জন্য আরও বেশি করে সামরিক ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে, অন্যদিকে পাহাড়ি জনগণকে তাদের পৈতৃক মাটিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষে পরিণত করার জন্য সমতল থেকে মানুষজনকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়তে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি জনগণের ঐতিহ্যগত ভূমি মালিকানা থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য বাঙালিদের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া, পাহাড়িদের ভোগদখলকৃত জমি থেকে তাদের উৎখাত, সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তাদের ওপর হামলা করা এক নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সশস্ত্র আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়েও গড়ে ওঠে সশস্ত্র পাহাড়ি দল, যার নাম শান্তিবাহিনী এবং যাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা ছিল। ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পাহাড়ি মানুষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে চুক্তি করে অশান্ত পাহাড় শান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক পরিষদসহ ভূমি-সমস্যার সমাধানের অঙ্গীকার ছিল। পাহাড়িদের এক অংশ এ চুক্তি মেনে না নিলেও অন্য অংশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ ব্যতীত অন্য কোনো দিকে এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যা স্থানীয় মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে। শান্তিচুক্তি করলেও আওয়ামী লীগ সরকারকে বিএনপি ও জামায়াত সরকারের মতো সাম্প্রদায়িক বলে পাহাড়ের মানুষ মনে করে।

ছয়

বাংলাদেশ বাঙালি আধিপত্যের দেশ হলেও অন্যান্য জাতিসত্তার অবস্থান আছে বিধায় এটি বহু জাতির দেশ। এসব জাতির মধ্যে সংখ্যার বিচারে ভিন্নতা থাকতে পারে। বাঙালি দরিদ্র মানুষের মতো ক্ষুদ্র জাতির মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম উপায় অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করা। তবে একই সঙ্গে এসব মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি বজায় রেখে নিজ পরিচয়কে ধরে রাখাও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব জাতিসত্তার দাবি প্রতিষ্ঠা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে না। এ জন্য তাদের সংঘবদ্ধ

রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এবং এ কাজে বাঙালিদের মধ্যে যারা মানুষের সাম্যে বিশ্বাস করে তাদের সমর্থন প্রয়োজন হবে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ পৃথক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রত্যাশী– যার জন্য এক সময় তারা সশস্ত্র লড়াই করেছে। এখন এ দাবির ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হলেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রয়োজন তারা বোধ করে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সংবিধানে বিভিন্ন সংশোধনী আনার সুযোগ হয়েছে। এবং এ সুযোগে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের জন্য এ অঞ্চলের পৃথক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে বিশেষ মর্যাদা রেখে সংবিধান সংশোধন করলে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হতে পারে। বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যারা এ বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করে তাদের বোঝা উচিত যে পার্বত্য অঞ্চল মোগল যুগ ও ব্রিটিশ যুগে বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা পেত। সমতলের জাতিসত্তাগুলোর জন্য পাহাড়ের মতো বিশেষ মর্যাদার প্রদান সম্ভব হবে না সংখ্যা ও তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে। তবে তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যেসব জাতিসত্তার মানুষের সংখ্যা বেশি তাদের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত নিজ ভাষায় শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার বিভিন্নতা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শক্তিশালী হতে পারে।

১৯ আগস্ট ২০১০

[লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

‘আদিবাসী’ বিতর্ক এবং তাদের মানবিক অধিকার

মো. আব্দুল আউয়াল

আমাদের সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের মিমাংশা করতে হবে, সেটা হলো, আদিবাসী কে বা কারা? কত কাল আগে থেকে এখানকার সমতলের বাঙিল মানুষেরাই এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল, সেই প্রশ্নেরও মিমাংশা হওয়া দরকার। আমার ধারণা সমতলের খাঁটি বাঙালিদের এখানে বসবাস বহু কাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সুতরাং আদিবাসী বলেল বাঙালিদের নামও সেই তালিকায় চলে আসে; তবে আমরা এখানে সেই বিতর্কে না-গিয়ে এদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার বঞ্চিত পাহাড়ি মানুষদের অধিকার নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

এটা ঠিক যে, এরা প্রধানত পাহাড়ে বসবাস করে; সে কারণে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আধুনিক জীবনের অনেক বিষয়-আশয় থেকেই এরা বঞ্চিত। দেশের অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য যে সুযোগ-সুবিধাগুলো রয়েছে প্রথমত সেই সুযোগ-সুবিধাগুলো পাহাড়ের মানুষদের বেলায়ও নিশ্চিত করা দরকার। দ্বিতীয়ত এদের চেহারা, গায়ের রঙ, সংস্কৃতি যেহেতু একেবারেই আলাদা, সে কারণে তাদের পক্ষে দেশের অন্য সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে কাজ করা এবং বসবাস করা হয়ত সম্ভব নয়; তাই পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা দরকার যাতে করে তারা তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সকল কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ সর্বপরি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

পাহাড়ের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই কেবল জমি-জমার ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। যেহেতু চাকরি-ব্যবসা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে তাদের জীবীকা এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত নয়, তাই তাদের কৃষিজমি তাদের অধিকারে কীভাবে কতটা থাকা বাঞ্ছনীয় সেটা রাষ্ট্র পাহাড়ীদের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আইন প্রনয়ণ করে তার বাস্তাবায়ন ঘটাবে এটা সকলেরই প্রত্যাশা।

সবসময়ই তুলনামূলক অধিক শক্তিমান মানুষেরা জয়ী হয়। পক্ষান্তরে দুর্বলেরা পরাজিত হয়। সবল ও দুর্বলের লড়াইয়ে দুর্বলেরা শোষিত ও নির্যাতিত হয় সবলের দ্বারা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাঙালিরাই সবল; সরকার ও আর্মী এবং প্রশাসনকে কীভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পাহাড়িদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা যায় সেই দিকে সরকারকে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে।

বাঙালিরা তো ভাষার জন্য লড়াই করে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, সেই বাঙালি তো অন্যের ভাষার প্রতি অমর্যাদাশীল হতে পারে না। অন্তত সেদিক থেকে বিবেচনা করে সরকার পাহাড়ী তথা সকল আদিবাসীদের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে– এটা আমাদের কাম্য।

আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি যত্নশীল না-হলে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে সেখানে ভয়ংকর সব মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। এতে করে পাহাড়ের শান্তি তো বিনষ্ট হবেই এবং সমতলের শান্তিও তাদের কারণে হুমকীর সম্মুখীন হতে পারে। সে কারণে প্রতিটি পাহাড়ী শিশুদের শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

নারীর নিরাপত্তা সেখানে আরেকটি জরুরী প্রয়োজনীয় বিষয়। সরকারের তাই নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পৃথিবীর প্রায় দেশেই কম-বেশি "আদিবাসী" আছে কিন্তু সব দেশেই তাদের বঞ্চনার ধরন ও পরিমান একরকম নয়। এক্ষেত্রে উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পার্থক্য থাকবেই। বাংলাদেশের সমতলবাসী বাঙালিদের অসংখ্য সমস্যারও আজ অবধি সমাধান হয়নি; সেখানে দারিদ্রের কারণে কত মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থাকে। কত বাঙালির চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা নেই। উত্তরবঙ্গে প্রতি বছর মঙ্গা হয়; সেই সব মঙ্গাপীড়িত এলাকার মানুষজনও বাঙালি। সুতরাং বাঙালির সমস্যা সমাধান যে-সব কারণে হয়নি বা হচ্ছে না; আদিবাসিদের অনেক সমস্যাও সেই একই কারণে সমাধান হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করেন, সকল বাঙালি শোষক সেজে আদিবাসিদের ওপর শোষন-নির্যাতন চালাচ্ছে, সেটা সঠিক নয়। তবে হ্যা, কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের বঞ্চনার কারণ খুঁজতে গেলে কেউ যদি আদিবাসি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে বঞ্চনার আরও একটি অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাঙালি দরিদ্র-দুর্বল আর আদিবাসি দরিদ্র-দুর্বলের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে কিন্তু কেউ বাঙালি হোক অথবা আদিবাসি হোক সকল মানুষের সব ধরনের নিরাপত্তা ও বাঁচার নিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়। কেননা সরকার নির্বাচিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে আর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের ।

পাহাড়ি এলাকায় মূল্যবান খনিজ সম্পদ থাকতে পারে, পাহাড়ের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আনারস, কমলালেবু ইত্যাদিসহ অনেক ফসলাদি ভালো হয়। এখন প্রশ্ন হলো পাহাড়ের এই বিশাল এলাকার মালিক তো সরকার। সরকার নানা কৌশলে পাহাড়ের সেই জমি আদিবাসিদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে– এই নেয়ার মধ্যে অসহিষ্ণুতা আছে। কারণ আদিবাসীরা কতগুলো বিশ্বাসকে ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে মানে; যেমন গাছকে তারা দেবতা মনে করে, মাটিকে মনে করে মা। কাজেই এধরনের গাছ, মাটি, পানির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, দলিল, দখল এসব তারা বিশ্বাসগতভাবে মেনে নিতে পারে না। এক অর্থে সমগ্র দেশের মালিক হলো সরকার অর্থাৎ দেশের জনগণ। কিন্তু

পাহাড়ি আদিবাসিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই তাদের জমি-জমা, গাছ-পালা, পাখি ইত্যাদি অধিগ্রহণ করা উচিৎ। পক্ষান্তরে আদিবাসিদের সকল দিক থেকে নিরাপত্তা দিতে সরকার বাধ্য কিন্তু বাস্তবে সে-সবের তোয়াক্কা না করে সরকারের মধ্যকার কিছু সুবিধাবাদী লোক বিভিন্ন বাঙালির কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে খেয়ালখুশিমত যাকে ইচ্ছা তাকে সেই সব জমির মালিকানা দিয়ে দিচ্ছে, অথচ হাজার হাজার আদিবাসি তাতে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে, যা যে কোন বিবেচনাতেই মানবতা বিরোধী।

এই দেশের আলো-বাতাস-পানি-মাটিতে বেড়ে ওঠা একটি শিশু, শুধু আদিবাসি আখ্যা পাওয়ার কারণে সে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে– তা কিন্তু নয়; কারণ বহু সমতলবাসী বাঙালি শিশুও নানাভাবে বঞ্চিত। সতলের দরিদ্র শিশুটির মতোই পাহাড়ের শিশুটিও খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা ইত্যাদির অভাবে অমানবিকভাবে বেড়ে উঠছে। সুতরাং এখানে আদিবাসী বা পাহাড়ী– বিষয়গুলো তুলনায় দরিদ্র ও দুর্বল বলেই বরং তারা এই বঞ্চনার শীকার হচ্ছে।

কিন্তু একটি শিশু তো কোনো পরিচয় নিজে ধারণ করে না; জন্মের এই পরিস্থিতির ওপর তার হাতও নেই। সুতরাং সেই শিশুর দায়িত্ব কি শুধুই তার মা-বাবার! শিশুটির জন্য আমরা কি কিছুই করতে পারি না? এমনকি রাষ্ট্রও কি এদের জন্য কিছুই করতে পারে না?

বলা হয়ে থাকে, আদিবাসিদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, কোনো কোনো পাহাড়ীরা তো এখনও উলঙ্গ থাকে, তাহলে কি তাদের উলঙ্গ থাকাটাই ভাল? তাদের এধরনের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা কি সঠিক কাজ হবে! না, নিশ্চয়ই না। বরং তাদের মানসিকভাবে বুঝিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের পোশাক পরিধানের অভ্যস্ততার মধ্যে আনতে হবে। তবে হ্যাঁ, একই সঙ্গে তাদের ওপর কোনো অত্যাচার, নিপীড়ন চলে কি-না সেটাও দেখা দরকার। এবং তাদের গান, বিয়ে প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাতে স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে, সেদিকেও কঠোর নজর রাখা দরকার। আর এই সব কিছুর আগে রাষ্ট্রকে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো পুরনের দায়িত্ব নিতে হবে; এই দায়িত্ব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তো নেবেই কিন্তু সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হবে।

[লেখকঃ পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র)। প্রবন্ধ/ নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রস লি.। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব।]

পার্বত্য সংকট সমাধানে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন

মো. জ য় না ল আ বে দী ন

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার নেতৃতাধীন ঐক্যমতের সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সংগে স্বাক্ষর করেছিলেন 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি'। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সভাপতি ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা। এ চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পার্বত্য এলাকার অশান্ত পরিবেশের সমাপ্তি ঘটবে, প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি এটাই আমাদের কাম্য ছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার বিরাজমান সমস্যার উল্লেখযোগ্য স্থায়ী সমাধান হয়নি। সম্প্রতি দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক এক প্রতিবেদনে দেয়া তথ্যে দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতি সংকটমুক্ত হয়নি। সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্ত পূরণ না হওয়ায় সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে সশস্ত্র সংঘাত ও চাঁদাবাজিসহ নানাবিধ অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের সূত্রপাত

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক প্রধান আইয়ুব খান রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রধান হন। তার আমলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের জন্য কর্ণফুলি নদীতে কাপ্তাই বাঁধ দেওয়া হলে হাজার হাজার উপজাতি পরিবারের বসতভিটা, কৃষিজমি কাপ্তাই লেকের পানিতে তলিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। রাঙ্গামাটির সর্বউত্তরের থানা বাঘাইছড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত কিছু পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। বাকিরা এদিক-সেদিক বসতি শুরু করে– বড় একটি অংশ চলে যায় ভারতের ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে। একটি জনগোষ্ঠীকে তার হাজার বছরের বসতভিটা থেকে এভাবে উচ্ছেদ করার নজির বিশ্বে বিরল। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে এভাবে উপজাতি চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসীদের বাপ-দাদার ভিটা থেকে উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের।

দুই
বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আশা করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার অবসান হবে। কিন্তু তা হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্বাসনে মনোযোগ দেয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের তেমন একটা সুযোগ পাননি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে সেনা শাসকদের পার্বত্য এলাকায় বাঙালি পুনর্বাসন ও আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের কারণে আদিবাসীদের মনে সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৪ সালে আমি কাপ্তাই এলাকা ভ্রমণে গিয়ে শান্তিবাহিনীর কথা শুনিনি– তবে সেখানে সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির তৎপরতার কথা শুনেছি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হয় সেনাশাসকদের রাজত্ব। বাংলাদেশের প্রথম সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে না গিয়ে সামরিক শক্তির মাধ্যমে তা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে সশস্ত্র বিদ্রোহ– সৃষ্টি হয় শান্তিবাহিনীর । প্রায় লক্ষাধিক আদিবাসী দেশত্যাগ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। সেনাশাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনী নিয়োগের সাথে আরো একটি কাজ করে তা হল দেশের সমতলভূমি থেকে বাঙালিদের পার্বত্য এলাকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসনের। এ সব পুনর্বাসিত বাঙালিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিল অত্যন্ত নিরীহ ও গরিব শ্রেণীর। তারা এসেছিল বসতবাড়ি ও চাষ করার জমি পাওয়ায় আশায়। কিন্তু সেটলরদের বড় অংশটি ছিল হার্মাদ জাতীয়। তারা বসতবাড়ি ও চাষাবাদের ভূমিতে সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা আদিবাসীদের ওপর নানামুখী জুলুম-অত্যাচার চালায়। ফলে আদিবাসী যুবকেরা দলে দলে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাত থেকে প্রাণ রক্ষায় আমরা যেমনভাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। জিয়া, সাত্তার, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাত নিরসনের কোনো বাস্তবমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করে এ সংঘাত নিরসনের উদ্যেগ নিয়ে শান্তিবাহিনীকে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে ফিরিয়ে আলোচনার টেবিলে বসার পরিবেশ তৈরির জন্য স্বাক্ষর করেন ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি। এ শান্তিচুক্তি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়। যদিও তৎকালীন ও বর্তমানের বিরোধী দল ও তাদের দোসররা বলতে থাকে এ চুক্তির ফলে ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বাংলাদেশের এক ইঞ্চি মাটিও ভারত হয়নি।

শান্তিচুক্তির পরে

শান্তিচুক্তির পরে শেখ হাসিনার ঐক্যমতের সরকার প্রায় তিন বছর ক্ষমতায় ছিল। এ তিন বছরে শান্তিবাহিনীর বৃহত্তর অংশের অস্ত্র সমর্পণ, শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে এসে পুনর্বাসন, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পেশায় নিয়োগদান ও অন্যান্য কিছু প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। ২০০০ সালের নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসত তা'হলে পার্বত্য আদিবাসীদের ভূমির অধিকার বিষয়ক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত বলে আমার ধারণা। কিন্তু ২০০০ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক তেমন কিছু করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংঘাতহীন হয়ে উঠেনি।

এখন যা করণীয়

গত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট অঙ্গিকার ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংঘাতহীন করার জন্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের। এখনও হাজার হাজার পরিবার যথাযথভাবে পুনর্বাসিত হয়নি। প্রায় ৯৩ হাজার আদিবাসী পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায়। এই পুনর্বাসন বিঘ্নিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধান (ঘ' খণ্ডের ২ ধারা) এবং ভূমি কমিশন আইনের (৬/৩ ও ৯ ধারা) মধ্যে অসামঞ্জস্যতার দরুন।

তিন

২০০১ সালে সরকার ভূমি কমিশন আইন পাস করে। এর পরপরই জনসংহতি সমিতি শান্তিচুক্তি ও এই আইনের অসামঞ্জস্য দূর করতে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বিগত বিএনপি সরকার কোনো কাজই করেনি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য এই অসামঞ্জস্যতা নিরসন দরকার। এ ব্যাপারে গত ২০.০৯.২০১০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো 'পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ে যে সম্পাদকীয় মতামত ছেপেছে– তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী তাৎপর্য বহন করে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে– আদিবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক হলেও তাদের রয়েছে আলাদা জাতিসত্তা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। তাদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যতীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে সরকার ও অন্যান্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা খুবই দরকার। শান্তিচুক্তির আগে ও পরে আমি পেশাগত দায়িত্ব পালনে একাধিকবার সংঘাতময় পার্বত্য এলাকা ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি। নানিয়ার চর হত্যাকাণ্ডের দিন (১৭.১১.১৯৯৩) আমি রাঙ্গামাটিতে ভ্রমণরত ছিলাম। হত্যাকাণ্ডের খবর জানার পরে উপজাতি চাকমা ও মারমাদের মধ্যে যে মানসিকতা দেখেছি– তাতে পাহাড়ি ও বাঙালি দু'টি জাতিসত্তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি। সেটলর দুর্ধর্ষ বাঙালিদের হাতে নিরীহ কত উপজাতি নিহত, আহত, নিগৃহীত হয়েছে তার যেমন হিসাব নেই আবার

উপজাতি সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর হাতে সেটলর নিরীহ বহু বাঙালি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কল্পনা চাকমার কোনো সন্ধান আজও মিলেনি। কল্পনা চাকমার গ্রামে আমি গিয়েছি– জানতে চেয়েছি ঘটনা কী হয়েছিল– কারা কল্পনা চাকমাকে ধরে নিয়ে ছিল? কিন্তু নির্ভয়ে কেউ আমাকে প্রকৃত তথ্য দেয়নি। তাই পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি আনার জন্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন জরুরি।

গত ৩০.০৯.২০১০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এ আলোচনায় অংশ নেন সুলতানা কামাল, গৌতম দেওয়ান, শক্তিপদ ত্রিপুরা, আমেনা মোহসিন, মনি স্বপন দেওয়ান, স্বপন আদনান, সুধা সিন্ধু খীসা, বিনায়ক সেন, মো. জাহাঙ্গীর কামাল, সঞ্জীব দ্রং, ইলিরা দেওয়ান ও আবদুল কাইউম। বক্তারা সকলে পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্রুত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলেছেন।

তাই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কোনো প্রকার গোঁজামিল দেওয়ার অর্থ আবার সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া। শান্তিপ্রিয় প্রতিটি দেশবাসী চায় আর সংঘাত নয়। কল্পনা চাকমার মতো আর কাউকে আমরা হারাতে চাই না। স্থায়ী শান্তি চাই পাহাড়ে ও সমতল ভূমিতে।

[লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, ডিএমডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক]

বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর ত্রিমুখী প্রান্তিকতা

জো বা ই দা না স রী ন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে 'উপজাতি', 'পাহাড়ি' বা 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচিতি ঘটানোর প্রক্রিয়া সুপ্রাচীন।[১] শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর পুরোটা জুড়েই এরা 'আদিম' 'aborigine' 'কমসভ্য' হিসেবে চিহ্নিত। রেনেসাঁ-উত্তর আলোকময়তা বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তাকে এভাবে নির্মাণ করতে পেরে তার আধুনিকতাকে করেছে আরো শক্তিশালী। এসব কিছুর মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক 'অন্যতা'[২] (otherness)। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই 'অন্যতা'র সঙ্গে যুক্ত আছে রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী আধিপত্য। আদিবাসী নারী-পুরুষ কখনো এটি মেনে নেন, কখনো প্রতিবাদ করেন, কখনো নিজের মতো আত্মস্থ করেন, কিংবা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন। বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর অবস্থান ও বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করার আগে একটু খোলাসা করা প্রয়োজন রাষ্ট্রের সঙ্গে সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সম্পর্কে অর্থাৎ সংখ্যালঘু জাতিসত্তা নিয়ে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যান, আদিবাসী নারী চরিত্রচিত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং আদিবাসী নারীর ত্রিমুখী প্রান্তিকতার প্রেক্ষাপট।

রাষ্ট্র, সংবিধান ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তা

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর, দিনাজপুর, সিলেট, রাজশাহী, নাটোর, পটুয়াখালীসহ বেশকিছু অঞ্চলে সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর বসবাস। ওঁরাও, মাহাতো, চাকমা, ত্রিপুরা, মার্মা, পাংখো, খুমী, বনযোগী, লুসাই, মুরাং, তঞ্চঙ্গা, বম, খেয়াং, চাক, সাঁওতাল, খাড়িয়া, পাত্র, রাখাইন, হাজং, মনিপুরি, গারো, খাসিয়া, বানাই, ডালু, কোচ, রাজবংশীসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা বলা যায় যে, রাষ্ট্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কোনো 'পরিসর' সৃষ্টি বা তাদের প্রতি কোনো স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির ভিত্তি– এটার প্রতিফলন আমরা দেখি স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রটি যে চরিত্র ধারণ করে তার

মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'জাতীয়তাবাদ' রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।[৩]

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংবিধানে ইসলামি আদর্শ যুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশ নং-১-এর মাধ্যমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম' সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার উপরে সন্নিবেশিত করা হয় এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে। বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশী বলে পরিচিত করার বিধান করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের ৭ জুন ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায়গুলো নিজেদের জাতিগত এবং ধর্মীয় উভয় অর্থেই সংখ্যালঘু হিসেবে আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশে সংবিধান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধান তৈরি করেনি। নীতিনির্ধারকগণ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন যেটি সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ৪নং উপধারায় উল্লেখ আছে যে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। কিন্তু বিধানটি অস্পষ্ট। এখানে 'অনগ্রসর' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, এমনকি এর মাধ্যমে রাষ্ট্র এমন স্বাধীনতাও পেতে পারে যাতে রাষ্ট্র বাঙালিদের পশ্চাৎপদ অংশের উন্নয়নের স্বার্থরক্ষা করতে পারে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের বিনিময়ে।[৪] শুধু সংবিধানেই নয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন দলিলপত্রেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে অবমাননা করার বহু দৃষ্টান্ত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জাতিগত সম্প্রদায় হল ত্রিপুরা। এই নামটির বানান রাষ্ট্রের বিভিন্ন দলিলে, বিভিন্নভাবে লেখা রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদক তাদের 'টিপরা' ও 'ত্রিপুরা'– এ দুটো ভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন যদিও তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া বেশকিছু সম্প্রদায়কে 'অন্যান্য' হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। কারা এই 'অন্যান্য'-এর মধ্যে পড়ে তার কোনো নির্দিষ্টকরণ করা হয়নি। এমনকি আদমশুমারি কর্মকর্তারা এটি খোলাসা করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন এই 'অন্যান্য' নামের শ্রেণীটির উদ্ভব হল।[৫] সরকারি ভাষ্যমতে, সংখ্যালঘুর মধ্যে যারা সংখ্যায় খুব কম তারাই এই 'অন্যান্য'র শ্রেণীভুক্ত এবং এই 'অন্যান্য'র শক্তিশালী নির্মাতা হল রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের আদিবাসী নারী

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে গারো ও খাসিয়া জাতিসত্তা ছাড়া সকল জাতিসত্তায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতৃতান্ত্রিক 'আদিবাসী' গৃহস্থালি যে খুব অল্প সংখ্যকই

পাওয়া যাবে নারীপ্রধান গৃহস্থালি। পাহাড় অঞ্চলে পানি টানা কিংবা ঝুড়িতে করে জ্বালানি সংগ্রহ করে আনা নারীর কাজ।[৬] 'আদিবাসী' মেয়েরা জমিতে রোপা লাগানোর ক্ষেত্রে পুরুষদের চাইতে দক্ষ। গৃহের বাইরে পুরুষের সঙ্গে কাজে যোগদান করলেও পরিবারে তার শ্রমের বোঝা লাঘব হয় না। সন্তানকে পিঠে বেঁধে 'আদিবাসী' নারী জমিতে কাজ করতে যান, এ দৃশ্যটি স্বাভাবিক মনে করা হয় এবং এটিকে 'সহজ'ভাবে উপস্থাপন করা হয়, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে জেন্ডার রাজনীতির অপ্রকাশিত রূপ।[৭] সাঁওতাল গৃহস্থালিতে গৃহের সুন্দর নকশা সমাজে একজন সাঁওতাল পুরুষের মর্যাদা বাড়ায়, কিন্তু এই নকশার নির্মাতা যে শ্রমিক নারী তার শ্রম অদৃশ্য করা হয়। জেন্ডার শ্রমবিভাজনে নারীর কাজ যদিও গৃহের পরিসরে (Private Sector) সীমাবদ্ধ নয়, তবুও গারো এবং খাসিয়া বাদে অন্যান্য জাতিসত্তার মধ্যে নারীর অধস্তন অবস্থা বিরাজমান। নারীরা শোষিত এবং নারীর অধস্তন অবস্থা মতাদর্শগত। প্রাধান্যশীল মতাদর্শ দ্বারা নারীর এই অধস্তনতা নির্মিত, যে মতাদর্শ অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক। নারী প্রথমত অধস্তন তার পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, দ্বিতীয়ত অধস্তন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে।

প্রথমটি আবার তৈরি করেছে পুরুষের মর্যাদাবোধ এবং পরিবারের পদস্তর (Status) বোধ। দ্বিতীয়টির ক্রিয়াশীলতা আবার নারীদের করে তুলেছে সমাজের ক্ষেত্রে প্রান্তিক। সুতরাং গারো ও খাসিয়া সমাজ ব্যতীত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর প্রান্তিকতা প্রশ্নাতীতভাবে নির্মিত হচ্ছে। 'আদিবাসী' নারীর ক্ষেত্রে ধর্ম ও জাতির সঙ্গে নারী হিসেবে প্রান্তিকতা তাকে ত্রিমুখী প্রান্তিকতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।

মাতৃসূত্রীয় সমাজব্যবস্থা হিসেবে গারো সমাজে যাবতীয় মালিকানা পায় মেয়েরা। মেয়ে-সন্তান মায়ের সব সম্পত্তি পাবে। ছেলেরা কিছুই পাবে না। এ সমাজব্যবস্থার 'সৌজন্যে' বাঙালিদের ভেতর থেকে অনেক সময়ই শোনা যায়, 'গারো নারী ও জমি চাই'–এ স্লোগান। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের একটি ফাইল থেকে জানা যায়, প্রায় আশি বিঘা জমির লোভে হালুয়াঘাটের গিলাভূই গ্রামের অঞ্জনা দিওকে বিয়ে করে মুসলমান বানাল দীন মোহাম্মদ, তারপর একমাস যেতে না যেতেই অঞ্জনার আপন মামাকে অন্ধকারে হত্যা করল এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি বলে। এ নিয়ে মামলা হয়েছিল। দীন মোহাম্মদসহ সাতজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হয়েছিল। বাংলাদেশের আইনে তারা আবার খালাস পেয়ে ফিরেও এসেছে। আর এখন দখল করে বসে আছে অঞ্জনা দিওর মা-বাবার সম্পত্তি।[৮]

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইন সবসময় অধিপতি শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের অধিপতি শ্রেণীর মতামত পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বৈধ করার জন্য। ত্রিমুখী প্রান্তিকতায় কোণঠাসা হয়ে যাওয়া অঞ্জনা দিওরা ছিটকে পড়েন। গারো জনগোষ্ঠীর জনগণেরা মাতৃসূত্রীয় সমাজব্যবস্থায় মায়ের পদবি ব্যবহার করেন। ইদানিং ঢাকা শহরের গারোদের কেউ কেউ তাদের সন্তানদের পদবি (মাচং) পিতার পদবি অনুসারে লেখেন।[৯] অর্থাৎ তারা আধিপত্যশীল পিতৃতান্ত্রিক

বাঙালি সমাজকে 'আদর্শ' ভেবে তাদের জীবনকে 'উন্নত' করতে চান। বাঙালি সমাজের অনুসরণ করেই তাদের পদবির এই পরিবর্তন, যুক্তকরণ।

শ্রমমজুরি

দরিদ্র আদিবাসী নারীরা দরিদ্র বাঙালি নারীর চেয়েও বেশি বৈষম্যের শিকার, কেননা তারা শ্রেণীগতভাবে, জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে এবং নারী হিসেবে বৈষম্যের শিকার। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে দরিদ্র সাঁওতালদের খাবার ও চা খেতে দেয়া হয় না। মজুরির ক্ষেত্রেও অসমতা দেখতে পাওয়া যায়, বাঙালি ক্ষেতমজুর যেখানে ২৫ টাকা পান, সেখানে আদিবাসী ক্ষেতমজুর পান মাত্র ১৫ থেকে ২০ টাকা। আদিবাসী ক্ষেতমজুর নারীর অবস্থা আরো খারাপ। একজন পুরুষ ক্ষেতমজুরের সমান কাজ করেও এরা মজুরি পান ৫ থেকে ৭ টাকা কম। টাকার বদলে ধান দেয়া হলে বঞ্চনা আরো বেড়ে যায়। চুক্তিভিত্তিক কাজে আদিবাসী পুরুষ এক মণ ধান পেলে মেয়েরা পান আধ মণ ধান। নাটোর জেলার মোমিনপুর গ্রামের শিলা এক্কা জানান, এলাকার বাঙালিরা কাজের বাকি টাকা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে বছরের পর বছর ঘুরাতে থাকে। কাজ শেষে অশোভন প্রস্তাব দেয়। একই গ্রামের মিনতি নারী বলেন, তিনি মজুরি কম পান। মাঠের কাজে দিনে ২৫/৩০ টাকা দেয়, অথবা ৫ দিনের কাজ করিয়ে নিয়ে মজুরি দেয় ৩ দিনের বাকি পাওনা টাকা পরে 'দেব-দিচ্ছি' বলে আর পাওয়া যায় না। আবিনা হেমব্রম উল্লেখ করেন যে, ২৫ টাকা মজুরির কথা বলে তাদের কাজে লাগায়, কিন্তু তারপর ২০-১৫-১২ টাকা মজুরি দেয়। বাকি মজুরি দেয়ার আশ্বাস দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই দেয় না।

কাজ করতে আদিবাসী নারীরা অনেক সময় গ্রামের বাইরে বিভিন্ন স্থানে যান। প্রায়শই এরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজের জন্য গ্রামান্তরে বা শহরে যান, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজ করার সুযোগ তেমন একটা পান না। অনেকেই শুধু আদিবাসী মেয়েদের কাজ দিতে আগ্রহী হয়। আর যদি তারা অতিরিক্ত কাজের জন্য অর্থ দাবি করে তাহলে প্রত্যুত্তর আসে 'কাল থেকে বাদ দিয়ে দেব'। এভাবে তাদের সব সময় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হয়।[১০] এভাবে শ্রমবাজারে সস্তা শ্রমিক হয়ে যায় আদিবাসী নারীরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে খামারে রাবার চাষ করা হয়। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র পাহাড়িদের 'উন্নয়ন' ঘটানো, কিন্তু সেখানেও মজুরি বণ্টনের পার্থক্য দেখা যায়। এ খামারে কাজ করেন সুরেশ্বরী দেওয়ান। তিনি জানালেন 'আমা জুমু ওনোর দোন ছয় হাজার টাঙা আর বাঙাল ওখাত দোন হলদে ২১ হাজার টাঙা।' (অর্থাৎ আমাদের পাহাড়িদের চার বছরে দেয়া হয় ৬,০০০ টাকা এবং সেখানে বাঙালিদের দেয়া হয় ২১,০০০ টাকা।)

রাষ্ট্রের নারীনিপীড়ন ডিসকোর্স ও আদিবাসী নারী

নারীনিপীড়নের (Gender Violence) সমস্যার স্বরূপ বুঝতে হলে কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। এই সমস্যা বুঝতে হলে এটিকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শিক ও দমনমূলক যন্ত্রের ভূমিকাকে বিবেচনা করা উচিত।[১১]

কেস: নৌকামনি হাজং ও অনামিকা হাজং

ধৃতিমান হাজংয়ের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুরের মেনকিকান্দি গ্রামে। ১৯৯০ সালের ১৬ জুন তার দুটি মেয়ে অপহৃত হয়। মেয়ে দুটির নাম নৌকামনি হাজং ও অনামিকা হাজং। অপহরণকারী দুষ্কৃতকারীরা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অ-আদিবাসী। ২১ জুন ১৯৯০ দুর্গাপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়, কিন্তু হাজং মেয়ে দুটোকে তাদের পিতামাতার কাছে ফেরত না দিয়ে আসামিদের হেফাজতে জামিন দেয়া হয়। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবাদ জানান হলে উল্টো মেয়েদের পিতামাতাকে হুমকি দেয়। পরে ম্যাজিস্ট্রেট অপহৃত মেয়েদের পিতামাতাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, 'কেইস ছাইড়া দাও, বেশি বাড়াবাড়ি করলে মরবা।' সংখ্যালঘুরা মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে।[১২] কেননা দেশের সংকট মুহূর্তে নারীরাই বেশি নির্যাতিত হয়। কিন্তু যে রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন, জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে ক্ষমতাহীনের সম্পর্ক দূরত্বের, সে রাষ্ট্রে আদিবাসী নারীর অপহরণের জন্য কোনো সংকটময় অবস্থার জন্ম দিতে হয় না।

শুধুমাত্র সাঁওতাল হওয়ার কারণে অনেক মেয়ে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। ফুল পাহানী জানান, নওগাঁর মহাদেবপুর থানার বড় মহেশপুর-চেরাগপুর এলাকার ৬ জন মেয়েকে মুসলমানরা ভয় দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং ফুর্তি করে। পরে ২ জন মেয়েকে পাওয়া যায়, কিন্তু ৪ জন সম্ভবত পাচার হয়ে যায়।[১৩]

কেস : মারীয়া মারাক

অনাহারে, অর্ধাহারে পড়ে থাকা আদিবাসী মেয়ে মারীয়া মারাক ঢাকায় আসেন এবং সহজে একটি বিস্কুটের ফ্যাক্টরিতে কাজ পান। ফ্যাক্টরির মালিক একজন বাঙালি খ্রিস্টান। কর্মস্থল ঢাকার গ্রিন স্কোয়ার এলাকা। মেয়েটিকে প্রতিদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠতে হয়। বেলা ওঠার আগেই হাতমুখ ধুয়ে শুরু হয় তার জীবনসংগ্রাম। এভাবেই এই শহরে মেয়েটির দিন যেতে থাকে, মজুরি মাসিক এক হাজার টাকা। স্বপ্নের মতো ব্যাপার মেয়েটির জন্য। এত টাকা তো জীবনে সে কোনোদিন দেখেনি, শুধু দেখেছে এক হাঁড়ি মদ বিক্রি হলে বিশ টাকা পাওয়া যেত। এ রকমই দেখেছে সে আকন পাড়া গ্রামে।

একদিন ভোরবেলা মেয়েটি হাতমুখ ধুয়ে কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন মার্ক নামের পরিচিত একটি লম্পট ছেলে দ্বারা মেয়েটি লাঞ্ছিত হয়। ১৯৯৩ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক বুধবার সূর্য ওঠার আগে এই জঘন্য ঘটনাটি ঘটে। ফ্যাক্টরির মালিক এই পাশবিক ঘটনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।
'আদিবাসী মেয়েটির অকপট সরলতার মধ্যেও এই পুঁজিবাদী সমাজ শুধুই শরীরের গন্ধ খোঁজে।'[১৪]

কেস: গিনিতা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানায় আটপুর ইউনিয়নের মহিপুর গ্রামের তুডা হেমরনের ১২ বছরের কন্যা গিনিতা ২৪ এপ্রিল '৯৭, সকাল ৮টায় স্থানীয় মাঠে ছাগল চরাতে যায়। মহিপুর গ্রামের একরামুল হক বিহারীর ছেলে এহসানুল হক শামীম গিনিতাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। সে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এসে শামীমকে ধরে ফেলে। উল্লেখ্য, আটপুর ইউনিয়নের সদস্য আমিনুল ইসলাম শামীমের মামা, জোর করে শামীমকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে আদিবাসীদের সর্বনাশের ভয় দেখিয়ে যায়। নিরুপায় আদিবাসী সম্প্রদায় এই ঘটনায় নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পাঁচবিবি থানায় একটি মামলা দায়ের করে, যার নম্বর ১২/৭৯। আমিনুল ইসলাম মামলা তুলে নেয়ার জন্য আদিবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আদিবাসীরা আমিনুল ইসলামের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন। এই প্রেক্ষিতে ১০ মে পুলিশ সুপার, ইউপি চেয়ারম্যান, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঘটনাটি সরেজমিনে তদন্ত করেন। এতে একরামুল হক পুত্রের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে পুলিশ সুপারের কাছে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু কোনো শাস্তি ছাড়াই ঘটনাটির নিষ্পত্তি ঘটে।[১৫]

কেস: কল্পনা চাক্‌মা

১২ জুনের নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৯৬ সালের ১১ জুন মধ্যরাতের পর হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাকমা তার পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনা গ্রামের বাড়ি থেকে অপহৃত হন। কল্পনার বাড়ির সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন একদল লোক তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং বের হওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে। পরিবারের সবাই তখন জেগে যায় কিন্তু দরজা খোলে না, তখন লোকেরা তাদের বাঁশের তৈরি খিলান ভেঙে ফেলে। তারা বাড়ির সবাইকে বসার ঘরে একত্রিত করে এবং আলো জ্বালাতে বাধা দেয়। তারা সবার নাম জিজ্ঞেস করতে থাকে এবং কল্পনার ছোট ভাই লালবিহারীর নামে ডাকার পর তাকে জোর করে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। তারা ঘোষণা করে যে, তাকে বসের (স্যার) নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যখন তারা তাকে শনাক্ত করার জন্য তার চোখে বারবার আলো ফেলছিল, লালবিহারী (ক্ষুদিরাম) দাবি করে যে সে কিছু লোককে চিনতে পেরেছিল, যেহেতু টর্চের আলো তার চোখে সরাসরি পড়ছিল না। সে যাদের চিনতে পেরেছিল সামরিক পোশাক

পরিহিত লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস, কজইছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্লাটুন কমান্ডার নুরুল হক এবং গ্রাম প্রতিরক্ষী সালেহ আহমেদ।

অতঃপর লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ক্ষুদিরামকে কল্পনার বাড়ি থেকে ১৫০ গজ দূরে পানিছড়ার প্রান্তে নিয়ে তার চোখ ও হাত বাঁধে। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর কল্পনা এবং তার বড় ভাই কালীচরণকেও ঐ স্থানের আরো পশ্চিমে একটি জলাধারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা ধারণা করতে পেরেছিল তারা কোথায় আছে। ক্ষুদিরামকে হাঁটু পানির মধ্যে যেতে বলা হল। কোনো একজন শক্ত করে তার হাত ধরল এবং অন্য একজন গুলি করতে নির্দেশ দিল। একথা শুনে ক্ষুদিরাম তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সে তখন কল্পনাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে দ্রুতবেগে ছুটে যায়। আর একটি গুলি বর্ষিত হলে দাদা দাদা বলে কল্পনার চিৎকার শুনতে পায়। বিপজ্জনক ভেবে ক্ষুদিরাম সে রাতে বাড়ি ফিরল না। পরদিন বাড়ি ফিরে সে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে নিকটস্থ উগলছড়ি সামরিক ক্যাম্পে কল্পনার খোঁজ করতে গেল। লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। গ্রামের একটি অনুসন্ধানকারী দল কল্পনার সন্ধান করছিল, কিন্তু তারা লোকের মাঝে ক্ষুদিরামের লুঙ্গি এবং থলেভর্তি গুলি পায় যা কালীচরণ থানায় জমা দিয়েছিল বলে দাবি করে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা পরে তা অস্বীকার করে।

চট্টগ্রামভিত্তিক একটি নিরপেক্ষ মানবাধিকার গ্রুপের মতে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনারই একটি বহিঃপ্রকাশ। কল্পনা চাকমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর জড়িত থাকার প্রামাণ্য তাদের নিকট ছিল।[১৬]

উপরোক্ত অপহরণ ঘটনার আলোকে দেখা যায়, কল্পনা প্রতিবাদী নারী, সেটিকে দমন করা অর্থাৎ বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সেনাবাহিনী কল্পনাকে অপহরণ করে। কল্পনার লড়াই একদিকে যেমন ছিল রাষ্ট্রীয় অধিপতি শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ছিল পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে। শুধু কল্পনা নয়, এমনিভাবে পাহাড়ের কোল থেকে হারিয়ে গেছে অনেক পাহাড়ি নারী। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ৪ জন এবং ১৯৯৫ সালে ১২ জন নারী ধর্ষিত হয় সেনাবাহিনী কর্তৃক।

সারণি ১ : পাহাড়ে নারী নিপীড়ন

সাল	ঘটনার বিবরণ	সংখ্যা	কার মাধ্যমে
১৯৯৩	ধর্ষণ	৫	সেনাবাহিনী
১৯৯৪	ধর্ষণ	৪	সেনাবাহিনী
১৯৯৫	ধর্ষণ	১২	সেনাবাহিনী
১৯৯৬	ধর্ষণ	১	সেনাবাহিনী

সূত্র : হিল উইমেন্স ফেডারেশন

১৯৬১ থেকে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা ৯৪.% ধর্ষণ সংগঠিত হয়। যাদের বেশির ভাগেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে। তবে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কবিতা চাক্‌মা জানান ধর্ষণ বাদেও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহাড়ি নারীদের অনেক ধরনের যৌন হয়রানি করে এবং ধর্ষণের সংখ্যাও প্রাপ্ত হিসাবের তুলনায় বেশি, কেননা অনেক ধর্ষিত নারীই লোকলজ্জার ভয়ে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন না।

কেস: স্মৃতি রিছিল

রাজধানীতে জীবিকার সন্ধানে এসে দেড় মাসের মাথায় গণধর্ষণের শিকার হয়েছে স্মৃতি রিছিল নামের এক আদিবাসী মেয়ে। ১৯৯৭ সালের ২ আগস্ট রাতে গুলশানের কালাচানপুর এলাকায় ঘটেছে সংঘবদ্ধ এই গ্যাং রেপের ঘটনাটি, সাত নরপশু মাতাল যুবক ঘরে ঢুকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে এই আদিবাসী নারীকে। গারো মেয়ে স্মৃতি রিছিল ১৯৯৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে দারিদ্র্যের কারণে আর পড়াশোনা করতে পারেননি। তিন বোনের মধ্যে সে মেজো। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট বোন পড়াশোনা করে নেত্রকোনার দুর্গাপুর গ্রামের একটি স্কুলে। বাবা শৈলেশ আরেং হতদরিদ্র দিনমজুর। দরিদ্র বাবার সংসারকে সাহায্য করার আশা নিয়ে স্মৃতি মাস দেড়েক আগে ঢাকায় আসেন। বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় মাইকা নামের এক গার্মেন্টসে তার কাজও জুটে যায়। ওভারটাইমসহ মাসে এক হাজার টাকা মাইনে পাওয়ার কথা। কিন্তু দেড়মাসের মাথায় গ্যাং রেপের শিকার হয় আদিবাসী মেয়েটি। প্রতিবাদও হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ঘটনাটির কোনো বিচার হয়নি।[১৭]

মুন্নমপাড়ায় একটি বম মেয়ের কথা জানা যায়। কলেজে পড়ত মেয়েটি। একদিন জুমক্ষেত্রে যাবার সময় সেনাবাহিনীর সদস্য দ্বারা মেয়েটি নির্যাতিত হয়। ধর্ষণ শব্দের প্রতিশব্দ অনেক আদিবাসী সমাজেই নেই। অর্থাৎ এগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটেনি এর আগে।

আদিবাসী নারী শিশুর অভিজ্ঞতা ও প্রতিরোধের পথ

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তার নামে সামরিক বাহিনী প্রেরণ 'আদিবাসী' নারী নিপীড়ন এবং সেই সামরিক সেনাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র এই নিপীড়নকে 'বৈধতা' দেয়। তাই সেনাসদস্যরা প্রতিনিয়তই আদিবাসী নারীর পিঠে তৈরি করে আতঙ্কের সুড়সুড়ি।

আদিবাসী নারীর সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার কথা: ১

বিদ্যুৎহীন গাঁয়ে সন্ধ্যার পরপরই মনে হয় যেন গভীর রাত। সেই নিশুতি রাতে একটা গ্রামের শ'দুয়েক লোক নিঃশব্দে এগিয়ে চলছে গহীন অরণ্যের দিকে নিরাপত্তার খোঁজে। কিন্তু তার আগে পেরিয়ে যেতে হয় গাঁ ঘেঁষে চলে যাওয়া একটি পথ, এই পথই কিনা যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। যেকোনো মুহূর্তে সেনাবাহিনীর লরি এসে হেডলাইটের আলোতে পুরো পথ আলোকিত করত পারে। তাই সবাই সর্বদাই আতঙ্কিত থাকত সেনাবাহিনী এসে পড়ার ভয়ে। কেউ পেছনে থাকতে চাইত না। পিঠে একটি সুড়সুড়ি অনুভব করত। খুব ছোটবেলায় এই ঘটনা ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 'আর্মি আসছে' এই দুটো শব্দে মুহূর্তে প্রত্যেকটি মানুষের মুখে ভৌগোলিক রেখা পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তৎক্ষণাৎ বহনযোগ্য তল্পিতল্পা গুটিয়ে অনিশ্চিত যাত্রা শুরু হত। এভাবেই একটা অবোধ শিশুর জীবনসংগ্রামের পথচলা শুরু। এই অভাগা শিশুটি আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি।[১৮]

যেখানে আলো দেখে গভীর অরণ্যের আদিবাসী নারীর উল্লসিত হওয়ার কথা, সেখানে গাড়ির হেডলাইট দেখে সে আতঙ্কিত হয়, প্রতিনিয়ত শঙ্কিত থাকে নির্যাতন, নিপীড়ন ও অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে।

পাহাড়ি নারীর অভিজ্ঞতা: ২

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আমি এখন সভানেত্রী। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমার মতো এমন লাজুক মেয়ে দ্বিতীয়টি বোধ হয় ছিল না। আমরা আমাদের পরিবারে ৬ জন ছিলাম– বাবা-মা, ভাইবোন। আমার বাবা ছিলেন একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, একইসঙ্গে উনি ছিলেন আমাদের গ্রামের কারবারি, অর্থাৎ গ্রামের প্রধান। আমি যখন প্রথম শ্রেণী কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখনকার আর্মি আক্রমণের ভয়াবহতার কথা আমার মনে পড়ে। আর্মিরা আক্রমণ করছে, এই ইঙ্গিত পেলেই সব বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে ও পুরুষরা পালিয়ে যেতেন। আমার মা একটা কাস্তে হাতে নিয়ে মাঠে চলে যেতেন, বাড়ির পাশেই আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে রাখত, কাজ করার জন্য যাতে আর্মিরা সন্দেহ বা বিরক্ত না করে। আমাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পারতপক্ষে বাজারে পাঠানো হত না। আমরা মেয়েরাই যেতাম। কেননা ছেলেদের দেখলেই ধরে নিয়ে মারধর করত, হয়তো মেরেই

ফেলত। মেয়েদেরও নানাভাবে হয়রানি করা হত, মৌখিকভাবে এমনকি দৈহিকভাবেও। কিন্তু তার পরও আমরা সহ্য করে যেতাম।

ভাবতে অবাক লাগে যে, আমি এত মাত্রায় বেশি লাজুক প্রকৃতির ছিলাম যে ছেলেদের সামনে যেতেই হাঁটু কাঁপত, সেই আমি এই পথ বেছে নেব। কিন্তু আমার মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা আমাকে এই পথে টেনে নেয়। আমি সবার ছোট ছিলাম বলে সবাই আমাকে স্নেহ করত। আমরা আড্ডায় বসতাম কিন্তু সেই আড্ডায় সিনেমার গান, হাসি-ঠাট্টা না হয়ে, হত রাজনৈতিক আলোচনা ও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য। আমরা গণ-পিকনিকে যেতাম আনন্দ-উল্লাস করার জন্য, বন্ধুর সাথে যাতে একতাবদ্ধ থাকা যায় সেই লক্ষ্যে। একইভাবে আমি ধীরে ধীরে আন্দোলনে শরিক হই।[১৯]

ধর্ম, জাতি এবং নারী হিসেবে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অবস্থানে আছে বলে আদিবাসী নারী এই তিন মতাদর্শিক অবস্থান থেকে নির্যাতিত হন, যেমন হয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। সে সময় যত নারী পাকিস্তানি সেনাদের ধর্ষণের শিকার হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু নারী। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে একজন নারী যিনি ধর্মীয়ভাবে, জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু তাকে সব সময় শঙ্কিত থাকতে হয়।

ইতিহাসে আদিবাসী নারী

নারী তার অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্রোহ, বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করে। নারীর অভিজ্ঞতাই আন্দোলনের তত্ত্ব। মহাশ্বেতা দেবী সুগানা মুণ্ডার ছেলে বীরসাকে দিয়ে দেখিয়েছিলেন 'আদিবাসী'দের মুক্তির স্বপ্ন। বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে 'উলগুলান' অবধি সব বিদ্রোহই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অংশ। এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিলেন বহুসংখ্যক মুণ্ডা নারী। ১৭৭০ ও ১৭৭৯ সালের চুয়ার বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালের খাসি বিদ্রোহ, ১৭৮৯ সালের গঞ্জাস বিদ্রোহ, ১৭৮০-৮৫ সালের প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮০৮ সালের খান্দেশ আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালের ভীম আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮৩১ সালের ওড়িশার খড় বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ সালের দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৯৫-১৯০১ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহ, ১৮৩৭ ও ১৮৮২ সালের ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ এবং এর পর তৈরি হওয়া হাজং বিদ্রোহ ও চল্লিশের দশকের টঙ্ক-আন্দোলনে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রথমত প্রবল জাতীয়তাবাদী আধিপত্যে তৈরি হওয়া জাতীয় ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা আসে না, আসতে দেয়া হয় না। দ্বিতীয়ত আদিবাসী নারী হিসেবে তারা ইতিহাসে স্থান পায় না। টঙ্ক-আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী অশ্বমণি হাজং, যাদুমণি হাজং, রাসমণি হাজংরা হারিয়ে যায় আধিপত্যশীল ইতিহাসের প্রবল স্রোতে। রাসমণি হাজং টঙ্ক-আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন অনেক হাজং নারীকে। বিশেষ করে হাজং নারীরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের সম্মান ও ফসল রক্ষার দাবিতে। হাজংদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এবং সম্মুখ সংঘর্ষে ক্ষিপ্তপ্রায় জমিদারগোষ্ঠী এবং বেস্টিন বাহিনীর সশস্ত্র দল ও পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি বহেড়াতলী গ্রামে যখন হামলা করে তখন হাজং নারী-পুরুষরা একত্র হয়ে পাল্টা

আক্রমণের পরিকল্পনায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় খবর পৌঁছে যে বেস্টিন বাহিনী হাজংদের ঘরে ঢুকে ধানের সাথে নারীদেরও লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কুমুদিনী হাজং নামে এক কিশোরী বধূকে তারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই খবরে রাসমণি হাজং তাঁর হাজং নারীবাহিনী নিয়ে অস্ত্র হাতে (দা, বঁটি, বল্লম, কোঁচ প্রভৃতি) ছুটে যান কুমুদিনী হাজংকে উদ্ধার করতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হাজং পুরুষরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসমণি হাজং চিৎকার করে বলেন, 'ময় তিমাট লা ইজ্জাত রক্ষা করিবা না জালে কাই যাব? তিমাট রা মর্ম তিমাটই জানে' (আমি নারী, নারীর ইজ্জত আমি রক্ষা না করলে কে করবে? নারীর মর্ম নারীই জানে)। বহেড়াতলীর সোমেশ্বরী নদীর তীরে বেস্টিন বাহিনীকে আক্রমণ করেন হাজংরা। রাসমণি হাজং নিজে দা দিয়ে কুপিয়ে ব্রিটিশের পুলিশকে হত্যা করেন। সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয় রাসমণির বুক। কিন্তু মৃত্যুর আগেই রাসমণি নরপিশাচদের হাত থেকে কুমুদিনী হাজংকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসমণি টঙ্ক-আন্দোলনের প্রথম শহীদ। তাঁরই রক্তমাখা পথ ধরে আরো দু'জন হাজং নারী শহীদ হন। এদের মধ্যে বহেড়াতলী প্রথাবিরোধী আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন তুলা নারী হাজং ও টঙ্ক-আন্দোলনে শহীদ হন শঙ্খমণি হাজং।[২০] সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হওয়া নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস এখনো সেভাবে স্থান পায়নি। নব্বইয়ের দশকে এসে বিভিন্ন জাতিসত্তার কিছু প্রতিবাদী সংগঠন তৈরি হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হিল উইমেন্স ফেডারেশন। সেই আন্দোলনের খেসারত দিতে হয়েছে কল্পনা চাকমাকে। সরকার এই বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করতে খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিছু নারীবাদী সংগঠন এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন কল্পনার অপহরণ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি হওয়ার পর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে। আঞ্চলিক পরিষদের এই বিষয়ে নীরবতা সরকারের নীরবতাকে আরো পাকাপোক্ত করে।

আদিবাসী নারীতে রূপান্তর

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এত শক্তিশালী যে, কোনো সমাজকেই তার মতো করে, নিজের মতো করে থাকতে দেয় না। অনবরত ভেঙেচুরে রূপান্তর ঘটায়, পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করায়। তাই তো দেখা যায় আদিবাসী গ্রামগুলো জুড়ে নিদারুণ দারিদ্র্য। ইদানিং ঢাকা শহরে বেশকিছু গারো মেয়েকে বিউটি পার্লারে এবং বিভিন্ন বাড়িতে 'কাজের মেয়ে' হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। নকমান্দি নামের একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা মহানগরীতে গারো কাজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছে। জরিপে দেখা যায় ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার গারো কাজের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৮০৭ জন।

সারণি ২ : গারো কর্মজীবী

মোট সংখ্যা	ছেলে	%	মেয়ে	%
৮০৭	৫৩৪	৩৩.৮৩%	২৭৩	৬৬.১৭%

সূত্র : নকমান্দি, ১৯৯৩

'আদিবাসী' কাজের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হবে বলে জরিপ-কর্মীরা মনে করেন। এই ৮০৭ জন আদিবাসীর মধ্যে ছেলে ২৭৩ জন এবং মেয়ে ৫৩৪ জন। এদের মধ্যে ছয় থেকে নয় বছরের 'আদিবাসী' মেয়েও আছে। কয়েকজন ছোট্ট আদিবাসী মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে ঢাকা শহরে, যারা তাদের ভাষা ভুলে গিয়েছে। এভাবে তারা প্রবল ভাষার কাছে নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলে।
শ্রমবাজারে সস্তা শ্রমিক হিসেবে নিজেকে পরিচয় করায় আদিবাসী নারী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমাগত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় আদিবাসী নারী, রাষ্ট্রের কাছে তার পরিচিত হয় সস্তা শ্রমিক হিসেবে, বা সেনাসদস্যের কাছে ভোগ্যবস্তু হিসেবে, কিংবা কখনো কখনো 'আদিবাসী' নারী হয়ে ওঠে প্রতিবাদের নির্ভীক সৈনিক হিসেবে। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাকে দমন করার জন্য।

রুখে দাঁড়ায় আদিবাসী নারী

শত নিপীড়ন, অত্যাচার, শোষণের মধ্যেও রুখে দাঁড়ায় আদিবাসী নারী।
তারা প্রতিবাদ করে নিজ অস্তিত্বের জন্য, অবস্থানের জন্য। এই জ্বলে ওঠা প্রকাশ পায় কবিতা চাকমার 'জ্বলে উঠবো না কেন' (জ্বলি না উধিম কিত্তে)-তে। হাজারো বাধা-বিপত্তি সরিয়ে আদিবাসী নারী সমাজের, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে, তাদের অবস্থান তৈরি করছে। অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী নারী কাজ করছেন। আদিবাসী নারীরা তাদের নির্যাতনের সব দিক তুলে ধরছেন, রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন করছেন। এই প্রবন্ধ এই সাহসী প্রশ্ন তোলাকে সাধুবাদ জানায়।

উপসংহার

প্রতিনিয়তই সংগ্রামমুখর 'আদিবাসী' নারী। অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে হয়ে উঠছে যোদ্ধা। তারা শঙ্কিত থাকে তাদের ত্রিমুখী প্রান্তিক অবস্থান নিয়ে। কেন গ্রামে খেতে না পেরে আদিবাসী মেয়েরা শহরের সস্তা শ্রমিক হয়ে যায়? কেন সরকারের রাবার চাষ প্রকল্পে তাদের মজুরি বাঙালিদের থেকে কম দেয়া হয়?[২১] কেনই-বা প্রতিবাদী নারীকে অপহৃত হতে হয়? সবগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে রাষ্ট্রের এক বিশেষ প্রক্রিয়া, যা 'আদিবাসী' নারীর প্রান্তিকতাকে মুহূর্তেই আরো প্রান্তিক করে দিচ্ছে। কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ত্রিমুখী প্রান্তিকতা প্রশ্নাতীতভাবে সহনীয় 'স্বাভাবিক' বাস্তবতায় পরিণত হয় তা বোঝাটা জরুরি।

তথ্যসূত্র

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর 'পাহাড়ি' 'আদিবাসী' পরিচয় ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি, যদিও এর মধ্য

দিয়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি মেলে না। বিস্তারিত দেখুন প্রশান্ত ত্রিপুরার লেখা, 'Colonial Foundation of Pahari Ethnicity', (1992) The Journal of Social Studies-58, Centre for Social Stuidies , University of Dhaka.

২. 'অন্যতা' 'ভিন্নতা' এগুলো পাশ্চাত্যের আদলে নির্মিত। বিস্তারিত দেখুন Orientalism : Edward Said (1978) Vintage Books, A division of Random House, New York.

৩. বিস্তারিত দেখুন, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Dacca, Govt. of Bangladesh 1972, P-5.

৪. আমেনা মোহসিনের লেখা, 'রাষ্ট্র, উপ-রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ এবং উপ-আঞ্চলিকতাবাদ (১৯৯৭) সমাজ নিরীক্ষণ ৬৫,

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.-৬।

৫. আমেনা, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮

৬. জোবাইদা নাসরীনের লেখা, 'আদিবাসী জীবনযাপন, চাকমা নারীর ঝুড়ি ও তার রহস্য'-২৭ জুলাই ১৯৯৯, দৈনিক

জনকণ্ঠ।

৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান খান সম্পাদিত, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন (১৯৯৩), সমাজ নিরীক্ষণ

কেন্দ্র, পৃ.-১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. সঞ্জীব দ্রং (১৯৯৭) আদিবাসী নারী, তরফদার প্রকাশনী, পৃ.-৯৩।

৯. সঞ্জীব দ্রং, প্রাগুক্ত; পৃ.-৩২

১০. মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরীন, নিজভূমে পরবাসী : উত্তরবঙ্গের আদিবাসী প্রান্তিকতা

ডিসকোর্স', গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আরডিসি) ও উৎস প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. মেঘনা গুহঠাকুরতার লেখা (১৯৯৩) 'বাংলাদেশের নারী নিপীড়ন : রাষ্ট্রের ভূমিকা'। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের নারী নির্যাতন, পৃ.-৭, সমাজ নিরীক্ষণ

কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. বিস্তারিত দেখুন সুলতানা নাহার (১৯৯৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকা প্রকাশনী।

১৩. মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরীন, প্রাগুক্ত।

১৪. সঞ্জীব দ্রং, প্রাগুক্ত পৃ.-৩৭-৩৮।

১৫. জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ।

১৬. বিস্তারিত দেখুন মেঘনা গুহঠাকুরতার লেখা (১৯৯৭) 'ঘটনা : কল্পনার অপহরণ', সমাজ নিরীক্ষণ-৬৬, সমাজ
নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

১৭. উলগুলান-২৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ সংখ্যা ।

১৮. সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রকাশিত হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : নারী অভিজ্ঞতা-১', সংস্কৃতি,
মার্চ ১৯৯৯, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা ।

১৯. সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রকাশিত হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : নানা অভিজ্ঞতা-২, সংস্কৃতি,
মে-জুন ১৯৯৯, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা ।

২০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ।

২১. বিস্তারিত দেখুন, জোবাইদা নাসরীন (২০০০) রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ ও প্রতিরোধ, এম.এস.এস থিসিস (অপ্রকাশিত)
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ।

[লেখক: গবেষক, বাংলা একাডেমী: বর্তমানে জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণারত ।]